ISSN 1605 - 7023

পঞ্চদশ বর্ষ সংখ্যা

১৪২২ বঙ্গাব্দ/২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

সাভার, ঢাকা ১৩৪৩

www.bpatc.org.bd

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা

পঞ্চদশ বর্ষ সংখ্যা ১৪২২ বঙ্গাব্দ/২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

সম্পাদনা পর্ষদ

আ,ল,ম, আবদুর রহমান এন ডি সি — চেয়ারম্যান
এ,এস, শামীম আহমেদ — সদস্য
ড. মোঃ মাহমুদুল হাসান — সদস্য
মোঃ জায়েদুল হক মোল্লা এন ডি সি — সদস্য
বণিক গৌর সুন্দর — সদস্য

সম্পাদক : মোঃ শফিকুল হক

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা ১৩৪৩
www.bpatc.org.bd

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা, পঞ্চদশ বর্ষ সংখ্যা ১৪২২ বঙ্গাব্দ/২০১৫ খ্রিস্টাব্দ
Bangladesh Lok-Proshashon Patrika, 15th Year Issue 1422/2015 AD
বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বার্ষিক বাংলা পত্রিকা
Annual Bengali Journal of Bangladesh Public Administration Traning Centre

© বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকৃত প্রকাশকাল : বৈশাখ-১৪২৩/এপ্রিল-২০১৬

বিপিএটিসি গ্রন্থাগার : ০৫০.৩৫

টেলিফোন : ৮৮-০২-৭৭৪৫০১০-১৬ (পিএবিএক্স)
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৭৭৪৫০২৯
ওয়েব সাইট : http:/www.bpact.org

গ্রাহক হওয়ার জন্য যোগাযোগ -এর ঠিকানা

উপ-পরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা-১৩৪৩

মূল্য : ১৬০.০০ টাকা মাত্র

মুদ্রণে : অরণ্য প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
২১৮ ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৩৬৪০৮

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকার প্রবন্ধসমূহে প্রকাশিত মতামত প্রবন্ধকারদের একান্ত নিজস্ব, এর জন্য সম্পাদনা পর্ষদ কোন দায়িত্ব বহন করে না।

সূচিপত্র

সুশাসনের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ১
এ. কে. এম. আবদুল আউয়াল মজুমদার

গজলের অর্থবোধকতা, বিষয়বস্তু ও ভাবগম্ভিরতা ১৯
মোঃ সোহেল ইমাম খান

টেকসই উন্নয়ন: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত ৪৫
তমালিকা সুলতানা

উপশহরীয় মানুষের সামাজিক অসঙ্গতি দূরীকরণ ও সচেতনতা সৃষ্টিতে গণমাধ্যমের প্রভাব: ধামরাই পৌরসভার উপর একটি সমীক্ষা ৬৫
গাজী ইব্রাহীম আল মামুন

পোশাক কারখানায় লিঙ্গীয় শ্রম বিভাজন: একটি নৃবৈজ্ঞানিক পর্যালোচনা ৮৫
মো: ফজল হক
মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসাইন

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে নারী নির্যাতন (১৯২০-১৯৭১) ১১১
রাকিবা সুলতানা রত্না

বিলীয়মান জনপদ পাথরঘাটার ইতিহাস ও প্রত্নসম্পদ ১৩৫
মোঃ জাহাঙ্গীর আলম

ISSN 1605 - 7023

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা
পঞ্চদশ বর্ষ সংখ্যা
১৪২২ বঙ্গাব্দ/২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

সুশাসনের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

*এ.কে.এম.আবদুল আউয়াল মজুমদার**

সুশাসন বলতে কি বুঝায়, এটি আলোচনা করার আগে দেখা যেতে পারে 'সু' এবং 'শাসন' মানে কী? আভিধানিক অর্থে 'সু' মানে হচ্ছে - যা কিছু ভালো, যা কিছু ন্যায়, শুভ বা কল্যাণকর, উপকারি, উপযোগি, লাভজনক, যা কিছু দরকারি ইত্যাদি। 'সু' শব্দটির সঙ্গে পরার্থপরতা, ত্যাগ, পরোপকার, সহমর্মিতা ইত্যাদি বিষয় সম্পৃক্ত। শাসন শব্দটি বলতে - পরিচালন বা নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া, পরিচালন পদ্ধতি, কর্তৃত্ব, নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বুঝায়। একটি রাষ্ট্র পরিচালনা করা, রাষ্ট্রের কর্মকাণ্ড কর্তৃত্বের প্রয়োগ করা অথবা রাষ্ট্রের কার্যাবলীর উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার নাম হচ্ছে শাসন। প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে শাসন বলতে বুঝায়, প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রণ করা, প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা করা বা পরিচালনা করা। রাষ্ট্র এবং প্রতিষ্ঠান উভয় ক্ষেত্রেই শাসন শব্দটির সাথে কর্তৃত্ব, কল্যাণ, পারস্পরিক সম্পর্ক এবং জবাবদিহিতা সম্পৃক্ত। ২০০০ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বব্যাংক কর্তৃক প্রকাশিত ইসিডি ওয়ার্কিং পেপার এর সিরিজ-৭ এ Schater, গ. উল্লেখ করেছেন-

Governance is about power relationships and accountability- who has influence, who decides, how citizens and stakeholders have their say and how decision-makers are held accountable. ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে Smith তার Good Governance and Development, শীর্ষক লেখায় উল্লেখ করেছেন, The governance concept combines ideas about political authority, the management of economic and social resources, as well as the capacity of governments to formulate sound policies and perform their functions in an effective, efficient and equitable manner.

১৯৯৭ সালে ইউএনডিপি কর্তৃক প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী- Governance is the exercise of power or authority- political, economic, administrative or otherwise- to manage a country resources and affairs. It comprises the mechanisms, process and institutions through which citizens and groups articulate their interests, exercise their legal rights, meet their obligations and mediate their differences.

বিশ্বব্যাংকের মতে, Governance is the manner in which power is exercised in the management of a country economic and social resources for development. অপর একজন প্রশাসন বিশেষজ্ঞের মতে, শাসন মানে হচ্ছে, ঐতিহ্যগত এবং প্রাতিষ্ঠানিকভাবে একটি রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব অনুশীলনের প্রক্রিয়া। যেমন-

* প্রাক্তন রেক্টর, বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা।

সরকার নির্বাচন পদ্ধতি, সরকারের কার্যক্রম তদারকিকরণের ধরণ, সরকার পরিবর্তনের প্রক্রিয়া, কার্যকরভাবে রাষ্ট্রীয় নীতি তৈরি ও বাস্তবায়নে সরকারের সক্ষমতা, রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতি নাগরিকদের শ্রদ্ধাবোধ ইত্যাদি শাসনের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। পাবলিক এবং প্রাইভেট সেক্টরের উন্নয়ন কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনাও শাসনের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত। রাষ্ট্রের ব্যবসা-বাণিজ্য দক্ষতার সাথে পরিচালনা করা, আর্থিক ব্যবস্থাপনায় জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় আইন-কানুন, বিধি-বিধান তৈরি করা এবং প্রণীত আইন/বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রয়োগ করাও শাসনের অংশ। বৃহত্তর অর্থে শাসন মানে হচ্ছে-একটি রাষ্ট্রের বা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ যার মাধ্যমে নাগরিকেরা নিজেদের মধ্যে এবং সরকারি এজেন্সি ও কর্মচারিদের সাথে মিথস্ক্রিয়া করে থাকে।

The Standard Commission on Good Governance in Public Services এর মতে-

1. Good governance means - focusing on the organization's purpose and on outcomes for citizens and service users;

1.1 Being clear about the organizations purpose and its intended outcomes for citizens and service users;

1.2 Making sure that the users receive a high quality service;

1.3 Making sure that taxpayers receive value of money.

2 Good governance means performing effectively in clearly defined functions and roles-

2.1 Being clear about the functions of the governing body;

2.2 Being clear about the responsibilities of non-executives and the executives, and making sure that those responsibilities are carried out;

2.3 Being clear about relationship between governors and the public.

3 Good governance means promoting values for the whole organization and demonstrating the values of good governance through behavior-

3.1 Putting organization values into practice;

3.2 Individual governors behaving in the ways that uphold and exemplify effective governance.

4 Good governance means taking informed, transparant decision and managing risk-

4.1 Being rigorous and transparant about how decisions are taken;

4.2 Having and using good quality information, advice and support;

4.3 Making sure that an effective risk management system is in operation.

5 Good governance means developing the capacity and capability of the governing body to be effective-

5.1 Make sure that appointed and elected governors have the skills, knowledge and experience they need to perform well;

5.2 Developing the capability of people with governance responsibilities and evaluating their performance, as individuals and as a group;

5.3 Striking a balance, in the membership of the governing body, between continuity and renewal.

6 Good governance means engaging stakeholders and making accountability real-

6.1 Understanding formal and informal accountability relationships;

6.2 Taking an active and planned approach to dialogue with and accountability to the public;

6.3 Taking an active and planned approach to responsibility to staff;

6.4 Engaging effectively with institutional stakeholders.

সুশাসন হচ্ছে এমন শাসন যেখানে সকল বিষয়ে উত্তম বা সর্বোত্তম চর্চা করা হয়। সুশাসনে প্রণীত সকল আইন-কানুন ও বিধি-বিধান হয় নাগরিক বান্ধব। বিদ্যমান আইন-কানুন প্রয়োগ করা হয় নৈর্ব্যক্তিকভাবে। এখানে সকল নাগরিক সমভাবে আইনের সুবিধা প্রাপ্তির অধিকার ভোগ করেন। সুশাসনে আইনের চোখে সবাই সমান। সুশাসন মানে-রাষ্ট্রে রাজনৈতিক জবাবদিহিতা, আমলাতান্ত্রিক স্বচ্ছতা, বৈধভাবে ক্ষমতা প্রয়োগের সংস্কৃতি, রাষ্ট্রের কার্যক্রমে নাগরিকদের অংশগ্রহণ ও মতামত প্রদানের চর্চা। এখানে তথ্য লাভের সুযোগ থাকে অবাধ। সুশাসনে সুষ্ঠু ও সুদক্ষ আর্থিক ব্যবস্থাপনা দৃশ্যমান থাকে। রাষ্ট্রের যাবতীয় অর্থ ব্যয়ে জবাবদিহিতা বিদ্যমান থাকে। ফলে অর্থ ব্যয় হয় যৌক্তিক ও সাশ্রয়ী পন্থায়। এখানে শাসক ও শাসিত উভয়েরই থাকে আইনের শাসনের প্রতি নৈতিক সমর্থন ও শ্রদ্ধাবোধ। সুশাসন

মানে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা। এখানে বিচার বিভাগ স্বাধীনভাবে কাজ করার সকল রকম সমর্থন ও সুবিধাদি ভোগ করে থাকে। ফলে বিচার বিভাগের প্রতি নাগরিকদের থাকে অকুণ্ঠ সম্মান ও সমর্থন। সুশাসনে বিচার বিভাগকে মনে করা হয় ন্যায় বিচার প্রাপ্তির সর্বশেষ আশ্রয়স্থল। এখানে বিচার বিভাগের গ্রহণযোগ্যতা থাকে প্রশ্নাতীত। সুশাসনে মানবাধিকারকে সর্বাধিক সম্মান ও সমর্থন জানানো হয়। সুশাসনের নির্যাস বার্তা হলো মানবাধিকার ও সামাজিক ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা। এখানে কোনোভাবেই মানবাধিকার লঙ্গনকে সমর্থন করা হয় না। সুশাসনে মানুষের মৌলিক অধিকার ও ন্যায় বিচার প্রাপ্তিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ত দেয়া হয়।

সুশাসনে ব্যক্তি ও বাক-স্বাধীনতার অধিকার থাকে। এখানে বিরাজ করে পরমতসহিষ্ণু পরিবেশ। এখানে পারস্পরিক সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ রক্ষা করে নিজ নিজ মত প্রকাশ করা হয়। মতের ও পথের ভিন্নতাকে এখানে ইতিবাচক দৃষ্টিতে গ্রহণ করা হয়। সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার জন্য মত ও পথের ভিন্নতা, গঠনমূলক আলোচনা ও সমালোচনা, কখনো কখনো বিরোধীতা অপরিহার্য। সুশাসনে আইন বিভাগ পরিপূর্ণভাবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। এখানে পার্লামেন্টকে সকল কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পার্লামেন্টে উত্থাপিত হয়। পার্লামেন্টে আলোচনা ও বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। পার্লামেন্টের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। রাষ্ট্র পরিচালনার বিষয়ে পার্লামেন্টের কাছে জবাবদিহি করতে হয়।

সুশাসনের পরিবেশে মত প্রকাশের, পরামর্শদানের পর্যাপ্ত সুযোগ থাকে। ফলে এখানে শক্তিশালী সিভিল সোসাইটির উন্নয়ন ঘটে। রাষ্ট্র পরিচালনায় সিভিল সোসাইটির মতামতকে যথাযথভাবে গুরুত্ব প্রদান করা হয়। এতে শাসনকারীদের দক্ষতা উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকে। শাসনকারীরা জনমতের গতি বুঝতে পারে। প্রয়োজনে নিজেদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের উদ্যোগ নিতে পারে। শক্তিশালী ও গঠনমূলক সিভিল সোসাইটি থাকলে শাসনকারীরা নিজেদের ভুল-ক্রটি সংশোধন করার সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন। সুশাসন ও সিভিল সোসাইটি একে অপরের পরিপূরকের মতো। সুশাসনে জাতীয় ও স্থানীয় রাজনীতির শুদ্ধ ও স্বচ্ছ চর্চা থাকে। কারণ এখানে নাগরিকদের কাছে জবাবদিহি করতে হয়। নাগরিকেরা অবাধে প্রশ্ন তুলতে পারে। অশুদ্ধ ও অস্বচ্ছ চর্চার বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে পারে। অতএব সুশাসন অনেকটা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই রাজনীতিতে শুদ্ধ ও স্বচ্ছ চর্চাকে নিশ্চিত করে। সুশাসনে রাষ্ট্রীয় সম্পদের ব্যবস্থাপনা হয় উন্মুক্ত, স্বচ্ছ, জবাবদিহিতামূলক, সমতা ও ন্যায় বিচারভিত্তিক। এখানে অর্থ ব্যয়ে নাগরিকদের চাহিদা ও প্রয়োজনকে সর্বাধিক অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়। প্রতিটি প্রকল্প ও কর্মসূচি গ্রহণ করতে হয় জনমতের প্রতি লক্ষ্য রেখে। ফলে এখানে আর্থিক অনাচার, অপব্যয় অথবা অপ্রয়োজনীয় ব্যয়ের সুযোগ থাকে না। সুশাসনে সকল কাজেই নাগরিকদের ব্যাপক অংশগ্রহণ ও মতামত প্রদানের সুযোগ থাকে। এখানকার সকল কাজেই নাগরিকদের উন্নয়নে এবং তাদের স্বার্থে আইনানুগভাবে পরিচালিত হয়। এখানে রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য থাকে ন্যায় বিচার

প্রতিষ্ঠা এবং নাগরিকদের কল্যাণ সাধন করা। সুশাসনের অপর নাম অংশগ্রহণমূলক শাসন। একে ইংরেজিতে বলা হয় Participatory Governance. সুশাসনে কর্তৃত্ব অথবা আইনের অপপ্রয়োগের সুযোগ থাকে না। এখানে নৈর্ব্যক্তিকভাবে আইন প্রয়োগ করতে হয়। আইন প্রয়োগকারী এবং সাধারণ নাগরিক সকলকেই সমভাবে জবাবদিহি করতে হয়। অপরাধী অপরাধ করলে শাস্তি পাবে। আবার আইন প্রয়োগকারী ক্ষমতার অপব্যবহার করলে তিনিও আইনের আওতায় আসবেন এবং শাস্তি পাবেন। কাজেই এখানে কোনো অপরাধ সংঘটিত হলে যথাযথভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সঠিকভাবে আইন প্রয়োগ করা হয়। অপরাধ প্রমাণিত হলে অপরাধীকে আবশ্যিকভাবে শাস্তি পেতে হয়। সংক্ষেপে বলা যায়, সুশাসনে সকল

দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে Moral, Ethical and Legal Standard যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়। সকল কাজে শুদ্ধাচারকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। এখানে সকল সিদ্ধান্ত ন্যায্যতার ভিত্তিতে গৃহিত হয়।

সুশাসনের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ চিহ্নিত করা যায়ঃ

১. জনগণের অংশীদারিত্বের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনা।

২. আইনের শাসন।

৩. সকল কাজে স্বচ্ছতা।

৪. নাগরিকদের চাহিদা পূরণে ক্ষেপ্রতার সাথে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৫. সকলে মিলে বা অধিকাংশের মতামতের ভিত্তিতে কাজ করার পরিবেশ নিশ্চিত করা।

৬. সকল নাগরিকের সমান অধিকার থাকা।

৭. সরকারের সক্ষমতা ও দক্ষতা থাকা।

৮. সকল পর্যায়ে জবাবদিহিতা থাকা।

৯. কৌশলগত পরিকল্পনা থাকা।

১০. রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা থাকা।

১১. বিশৃংখল পরিবেশ না থাকা।

১২. নাগরিকদের সর্বোচ্চ সেবা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা থাকা।

১৩. জবাবদিহিতার পাশাপাশি সরকারি কর্মকর্তাদের স্বাধীনভাবে কাজ করার অধিকার থাকা।

১৪. সরকারের গ্রহণযোগ্যতা থাকা।

১৫. দুর্নীতি দমনের কঠোর ব্যবস্থা থাকা।

সুশাসন যে কোন রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠানের প্রাণ। সুশাসন থাকলে সামাজিক নিরাপত্তা থাকে। নাগরিকগণ নিরাপদে ও সাচ্ছন্দ্যে চলাফেরা ও বসবাস করতে পারেন। এখানে শক্তিশালী জাতীয় ঐক্য বিদ্যমান থাকে। সবাই মিলে দেশের ও মানুষের কল্যাণে কাজ করা যায়। ফলে আর্থ-সামাজিক বিকাশ দ্রুততর হয়। দেশের উৎপাদন বাড়ে। নাগরিকদের আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পায়। নাগরিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। শিক্ষার বিকাশ ঘটে। শিক্ষার মান উন্নত হয়। দেশ বা প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকার সক্ষমতা অর্জন করে। বিশ্ব দরবারে দেশের ও প্রতিষ্ঠানের ভাব-মূর্তি সমুজ্জল হয়। সুশাসনে সকল পর্যায়ে নাগরিকদের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে। সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিলে সিদ্ধান্তের গ্রহণযোগ্যতা থাকে। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সহজতর হয়। ভুলত্রুটি হবার আশংকা কম থাকে। ভুলত্রুটি সংশোধনের ব্যাপক সুযোগ থাকে। এ প্রসংগে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক এরিস্টটলের একটি উক্তি প্রনিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, ''একজন অতি মেধাবী মানুষের মস্তিস্কের চেয়ে তিন জন কম মেধাবী মানুষের মস্তিস্কের উর্বরতা অনেক বেশি।'' উন্মুক্ত পদ্ধতিতে সকলের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধামত্ম গ্রহণ করলে সকল পর্যায়ে দক্ষতার উন্নয়ন ঘটে। কাজের গতি ও মান বাড়ে। দক্ষতার সাথে সমস্যার সমাধান করা যায়। এতে পারস্পরিক আস্থা ও শ্রদ্ধার ভিত শক্তিশালী হয়। ফলে অস্থিতিশীলতাকে পরিহার করা যায়। সুশাসনে জবাবদিহিতা থাকার ফলে সরকারি অর্থ অপচয়, আত্মসাৎ ইত্যাদি হ্রাস করা যায়। সাশ্রয়ীভাবে সরকারি অর্থ ব্যয় নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। এখানে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, আঞ্চলিকতা ইত্যাদি রোধ/হ্রাস করা যায়। রাষ্ট্রে বা প্রতিষ্ঠানে সুশাসন থাকলে কাজের সুন্দর পরিবেশ বিরাজ থাকে। সকলেই স্বীয় কাজ স্বাধীনভাবে করতে পারে। এখানে অবৈধ, অনৈতিক তদবির/হস্তক্ষেপ করার সুযোগ কম থাকে। ফলে সামাজিক ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা যায়। এতে দেশে-বিদেশে রাষ্ট্র অথবা প্রতিষ্ঠানের সম্মান ও মর্যাদা বাড়ে। জাতি হিসেবে বিশ্ব দরবারে সদর্পে পদচারণা করা যায়।

- সুশাসনের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়াদি খুবই গুরুত্বপূর্ণ মর্মে বিবেচিতঃ
- পারিবারিক পরিবেশে সুশিক্ষা দানের মাধ্যমে সুনাগরিক তৈরি করা
- স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ বিষয়ক শিক্ষাকে গুরুত্ব প্রদান করা
- সকল স্তরে মেধা ও যোগ্যতাভিত্তিক জনবল নিয়োগ
- নিয়োগকৃত জনবলকে দ্রুত প্রশিক্ষণ প্রদান করা
- প্রশিক্ষণে দেশপ্রেম, নাগরিক সেবা ও শুদ্ধাচারকে অগ্রাধিকার প্রদান করা
- যোগ্যতাভিত্তিক পদায়ন করা
- ক্রমে স্বাধীনতা প্রদান করা

- জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ
- ভাল কাজের জন্য পুরস্কার প্রদান করা
- মন্দ কাজের জন্য শাস্তি প্রদান করা

উপরের তৃতীয় পদক্ষেপ থেকে পরবর্তী কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি প্রতিষ্ঠানে সুশাসন প্রতিষ্ঠার প্রাণ ভোমরা হলেন প্রধান নির্বাহী বা সিইও। সিইও- এর সততা, নিষ্ঠা, দক্ষতা, শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব, নিরপেক্ষতা, ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে কাজ করার মানসিকতা, সকলের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করার অভ্যাস ও সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষেপ্রতাই একটি প্রতিষ্ঠানে সুশাসন প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করতে পারে। সিইও'র ভূমিকাই সুশাসনের প্রধানতম অনুসঙ্গ। পরিবার সুনাগরিক তৈরির সূতিকাগার। একজন শিশুর আগমন ঘটে একটি পরিবারে। তার প্রথম মিথষ্ক্রিয়া হয় পরিবারের সদস্যদের সাথে। মা-বাবা, দাদা-দাদি, নানা-নানি, চাচা-ফুফু তাকে নানা জিনিস শিখতে ও কথা বলতে সহায়তা করেন। জীবনের সূচনালগ্নে সে যা শেখে তার প্রভাব আমৃত্যু থেকে যায়। তাই জন্মগ্রহণের পরে পরিবার যদি একজন শিশুকে শুদ্ধটা, সত্যটা, ন্যায়টা ধারণ ও লালন করতে দীক্ষা দেয় তাহলে সে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠার সুযোগ পায়। পরিবারের মুরুববীরা তাকে অন্যায়, অশুদ্ধ, অসত্য ও অন্যায্যটা থেকে দূরে থাকার শিক্ষা দিলে সে এগুলোকে এড়িয়ে চলতে শেখে। পরিবার হলো শিক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পাদপীঠ। একজন শিশু ভূমিষ্ঠ হয়েই আশেপাশে তাকায়। তখন তার শিহরের উপরে ঝুলিয়ে রাখা হয় দৃষ্টিনন্দন কাগজের ফুল। সে কথা বলতে পারে না। কিছুই বুঝে না। তথাপি সুন্দর ও স্বচ্ছ ফুল দেখে সে পুলকিত হয়। তার নিষ্পাপ মুখখানি হয়ে উঠে হাস্যময়। সে কিছুই বলতে পারে না। তথাপি কান পেতে শোনার চেষ্টা করে। আশার-ভালবাসার কথা বললে সে হাসে। কথকের মলিন-বদন ও ধমক শুনে সে হয় ব্যথাতুর। আলোকময় ঘরখানি সে খুব পছন্দ করে। এখানে তার জীবন খুবই স্বা''ছন্দ্যময়। সে শুয়ে শুয়ে হাসে। হাত-পা নেড়ে আনন্দ প্রকাশ করে। আলোকোজ্জ্বল পরিবেশ তার হৃদয়কে দোলা দেয়। অন্ধকার বিবর্ণ। অন্ধকারে সে কিছুই দেখতে পায় না। ফলে অন্ধকারকে সে ভয় পায়। আলো চলে গেলে সে চিৎকার করে কেঁদে উঠে। অন্ধকার তার কাছে অপছন্দ, অসহনীয় মর্মে সে সবাইকে জানান দেয়। সমগ্র জীবনকালেই এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রেই মানুষ রৌদ্রকরোউজ্জ্বল পরিবেশের পূজারী। সকল মানুষই সত্য ও সুন্দরকে বন্দনা করে। অসত্য ও অসুন্দরকে এড়িয়ে চলে। এমনকি ঘৃণা করে। সুন্দর ও সত্যকে শিশুকাল থেকেই ধারণ ও লালন করতে হয়। শিশুকাল থেকেই সু-কর্মে, সু-অভ্যাসের, সু-চিন্তার, মানবতার, শ্রেষ্ঠতার, শুদ্ধতার চর্চা করতে হয়। শিশুদেরকে ধরে ধরে যতসব ভাল জিনিস বলে ও করে দেখাতে হয়। তাহলেই তারা সু-নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। আর পরবর্তীতে তারা সু-শাসন প্রতিষ্ঠায় ইতিবাচক অবদান রাখতে পারে। শিশুদেরকে সু-শিক্ষা দেয়ার প্রধানতম প্রশিক্ষক

হলেন মা-বাবা। একজন মানব সমত্মানের সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র হচ্ছে তার অভ্যাস। সু-অভ্যাস একজন মানুষকে ভাল মানুষে, আদর্শ মানুষে পরিনত করে। সু-অভ্যাসী সকল কাজ সঠিকভাবে করতে পারে। এতে পরিবার, প্রতিষ্ঠান, সমাজ ও রাষ্ট্র উপকৃত হয়। ব্যক্তিটিও প্রতিষ্ঠিত হন সুমহান মর্যাদা ও সম্মানের আসনে। আর অভ্যাসের অনুশীলন শুরু হয় শিশুকালে পরিবারে। পরিবার শিশুটির মননে/হৃদয়ে সু-অভ্যাসগুলো পাথরের মত খোদাই করে বসিয়ে দিতে পারে। শিশুকালের সু-অভ্যাস অথবা খারাপ অভ্যাস ত্যাগ করা বেশ কঠিন। পরিবারে শিশুকে সুশিক্ষা দেয়া হলে সে আজীবনের জন্য সু-মানুষ হিসেবে গড়ে উঠে। শিশুকে সু-মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য কথনে, চলনে, আচরণে সকল ভাল গুণাবলীকে দৃশ্যমান করতে হবে। তাহলেই সে দেখে, শুনে ও অনুশীলন করে সু-শাসন বান্ধব নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে। উপরের আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, আসলেই পরিবার সুনাগরিক তৈরি ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার সূতিকাগার। পরিবার শুদ্ধ চর্চা ও সুশিক্ষার মাধ্যমে আদর্শ নাগরিক তৈরি করে দিতে পারে। আর সে নাগরিকের পক্ষেই সম্ভব সকল কু-কাজ বর্জন ও সকল সু-কর্ম সম্পাদন করে সুশাসন প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করা। বর্তমানে দেশে-দেশে দুর্নীতি সু-শাসনের অন্যতম প্রতিবন্ধক। পরিবার দুর্নীতি প্রতিরোধে শক্তিশালী ভূমিকা পালন করতে পারে। মা-বাবা জীবনের সুচনালগ্নেই শিশুদেরকে দুর্নীতির কু-ফল সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে পারে। দুর্নীতি করা অন্যায়, অনৈতিক ও পাপ, এটা শিশুদেরকে বুঝিয়ে দিতে পারে। আবার মা-বাবা দুর্নীতিগ্রস্ত হলে শিশুরাও মা-বাবার জীবনাচার নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারে। তাদের আয়ের উৎস জানতে চাইতে পারে। এতে মা-বাবা লজ্জিত-সংকুচিত হয়ে শুদ্ধ পথে ফেরার একটা সম্ভাবনা থাকে। অতএব দুর্নীতি প্রতিরোধে পরিবার Two-way Traffic হিসেবে কাজ করতে পারে। বাংলাদেশেও পরিবারকে বানাতে হবে সুনাগরিক তৈরির কারখানা। পরিবারে শিশুকে সুশিক্ষা দিতে হবে। শুদ্ধটা-সত্যটা তার মগজে ঢুকিয়ে দেয়ার চেষ্টা করতে হবে। শুদ্ধটা-সত্যটা মেনে চলার জন্য তাকে অনবরতঃ উৎসাহ দিতে হবে। অসৎ সঙ্গ, অসত্য ও মন্দটা থেকে দূরে থাকার জন্য তাকে অব্যাহতভাবে পরামর্শ দিতে হবে। পারিবারিক শিক্ষার উপর জোর দেয়া না হলে, জন্মলাভের পরপরই শিশুকে সকল বিষয়ে উত্তম চর্চা করার শিক্ষা ও দীক্ষা দেয়া না হলে সুনাগরিক পাওয়া যাবে না। সুনাগরিক ছাড়া সুশাসনও হবে না। পিতা-মাতাকে আবশ্যিকভাবে খোঁজ-খবর রাখতে হবে তার সন্তানেরা কার সাথে মিশে। খেয়াল রাখতে হবে ওরা যাতে অসৎ সঙ্গে জড়িয়ে না পড়ে। পিতা-মাতাদের অসতর্কতার কারণে অসৎসঙ্গে জড়িয়ে অনেক মেধাবী ও ভালো ছেলেমেয়েরা নষ্ট-ভ্রষ্ট হয়ে যায়। এতে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জনাব মোঃ ফয়েজুল্লাহ ১৯৬৫ ব্যাচের একজন সিএসপি কর্মকর্তা। তিনি সিলেটের জেলা প্রশাসক, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিবসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে চাকরি করেছেন। তার ছেলে রিয়াজ হামিদুল্লাহ ১৫তম বিসিএস পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় ১ম হয়েছেন। রিয়াজ বর্তমানে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের

মহাপরিচালক। রিয়াজের ছোট ভাই গবেষণাধর্মী পেশার সাথে জড়িত। ২০১০-১২ সালে আমি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব ছিলাম। তখন তিনি একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার পরামর্শক হিসেবে প্রাথমিক শিক্ষার উপর কাজ করেছেন। জনাব ফয়েজুল্লাহ আমার একজন প্রিয় মানুষ। তার সঙ্গে আমার অনেক স্মৃতি রয়েছে। তিনি একদিন প্রসঙ্গক্রমে আমাকে বলেছিলেন, 'আমার ছেলেমেয়েরা বোর্ডে ফাস্ট-সেকেন্ড হয়নি। আমি সেজন্য তাদেরকে চাপও দেইনি। তবে আমি তাদেরকে সুশিক্ষা দেয়ার চেষ্টা করেছি।

ওরা কার সাথে মিশে, কার সাথে চলাফেরা করে সেটা খোঁজ-খবর রেখেছি। ওরা যখন নাইন-টেনে উঠেছে তখন ওদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদেরকে বাসায় চায়ের দাওয়াত দিয়েছি। তাদের সঙ্গে দু'তিন ঘন্টা কথাবার্তা বলেছি। বুঝার চেষ্টা করেছি আমার সন্তানের কার সাথে মেশা উচিৎ, কার সাথে মেশা উচিৎ নয়। অতঃপর সেভাবে তাদেরকে নির্দেশনা দিয়েছি।' প্রত্যেক মা-বাবারই এমনটি করা উচিৎ। তাহলেই তাদের সন্তানেরা সুসন্তান ও সুনাগরিক হবে। তারা দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করবে। আমার নিজেরও এমন একটি অভিজ্ঞতা রয়েছে। আমার কনিষ্ঠ কন্যা মণিষা সাদিয়া নাওয়ার বর্তমানে ঢাকা মেডিকেল কলেজে দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী (কে-৭২)। সে তখন ভিকারুন্নিসা নুন স্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী। একদিন স্কুল থেকে এসে সে আমাকে জানায় যে, তাদের ক্লাসের একটি মেয়ের মা ৬৮,০০০/- টাকা দিয়ে ঈদের শাড়ি কিনেছে। মেয়েটি বন্ধুদের কাছে গর্বভরে তথ্যটি দিয়েছে। আমি খোঁজ-খবর নিয়ে দেখি যে, মেয়ের বাবা একজন তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারি। অতঃপর আমি আমার মেয়েটিকে পরামর্শ দেই, ধীরে ধীরে ঐ মেয়েটির সঙ্গ ত্যাগ করতে। আমার মেয়েকে আমি ধারণা দেই যে, ওদের জগৎ আর আমাদের জগৎ একেবারেই আলাদা। অতএব ঐ মেয়েটির সাথে আমার মেয়েটির বন্ধুত্ব থাকা সমীচীন নয়। তবে আমার মেয়েকে এ পরামর্শ দেই যে, দূরত্বটি তৈরি করতে হবে ধীরে ধীরে। খেয়াল রাখতে হবে তার বন্ধুটি যাতে অপমানিতবোধ না করে অথবা মনে কষ্ট না পায়। কেননা, সে তো নিষ্পাপ শিশু। অপরাধটি তো তার মা-বাবার। উল্লেখিত দু'টি ঘটনাও আমাদেরকে সুস্পষ্টভাবে শিক্ষা দেয় যে, পরিবারকে বানাতে হবে নৈতিক শিক্ষার, শুদ্ধাচার চর্চার বাতিঘর। অন্যথায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা দুঃসাধ্য। সুনাগরিক তৈরিতে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। শিশুরা একটু বড় হয়ে জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমণ করে। এখানকার শিক্ষকদের চলন-বলন, নীতি-নৈতিকতা, ব্যক্তিত্ব, শিক্ষাদান ইত্যাদি শিশুকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। শিশু তার মা-বাবার চেয়েও শিক্ষককে অধিকতর সঠিক ও শুদ্ধাচারী মনে করে। শিক্ষক হয়তো অসাবধানবশতঃ ভুল অংক কষলেন অথবা ভুল ইংরেজি লিখলেন। মা-বাবা সংশোধন করতে চাইলে, শিশুটি মানতে নারাজ। তার সাচ্ছা জবাব- "তোমরা

তো শিক্ষক নও, তোমরা ভাল জাননা। আমার স্যার/ম্যাডাম ভুল করতেই পারেন না।

তোমাদেরটা ভুল ।'' শিশুটির বিশ্বাস তার শিক্ষকটি সর্বশুদ্ধ মানুষ । তিনি সব জন্ম । শিশুকালে শিক্ষকদের প্রতি শিশুরা অন্ধ ভক্ত থাকে । শিক্ষক সৎ, শুদ্ধটা চর্চা করে অভিন্নটা করার জন্য শিশুকে দীক্ষা দিতে পারেন । এ দীক্ষা আজীবনের জন্য শিশুর হৃদয়ে গেঁথে যায় । এটা শিশুর জীবনে অপ্রতিরোধ্য ভাল অভ্যাসে পরিনত হয় । শত প্ররোচনার মাঝেও সহজে সে নষ্ট-ভ্রষ্ট হতে পারে না । সৎ ও শুদ্ধ অভ্যাসের বশবর্তী হয়ে সে সকল ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠা চর্চা করে । এতে অনেকটা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই তৈরি হয় সুশাসনের আভা। মনতলী, কুমিল্লা জেলার নাঙ্গলকোট উপজেলার রায়কোট ইউনিয়নের একটি মাঝারী গ্রাম । এ গ্রামে ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে একটি প্রাইমারী স্কুল স্থাপিত হয় । এ স্কুলের প্রথম প্রধান শিক্ষক রঙ্গু মিয়া স্যার । তিনি ছিলেন একজন শুদ্ধাচারী মানুষ । আজীবন তিনি স্কুল শুরু হবার ১ ঘণ্টা আগে স্কুলে পৌঁছতেন । স্কুল ছুটির ১ ঘণ্টা পরে স্কুল ত্যাগ করতেন । তিনি অনেক আগে মারা গেছেন । কিন্তু তার এ সময়নিষ্ঠতা এখনও অনেক ছাত্রের হৃদয়ে গ্রথিত আছে । তারা এখনও মনেপ্রাণে রঙ্গু মিয়া স্যারের সময়নিষ্ঠতা ও শুদ্ধাচার মেনে চলার চেষ্টা করেন । রঙ্গু মিয়া স্যার তার সময়নিষ্ঠতার অভ্যাসটি বেশ পাকাপোক্তভাবে স্বীয় শিক্ষার্থীদের হৃদয়ে ও মননে প্রথিত করে গেছেন । তাই তার অবর্তমানেও সে অভ্যাস নিরন্তরভাবে কাজ করে চলেছে। বাংলাদেশের সকল শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমন্ডলী স্বীয় শিক্ষার্থীদের মাঝে সু-অভ্যাসগুলো অনুশীলন করাতে পারেন । এতে তারা ভাল চিন্তা-চেতনায় রপ্ত হবেন । ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবে । এক্ষেত্রেও সিংগাপুর একটি অনন্য রোল মডেল । সিংগাপুরের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলোতে নৈতিক শিক্ষার উপর অপরিসীম গুরুত্ব দেয়া হয় । সেখানে লেখাপড়ার মূল চেতনাই হলো ভাল কাজ করার জন্য তৈরি হওয়া । এরিস্টটল রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক । তিনি শিক্ষাদানের জন্য লাইসিয়াম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । লাইসিয়ামের মাধ্যমে তিনি শিক্ষাদান করতেন । এ শিক্ষার মূল ভিত্তি ছিল ''নৈতিক শিক্ষা'' । নৈতিকতাবিহিন শিক্ষা নিষ্ফল শিক্ষা । এ শিক্ষা পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র কারই তেমন একটা কাজে আসে না । এখানে এরিস্টটলের একটি উক্তি উল্লেখ করা যেতে পারে । তিনি বলেছেন, ''শিক্ষার উদ্দেশ্য বিদ্যা অর্জন নয়, কর্মস্পৃহা বাড়ানো ।'' এ উক্তিটি আমাদের জন্য প্রেরণাদায়ক হতে পারে। আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে কর্মযোগী হিসেবে গড়ে তোলা । তাহলেই তারা প্রিয় দেশমাতৃকার জন্য ভাল কাজ করবে । দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হবে । আমরা আগেই একমত হয়েছি যে, সুশাসন প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় শক্তিশালী মাধ্যম হচ্ছে স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় । এগুলোতে নৈতিক শিক্ষার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে । এখানে শিক্ষার্থীদেরকে উত্তম চর্চা করার শিক্ষা ও দীক্ষা দিতে হবে । প্রতিনিয়ত তাদেরকে শুদ্ধ ও সৎ পথে থাকার জন্য অনুপ্রাণিত করতে হবে । আমি গত সাড়ে চার বছর প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করি । আমরা আমাদের প্রশিক্ষণার্থীদেরকে শুদ্ধাচার চর্চা করার, দুর্নীতি মুক্ত থাকার, মানবতাবাদী হবার, সেবা প্রত্যাশীদেরকে উত্তম সেবা প্রদানের জন্য উৎসাহিত করার চেষ্টা করি ।

তখন তাদের কেউ কেউ প্রশ্ন করেন, এ পর্যায়ে এসে পরিবর্তন হওয়া সম্ভব কিনা? স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে নৈতিক শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিলে তারা এ প্রশ্নটি করার সুযোগ পেতেন না। নবীন কর্মকর্তারাও পরামর্শ দেন যে, সুনাগরিক তৈরি ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হলে অনিবার্যভাবে সর্বাগ্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নৈতিক শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। তবে তরুণ অফিসারদের উদ্দেশ্য বলবো, একজন মানুষ যে কোন পর্যায়ে বদলে যেতে পারে। অসত্য পথ থেকে সত্য পথে আসতে পারে। অন্ধকার ত্যাগ করে আলোর অনুসন্ধান করতে পারে। অশিক্ষাকে পরাজিত করে উচ্চ শিক্ষার জগৎ জয় করতে পারে। মনমোহন বর্মণ। বয়স ৮০ ছুঁই ছুঁই। নিবাস লালমনিরহাট জেলার হাতিবান্ধা উপজেলার পূর্ব বেজগ্রাম। জন্ম ১৯৩৮ সালে। তিনি ছিলেন একজন স্কুল শিক্ষক। ২০০০ সালে অবসর গ্রহণ করেন। ২০১৫ সালে তিনি রংপুর কারমাইকেল কলেজ থেকে ইংরেজিতে মাস্টার্স করছেন। ইতোমধ্যে মাস্টার্সের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা শেষ হয়েছে। শুধু তাই নয় ভবিষ্যতে তিনি ইংরেজিতে পিএইচডিও করতে চান। এতে প্রমাণিত হয় যে, শিক্ষার, সৎ পথে আসার, শুদ্ধ-সত্য গ্রহণ করার কোন বয়স নেই। একজন মানুষ জীবনের যে কোন পর্যায়ে সুশাসনের কর্মী হতে পারেন। পরোপকারের জন্য, মানব কল্যাণের জন্য নিজের জীবন বিলিয়ে দিতে পারেন।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি সত্য ঘটনার অবতারনা করা খুবই প্রাসঙ্গিক। এ ভদ্রলোক আমার পরিচিত। আমরা একসঙ্গে কাজ করেছি। তিনি একজন সজ্জন মানুষ। তবে সীমিত আকারে অনৈতিকভাবে অর্থ-বিত্তের প্রতি মোহ ছিল। তিনি সিভিল সার্ভিসের বেশ উঁচু পর্যায়ে পৌঁছেছিলেন। সরকারি চাকরি থেকে অবসর নেয়ার পর তিনি একেবারে বদলে যান। অবৈধ পথে আয়-রুজির স্মৃতি তাকে পীড়া দিতে থাকে। তিনি কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হন। মুক্তি লাভের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেন। অবশেষে সকল ধন-সম্পদ বিক্রি করে পরোপকারে বিলিয়ে দেন। এ ভদ্রলোক অবসর গ্রহণের পর শুদ্ধাচারের পথ খুঁজে পেয়েছিলেন। আর নবীন অফিসারদের তো মাত্র যাত্রা শুরু। তাদের সামনে এখনও অফুরন্ত সময়। তারা এখনই শুদ্ধাচারের, সত্য চর্চার ও সুশাসনের দীক্ষা নিলে বাংলাদেশ পাবে সোনালী ভবিষ্যৎ। ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে চীনের রাজধানী বেইজিং-এ সুশাসন বিষয়ক একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সম্মেলনে প্রায় ১১০টি দেশের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। এতে উন্নত ও উন্নয়নশীল উভয় ধরণের রাষ্ট্র ছিল। প্রতিনিধিদের মধ্যে দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রধান, এটর্নি জেনারেল/সলিসিটর জেনারেল, ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তা এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। সুশীল সমাজ ও বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিরাও ছিলেন। একজন আলোচক মতামত প্রদান করেন যে, অনেক দেশে প্রচলিত আইন-কানুন হাল-নাগাদ করা নেই। ঐ সকল দেশে মান্ধাতার আমলের আইন-কানুন প্রচলিত রয়েছে। অতএব আইনের সংশোধন/সংস্করণ/ পরিমার্জন/ নতুন আইন প্রণয়ন প্রয়োজন। অন্যথায় ঐ সকল দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা

করা সম্ভব হবে না। আইন সংশোধন ও নতুন আইন প্রণয়নের বিষয়ে কুক আইল্যান্ডের সলিসিটর জেনারেল (একজন লেডি) প্রবল আপত্তি উত্থাপন করেন। তিনি বলেন যে, "আমি দীর্ঘদিন যাবত কুক আইল্যান্ডের সলিসিটর জেনারেল। এ সুবাদে আমার বিশ্বের নানা দেশের আইন-কানুন ঘাটাঘাটি করার সুযোগ হয়েছে। সে অভিজ্ঞতার আলোকে আমি মনে করি বিদ্যমান আইন সংশোধন, পরিমার্জন অথবা নতুন আইন প্রণয়নের কোনো প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন বিদ্যমান আইনের নৈর্ব্যক্তিক ও যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা। বিদ্যমান আইন সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হলে এ সকল আইন দিয়েই সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।"আসলে শুধুমাত্র নতুন নতুন আইন প্রণয়ন করে সুশাসন বা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। সুশাসন প্রতিষ্ঠার বিষয়টি নিভ্রর করে প্রচলিত আইনের যথাযথ প্রয়োগের উপর। অপরাধীকে শাস্তি প্রদানের একমাত্র লক্ষ্য তাকে কষ্ট দেয়া নয়। শাস্তি প্রদানের মূল উদ্দেশ্য হলো সকল নাগরিককে অপরাধ সংঘটনের পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করা। অর্থাৎ একজনকে শাস্তি দিয়ে অন্যদেরকে জানান দেয়া যে, 'তোমরা সকলেই আইনের আওতায় আছো। আইন ভঙ্গ করলে তোমরাও অনুরূপ শাস্তি পাবে।' কাজেই ঠিকমতো আইন প্রয়োগ করা হলে অপরাধী শাস্তি পাবে। আর এতে অন্যেরা আইন ভঙ্গ করতে ভয় পাবে। ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সহজতর হবে। যত উৎকৃষ্ট আইনই প্রণয়ন করা হোক না কেন, তা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন বা প্রয়োগ না করা হলে সে আইন কোন কাজে আসে না। এ ধরণের আইন সুশাসন প্রতিষ্ঠায়ও কোনো ভূমিকা রাখতে পারে না। কুক আইল্যান্ড রাষ্ট্রটি নিউজিল্যান্ডের পাশে অবস্থিত। এটি একটি ছোট্ট দেশ। ২০০৪ সালে লোকসংখ্যা মাত্র ১৪,০০০। দেশটি স্বাধীন, সার্বভৌম। তবে বৈদেশিক নীতি এবং সামরিক নিরাপত্তার জন্য তারা নিউজিল্যান্ডের উপর নির্ভরশীল। এছাড়া অন্য সকল বিষয়ে নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিতে পারে। কুক আইল্যান্ডের সলিসিটর জেনারেলের বক্তব্যে নির্যাস তুলে ধরা হলো-"আমি প্রায় দীর্ঘদিন যাবত কুক আইল্যান্ডের সলিসিটর জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। আমি ইউরোপ, আমেরিকা, এশিয়া ও আফ্রিকার অনেক দেশের সংবিধান ও আইন-কানুন পড়ে দেখার সুযোগ পেয়েছি। কোথাও নতুন আইন প্রণয়নের প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। উন্নয়নশীল দেশসমূহের প্রধান সমস্যা হলো আইনের যথাযথ প্রয়োগ না থাকা। এখানে অনেক ক্ষেত্রে আইনের অপপ্রয়োগ হয়। বিদ্যমান আইনসমূহ নিরপেক্ষতা ও স্বচ্ছতার সাথে প্রয়োগ নিশ্চিত করা গেলে এ সকল আইন দিয়েই সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব।" তিনি দাবী করেন যে, তার দেশটি একেবারেই ছোট্ট একটি দেশ। তার দেশে একজন প্রেসিডেন্ট, একজন ভাইস প্রেসিডেন্ট ও একজন প্রধানমন্ত্রী রয়েছেন। সেখানে রয়েছে শক্তিশালী পার্লামেন্ট। স্পীকারের নের্তৃত্বে পার্লামেন্ট বেশ শক্তিশালী ও কার্যকর। তিনি দাবী করেন যে, তার দেশে সুশাসন বিদ্যমান। কুক আইল্যান্ডের সলিসিটর জেনারেলের জোরালো বক্তব্যের পর হাউজ তার সাথে একমত পোষণ করে। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের দু'একটি উদাহরণ কুক আইল্যান্ডের সলিসিটর

জেনারেলের বক্তব্যের সংগে সঙ্গতিপূর্ণ হতে পারে। জনাব আকমল হোসেন ছিলেন ১৯৬৯ এর ব্যাচের একজন সিএসপি কর্মকর্তা। তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরপরই বৃহত্তর ঢাকা জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ছিলেন। তখন ঢাকা জেলার পরিধি ছিল বর্তমান ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, নরসিংদী, গাজীপুর ও মানিকগঞ্জ জেলা নিয়ে। আকমল সাহেবের কর্মকালে একজন তহশিলদার ২৩ টাকা আত্মসাৎ করেছিলেন। এ অপরাধে তিনি তহশিলদারকে চাকরি থেকে চুড়ান্তভাবে বরখাস্ত করেন। ১৯৮৩-৮৪ সালে আমি শাহবাগস্থ সিভিল অফিসার্স ট্রেনিং একাডেমিতে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করি। তখন তিনি আমাদেরকে পড়াতে এসেছিলেন। মাত্র ২৩ টাকার জন্য বরখাস্তের যুক্তি ব্যাখ্যা করে তিনি আমাদেরকে বলেছিলেন, '২৩ টাকা তেমন বড় অংকের টাকা নয়। তথাপি কয়েকটি কারণে আমি তাকে বরখাস্ত করেছিলাম।

১. ২৩ টাকা আত্মসাতের জন্য তাকে শাস্তি দেয়া না হলে তিনি পরে আরও বড় অংকের টাকা আত্মসাৎ করার জন্য দুঃসাহসী হয়ে উঠার আশংকা ছিল।
২. ২৩ টাকা আত্মসাতের জন্য একজন তহশিলদারকে বরখাস্তকরণের মাধ্যমে পুরো ঢাকা জেলার সকল তহশিলদারকে এই মেসেজ দেয়া হয়েছিল যে, You all are under surveillance. If anyone of you misappropriate the public money or show any negligence to your duties, I will not spare anybody. I will impose severe punishment on all of you for any misconduct.

১৯৮৫ সালে আমি কিশোরগঞ্জ জেলায় একজন শিক্ষানবিস সহকারী কমিশনার ও ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কর্মরত ছিলাম। জেলা প্রশাসক ছিলেন জনাব এম এ মান্নান। জেলা ও দায়রা জজ ছিলেন জনাব এম এম রুহুল আমিন। তিনি পরবর্তীতে বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন একজন বিনয়ী, সজ্জন, সত্যাশ্রয়ী, শুদ্ধাচারী, বন্ধুবৎসল ও ধার্মিক মানুষ। আমার কাছে তিনি ছিলেন একজন আদর্শ মানব সম্মান। নিঃঅহংকার, সহজ-সরল, ভদ্র-বিনয়ী এ মানুষটি একটি কঠোরতম প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তাড়াইল উপজেলা মুন্সেফ কোর্টের একজন পিওন মুন্সেফ সাহেবের নাম বলে একটি মুদি দোকান থেকে বাকিতে ৭১ টাকার সদাই নিয়েছিলেন। প্রকৃত ঘটনা ছিল সদাইয়ের জন্য মুন্সেফ সাহেব পিওনকে পাঠান নি। সদাই বাকি নেয়ার বিষয়টি মুন্সেফ সাহেব অবগতও ছিলেন না। মুন্সেফ সাহেবের অজান্তে তার নাম ভাঙিয়ে পিওন নিজের জন্য সদাই নিয়েছিলেন। পরে বিষয়টি মুন্সেফ সাহেব জানতে পারেন। অতঃপর তিনি পিওনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা ও দায়রা জজ এর নিকট অভিযোগপত্র পাঠান। তৎপ্রেক্ষিতে জেলা ও দায়রা জজ সকল আনুষ্ঠানিকতা প্রতিপালনপূর্বক ঐ পিওনকে চাকরিচ্যুৎ করেন। এক্ষেত্রেও জেলা ও দায়রা জজ যুক্তি প্রদর্শন করেন যে,

১. ৭১ টাকার অংকটি বড় কিছু নয়। তবে বিচারালয় পবিত্র জায়গা। বিচারক সাধারণ নাগরিকদেরকে ন্যায় বিচার প্রদানের জন্য সর্বশেষ অভিভাবক। পিওন বিচারকের সঙ্গে কাজ করেন। এখন তাকে কঠোর শাস্তি দেয়া না হলে পরবর্তীতে সে খুনের মামলায় বা ডাকাতির মামলায় অব্যাহতি দেয়ার কথা বলে হয়তো লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করার জন্য দুঃসাহসী হয়ে উঠবে। তাই তাকে থামানো দরকার।

২. তদুপরি তাকে শাস্তি দেওয়া না হলে আদালতের সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য কর্মচারীরাও দুর্নীতি ও অসদাচরণ করে ন্যায় বিচারের জন্য হুমকি সৃষ্টি করতে পারে। তাই এ শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে তাঁদেরকেও সতর্ক করা অত্যাবশ্যক।

জনাব আকমল হোসেন এবং জনাব এম এম রুহুল আমিন প্রচলিত আইন কঠোরতমভাবে প্রয়োগ করেছেন। এতে অপরাধী শাস্তি পেয়েছে। অন্যেরা বার্তা পেয়েছে যে, অপরাধ করলে রেহাই পাওয়া যাবে না। প্রচলিত আইন নৈর্ব্যক্তিকতার সাথে কঠোরভাবে প্রয়োগ করলে অপরাধীরা অপরাধ করার সাহস ও সুযোগ পাবে না। এতে দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনা, কর্মে অবহেলা, সরকারি অর্থ আত্মসাৎ ও অপচয় এবং নাগরিক হয়রানি হ্রাস পাবে। সবাই আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে। আইন মানবে। আর এতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবে। অতএব সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য বিদ্যমান আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। নতুন নতুন আইন প্রণয়ন অপেক্ষা আইনের প্রয়োগকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কুক আইল্যান্ডের সলিসিটর জেনারেল তার অভিজ্ঞতার ভান্ডার থেকে সঠিক অভিমতই তুলে ধরেছিলেন। বাংলাদেশেও প্রচলিত আইন, বিধি-বিধান ও নিয়ম-নীতি সঠিকভাবে প্রয়োগ করা গেলে এখানে সুশাসন প্রতিষ্ঠা কঠিন বা অসাধ্য কাজ নয়। বেইজিং-এ অনুষ্ঠিত দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা বিষয়ক সম্মেলনে কুক আইল্যান্ডের সলিসিটর জেনারেল রাষ্ট্র ও প্রতিষ্ঠানসমূহে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য কতগুলো পরামর্শ তুলে ধরেন। তার মতে যে কোন রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠানে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য এ বিষয়গুলো অপরিহার্য। যেমন-

১. মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে জনবল বাছাই ও নিয়োগ করা;
২. নিয়োগের জন্য চূড়ান্তভাবে বাছাইকৃত জনবলকে কর্মজীবনের শুরুতেই নিবিড় প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
৩. সকল পর্যায়ে মেধা, যোগ্যতা ও দক্ষতার ভিত্তিতে জনবল পদায়ন নিশ্চিত করা;
৪. সকল পর্যায়ে কর্মের স্বাধীনতা প্রদান করা;
৫. সকল পর্যায়ে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা থাকা;
৬. দুর্নীতি ও খারাপ কাজের জন্য কঠোর শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা রাখা এবং শাস্তি প্রদান নিশ্চিত করা;

৭. উত্তম কাজের জন্য পুরস্কার/প্রেষণা প্রদান করা;

কুক আইল্যান্ডের সলিসিটর জেনারেলের জোরালো বক্তব্য এবং উল্লেখিত পরামর্শ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। উপস্থিত সকলেই একমত পোষণ করেন যে, উল্লিখিত বিষয়গুলো যথাযথভাবে চর্চা ও প্রয়োগ করা গেলে শত সীমাবদ্ধতার মাঝেও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অগ্রগতি সাধন সম্ভব। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, বিশ্বের উন্নত দেশসমূহে পরিবার ও স্কুল-কলেজে নৈতিক শিক্ষাকে গুরুত্ব দেয়া হয়। অন্যান্য দেশেও নৈতিক শিক্ষাকে অধিকতর অগ্রাধিকার দিতে হবে।

রাষ্ট্রীয় সুশাসন প্রতিষ্ঠার বিষয়টি অতি ব্যাপক। এক্ষেত্রে সর্বাগ্রে প্রয়োজন অদম্য রাজনৈতিক ইচ্ছাশক্তি। প্রবল রাজনৈতিক ইচ্ছাশক্তি ছাড়া সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা খুবই কঠিন। কেননা, সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য নানা রকম প্রতিকূল অবস্থা মোকাবিলা করতে হয়। নিতে হয় অনেক বড় রকম ঝুঁকি। শুধুমাত্র রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষই এ ধরণের প্রতিকূল অবস্থা মোকাবিলা করার সক্ষমতা থাকে। তবে এক্ষেত্রে আমলাতন্ত্রকে প্রধান সহযোগীর ভূমিকা পালন করতে হবে। আর নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সিভিল সার্ভেন্টেরা ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারেন। রাজনৈতিক অঙ্গনের সুবিশাল আঙ্গিনায় প্রবেশের সুযোগ আমাদের নেই। সে চেষ্টা করাও আমাদের জন্য সমীচীন নয়। তাই এখানে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠার বিষয়টি আমরা আলোচনা করবো না। আমাদের মত সরকারি কর্মকর্তারা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব পালন করে থাকি। আমরা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করি। একজন সরকারি কর্মকর্তা কিভাবে তার প্রতিষ্ঠানে সুশাসন নিশ্চিত করতে পারেন, এখানে অভিজ্ঞতার আলোকে সে বিষয়টি আলোচনা করাই উত্তম। এতে নবীন/কনিষ্ঠ কর্মকর্তাগণ কিছুটা হলেও অভিজ্ঞতা ও অনুপ্রেরণা লাভের সুযোগ পেতে পারেন।

তদুপরি সুশাসন প্রতিষ্ঠায় পরিবার ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকার বিষয়টিও প্রাসঙ্গিভাবে আলোচনার প্রয়োজন হবে। কেননা, যে কোন রাষ্ট্রে, যে কোন পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন সুনাগরিক। অন্য কথায় বলা যায়, সত্যাশ্রয়ী, শুদ্ধাচারী, দেশপ্রেমিক, ত্যাগী, পরমতসহিষ্ণু, ভদ্র-বিনয়ী ভালো নাগরিক ছাড়া সুশাসন প্রতিষ্ঠার কাজ এগিয়ে নেয়া অসম্ভব। আর এ ধরণের সুনাগরিক তৈরির সর্বাধিক শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানগুলো হলো-পরিবার, সমাজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সিঙ্গাপুর এশিয়ার একটি ছোট্ট দেশ। কিন্তু আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে, সুশাসনে বিশ্ব সেরা। সিঙ্গাপুরকে বিবেচনা করা হয় উত্তম সুশাসনের দেশ হিসেবে। সেখানে আইনের শাসন ও ন্যায় বিচার বিদ্যমান থাকার বিষয়টি স্বীকৃত। ২০০৪ সালে সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত একটি কর্মশালায় সে দেশের একজন সচিবের সঙ্গে আমার মত বিনিময় করার সুযোগ হয়েছিল। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তোমরা সুশাসনের ক্ষেত্রে এত অগ্রগতি সাধন করলে কিভাবে? তিনি আমাকে নিমণরূপ জবাব দিয়েছিলেন-

১. আমাদের দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হচ্ছে

পরিবার। একটি শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পর পরিবার তাকে ভাল ভাল আচরণগুলো শেখায় ও অভ্যস্ত করায়। অন্যায়-অসুন্দরটা সে দেখতে বা শিখতে পারে না। ফলে একটি শিশু কানে শুনে উত্তমটি। চোখে দেখে উত্তমটি। তাকে পরামর্শ দেয়া হয় উত্তমটি চর্চা করতে। ফলে সে জন্মেই সুনাগরিক হবার দীক্ষা পায়।

২. সিঙ্গাপুরে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় সর্বত্রই উচ্চতর নৈতিক শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। শিক্ষার প্রতিটি পরতে পরতে থাকে নীতি-নৈতিকতা, মূল্যবোধ, সততা, শুদ্ধাচার ও দেশপ্রেমের দীক্ষা। থাকে মানবতা, পরোপকার ও ত্যাগের অনুপ্রেরণা। এতে একজন তরুণ শুদ্ধ ও সৎ পথে চলার এবং দুর্নীতি ও অনাচার থেকে দূরে থাকার উদ্দীপনা পায়।

৩. সিঙ্গাপুরে সর্বস্তরে রয়েছে সর্বোচ্চ জবাবদিহিতা। অপরাধ করলে কোন ক্ষমা নেই। প্রমাণিত অপরাধের জন্য শাস্তি ভোগ করা অনিবার্য। অপরাধের রকম-ভেদ অনুযায়ী রাস্তায় প্রকাশ্য থেকে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত শাস্তির বিধান রয়েছে। আর এ শাসিত্ম যথাযথভাবেই প্রয়োগ করা হয়।

৪. সিঙ্গাপুরে সকল সত্মরে সেরাটার সাথে স্বচ্ছ ও সুস্থ্য প্রতিযোগিতা নিত্যদিনের সঙ্গী। একই অফিসে কর্মরত দু'জন সহকর্মী ও বন্ধুর প্রচেষ্টা থাকে সেরাটা করার। দক্ষতায়, মেধায়, সততায়, কর্মসম্পাদনের ক্ষেপ্রতায় একজন যাতে আরেকজন থেকে পেছনে না পড়ে যায়, এজন্য তারা সতর্ক থাকে। একইভাবে বসের সাথেও পরিচ্ছন্ন প্রতিযোগিতা চলে। সেরাটা, উত্তমটা করার জন্য প্রতিষ্ঠানে, প্রতিষ্ঠানেও চলে শুদ্ধ ও স্বচ্ছ প্রতিযোগিতা। যেমন, বিপিএটিসির সিইও এবং অন্যেরা সতর্ক থাকবেন তারা যাতে অন্য কোন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ ও সেবার মানে পেছনে না পড়ে যান। অন্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে সেরাটা চর্চা করেন সেটা বিপিএটিসি খোঁজ-খবর রাখবে। আর নিজেরা আরো সেরা হবার চেষ্টা করবে। এভাবে সিঙ্গাপুরে শুদ্ধাচার ও শ্রেষ্ঠত্বের চর্চা করা হয়। ফলে সেখানে সুশাসন প্রতিষ্ঠা সহজতর হয়েছে।

সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সমাজের ভূমিকাও অনস্বীকার্য। সমাজ ন্যায়ের পথে ঐক্যবদ্ধ থাকবে। নিজেরা আইন মানবে। শুশৃঙখল জীবন-যাপন করবে। পরোপকার, মানবতা, সহমর্মিতা প্রদর্শন করবে। অন্যায়-অবৈধ কর্ম ও পন্থা থেকে দূরে থাকবে। হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি এগুলোকে এড়িয়ে চলবে। সমাজের তরুণদেরকে সৎ পথে চলার, সুকর্ম করার জন্য উৎসাহ দেবে। তাদেরকে খারাপ কাজ করা থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেবে। সুনাগরিক তৈরি ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সমাজের অনেক অবদান রাখার সুযোগ রয়েছে। সমাজ ঐক্যবদ্ধ হয়ে যুব সমাজের জন্য গঠনমূলক, শিক্ষামূলক কার্যক্রম হাতে নিতে পারে। বিভিন্ন সভা-সমিতির মাধ্যমে যুব সমাজকে পরোপকারে, ত্যাগে, সুপথে ধাবিত হবার জন্য অনুপ্রাণিত হবার সুযোগ করে দিতে পারে। এ প্রসঙ্গেও একটি সত্য ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে।

ঘটনাটি ৭/৮ বছর আগের। একজন নবীন কর্মকর্তা দুর্নীতির দায়ে গ্রেফতার হন। তিনি ছিলেন সদ্য বিবাহিত। বরের গ্রেফতারে তার সহধর্মিনী ও সহধর্মিনীর পরিবার অপমানিত বোধ করেন। সদ্য বিবাহিত মেয়েটি দুর্নীতির দায়ে গ্রেফতার হওয়া স্বামীকে তালাক দেন। এভাবে সমাজ যদি অশুদ্ধ পথে চলা মানুষদেরকে এড়িয়ে চলেন, গুরুত্ব না দেন তাহলে সমাজে কুপথে চলা মানুষের সংখ্যা হ্রাস পাবে। আর এতে প্রসারিত হবে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ।

ISSN 1605 - 7023

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা
পঞ্চদশ বর্ষ সংখ্যা
১৪২২ বঙ্গাব্দ/২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

গজলের অর্থবোধকতা, বিষয়বস্তু ও ভাবগম্ভিরতা

মোঃ সোহেল ইমাম খান *

***Abstract**: The original meaning of Gazelle is fascinating, wide-eyed, restless, fickle and speedy deer. The meaning of Gazelle is also the same. Yet the Arabic word Gazelle denotes talking to a woman or conversation with the beloved. Dictionaries and researchers have defined in various ways. What is found from the analysis of these is that gazelle is a kind of erotic lyrical poetry. Multivariate feeling of corporeal or abstract love, affection, erotic attraction, aversion, reconciliation, estrangement, devotion, longing or an emotional outburst of poetry with a definite structure expedient for lyric poetry is expressed in a gazelle. The main issue of gazelle is related to issues concerned with love and mainly with erotic sentiment. This erotic sentiment is sometimes improper, unattainable, forbidden, rare and impertinent. Again it is like being mad on love, beset with all pervasive dolefulness of separation or madden beloved, is lonely mate less afflicted with agony but ecstatic. Again, this lamentation is an embodiment of profound wisdom and philosophical expression or satire. At the same time simplicity, frankness, or mystery of the creations and transcendentalism are expressed in the gazelle. Consequently, cosmic issue mysticism or sophism is profoundly planted into gazelle alongside the expression of the love. Behind the sensual love, and less profound transcendental feeling, from simplicity to form, perceptible to imperceptions, from human Experian of love to heavenly love everything is possible to extract the essence of gazelle.*

ভূমিকা

'হস্তী হ্যায় নাহ্ কুছ অদম্ হ্যায়, গালিব
আখির তো কেয়া হ্যায়, অয় নেহি হ্যায়'
সব আছে নাকি কিছুই নেই এটাই প্রশ্ন, গালিব
শেষতক্ ব্যাপারটা কি? নাকি কোন ব্যাপারই নেই॥

নশ্বর এবং অতি সংক্ষেপিত জীবনে চির জিজ্ঞাসার-এ দোলাচলে উচাটন হৃদয়ে দুদণ্ড শান্তি এনে দেয় যে ভাবনা 'গজল ও তার অনুষঙ্গ' তার মধ্যে অন্যতম। গজলের ভাষা বোঝা-না বোঝার অতিন্দ্রীয় অনুভূতির জগতে অবগাহনের সুযোগ করে দেয়। সুর ও সঙ্গীত চিরকালই মানুষকে আকর্ষণ করেছে। গজলে ব্যবহৃত উর্দু/ফারসির শব্দ, বাক্য,

* পরিচালক (উপ-সচিব), বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা

অনুষঙ্গ, ঐ সুরের টানেই জটিলতার ঊর্দ্ধে উঠে নিজেকে দিয়েছে অনির্বচনীয়তার স্বাদ। গজলকে মনে হয় অপার্থিব জগতের সঙ্গীত। এ সঙ্গীত যেন বিশুদ্ধতার কথা বলে, শুদ্ধ জীবনযাপনের কথা বলে, নিয়ে চলে মহাকালের সাথে। গজল গায়কি দ্বারা গজলগুরুগণ লাইট ক্ল্যাসিকের মেলোডিতে সুরের ভেলায় ভাসিয়ে নিয়ে যায় অনন্তের পথে। গজলের এ জগৎ অনন্য, অনবদ্য, নিটোল। শের ও শায়েরি, গজল, মেহফিলে মুশায়েরা মধ্যপ্রাচ্যের প্রাচীর ডিঙিয়ে প্রাচ্য ও প্রাতিচ্যের কোনায় কোনায় ছড়িয়ে দিয়েছে রঙ।

গজলের রঙে রঙিন হওয়ার চেষ্টার অন্যতম প্রধান বাধা ভাষা। আরবীতে উৎপত্তি, ফারসীতে বিকাশ এবং উর্দুতে জনারণ্যে পরিচিতি-এ গজলের। মারাঠী, গুজরাটি, পশতু, হিন্দি, ইংরেজী এমনকি বাংলাতেও গজল লেখা হয়েছে এবং হচ্ছে। কিন্তু গজলের এই মণিমানিক্যের জগতে 'কোহিনূর' গুলি রয়ে গেছে ফার্সী/উর্দুতেই। ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতায় এ দু'টি ভাষায়ই অনেকটা বিজাতীয় এবং অপাঙক্তেয়। এটি ভাষার দোষ নয় জানি।

গজল রোশনাই-এ কিছুটা আলোকিত হতেই এই কিঞ্চিৎকর চেষ্টা। এটি কিন্তু আক্ষরিক অর্থেই বলা। উর্দু কি ফারসী সাহিত্য/ভাষা বলতে গেলে বোধগম্যতার বাইরে। সঙ্গীতের ধ্রুপ্রদী ব্যাকরণ সম্পর্কেও অনভিজ্ঞ। সম্বল বলতে গজলের প্রতি অগাধ ভালোবাসা আর এ সম্পর্কে যারা জানেন তাঁদের কিছু কিছু লেখা পড়ার সৌভাগ্য।

মীরের কথা এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে মনে পড়ছে-

'কারে কেয়া কাহু দিলভি তো মজবুর হ্যায়
জমীন সখত হ্যায়, আসমাঁ দূর হ্যায়'।

অর্থাৎ- হৃদয়তো আপ্লুত হয়ে আছে, কিন্তু করি কি
মাটিতো কঠিন, আসমান তো অনেক দূর।

গজল বিষয়টি বোঝার জন্য পুরো আলোচনাকে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট কাঠামোতে ভাগ করা হয়েছে। এতে গজলের উৎপত্তির সংক্ষিপ্ত তথ্য, গজলের বিষয়বস্তু, বৈশিষ্ট্য ও অর্থবোধকতার সঙ্গে তার ভাবগাম্ভীর্য ও আলোচনায় আনা হয়েছে। সুফীজমের সঙ্গে গজলের সম্পর্ক মেলানোর চেষ্টা করা হয়েছে এবং উপসংহারে মানুষের হৃদয়ে গজল এবং তার সুরমাধুর্যের বিষয়টি উপস্থাপন করা হয়েছে।

জীবনকে বুঝতে গিয়ে পৃথিবীর নানা আয়োজনের দিকে চোখ রেখে প্রতিতুলনায় নিজেকে দেখতে গিয়ে আমরা ধন্ধে পড়ে যাই বারবার। দেখি: (সেলিম কাওসার-এঁর গজল)

ম্যায় খ্যায়াল হুঁ কিসি আওর কা মুঝে সোচতা কোই অওর হ্যায়
সার-এ-আয়না মেরা আক্স হ্যায় পাস-এ-আয়না কোই অওর হ্যায়
I am somebody else's thought, but someone else thinks about me
In front of the mirror I am standing, but behind the mirror it's someone else.

ক) গজলের উৎপত্তির সংক্ষিপ্ত কথকতাঃ

বর্তমান গজলের 'গজল' হয়ে ওঠার কাহিনী অন্ততঃ দেড় হাজার বছরের বিবর্তনের ইতিহাস, যার মূলে রয়েছে প্রাচীন আরব্য কাব্য সাহিত্য। ইসলামপূর্ব সময়ে কবিগণ সমাজে বেশ প্রতিপত্তির অধিকারী ছিলেন। সে সময়টি ছিল মুখে মুখে কবিতা রচনা ও চর্চার (Oral Poetry) যার বেশিরভাগ ছিল The Golden Odes বা কাসিদার। এই গাঁথাগুলিতে যোদ্ধাশ্রেণীর বীরত্ব, আভিজাত্য প্রকাশিত হতো কাসিদার তিনটি অংশে। সাধারণত: প্রথম অংশ 'নাসিব'-এ সূচিত হতো Erotic অথবা Elegiac Prelude এবং দ্বিতীয় অংশ 'রাহিল'-এ থাকতো মরুভূমিতে ভ্রমনের কষ্ট (Desert Journey) সংক্রান্ত এবং তৃতীয় অংশ 'ঘারাদ'-এ থাকতো ব্যক্তিস্তুতি, ব্যক্তিক বা ট্রাইবের অহংকার (Personal or tribal boast) কিংবা ব্যঙ্গাত্মক (Satirical)। এই কাসিদাগুলি ছিল ২ লাইন করে অন্তমিল কবিতা যা ১০০ বা তারও অধিক couplet থাকতো।

উমাইয়া শাসনামলে কাসিদার তিনটি অংশ ক্রমান্বয়ে ভেঙ্গে পৃথক হতে থাকে। কাসিদার এই 'নাসিব' অংশে স্মৃতিকাতরতা, প্রিয়জনের প্রতি ভালবাসা, তীব্র আবেগ, বিচ্ছেদ-বেদনা, ফিরে পাওয়ার আকুতি, নিঃসঙ্গতা এগুলির বর্ণনা থাকতো যা অনেকটা Ubi Sunt বা Carpediem ভাবনা সম্বলিত। ইসলাম পরবর্তীকালে আরবদের ভূ-রাজনৈতিক বিজয়রথের সংগে তা পারস্যসহ মধ্যএশিয়া, আফ্রিকা, স্পেন অঞ্চলে কবিতা ধারাটি ছড়িয়ে যেতে থাকে। পারস্যে এসে এই গজলের বেহের, রাদিফ, কাফিয়া, মাতলা, মাকতা তথা গজলের format টি অনেকটাই সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট হয়। ইরানের মহান লেখক আব্দুল-হ্ জাফর দাকি (৮৫৯-৯৪১ খ্রী.) এঁর হাতে গজলের বিষয়বস্তুও অনেকটা নির্ধারিত হয়ে যায়। আরও পরে তাখাল্লুসের ব্যবহার এবং শেরগুলির আলাদা স্বাতন্ত্রে প্রতিষ্ঠা পায় সাদি সিরাজীর (১১৮৪-১২৮৩ খ্রী.) সময়ে। ওমর খৈয়ম, ইমাম গাজ্জালী, জালালউদ্দিন রুমি, হাফিজ সিরাজীর মত পারসিয়ান লিজেন্ডগণ গজল লেখেন-গজলেরূ প্রোথিত হয় আধ্যাত্মিকতা ও সুফীজম।

সাদি, রুমী, হাফিজের সমসাময়িক সময়ে ভারতীয় উপমহাদেশে গজল নিয়ে আসলেন মহান আমীর খসরু। তিনি ফারসী ও উর্দু মিলিয়ে শুরু করেন এবং

পরবর্তীতে উর্দু ভাষায় গজল ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠা পায়। এরপর ষোড়শ শতকে এসে কুলি কুতুব শাহ, ওয়ালী দক্ষিণী অসংখ্য গজল, মাসনবী, কাসিদা, রুবাই রচনা করতে থাকেন। এরপর গজল আকাশে উদিত হয় একেকটি নক্ষত্র-রফি সওদা, মীর দার্দ, তাকি মীর, জউক, মির্জা গালিব প্রমুখের। তারান্নুমের সঙ্গে সঙ্গে গজলে যুক্ত হয় উপমহাদেশীয় সঙ্গীতের লাইট ক্ল্যাসিক্যাল মেলোডির। জার্মান কবি গ্যেটের মাধ্যমে জার্মানীতে এবং পরে অ্যামেরিকা ও কানাডাতে গজল জনপ্রিয় হয়। উপমহাদেশের অন্যান্য ভাষাতেও গজল লেখা হতে থাকে। গজল বিশ্বসাহিত্য ও সঙ্গীতপরিমন্ডলে একটি বিশিষ্ট ধারা হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

খ) গজলের অর্থবোধকতা ও তাৎপর্যঃ

গজলের তাৎপর্য ও ভাবগাম্ভীর্য নিয়ে প্রাচীন উর্দু কবি জগৎ মোহন রাউয়ান এর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্যঃ

আল-হ্ আল-হ্ রাহে ইয়ে
ওয়াসেরাত দামান গজল,
বুলবুল ও গুল এহি পে
মওকুফ নেহী 'শানে গজল,'
খতম সেহনায়ে দো আলম পে
হ্যায় অশায়ী গজল।
পুছিয়ে হাফিজ সিরাজ সে
ইমকানে গজল,
জবত্ হ্যায় আয়নায়ে
রাজ হকিকত আসমী
ইয়ে উও কুঁজা হ্যায় কেহ্,
দারিয়া কি হ্যায় ওসেয়াতে আসমী ।

যার অর্থঃ আল-হ্ আল-হই থাকে
কি বিস্তৃত গজলের সীমা ।
গুলাব ও বুলবুল
গজলের বস্তু শুধু নয় ।
গজল আবদ্ধ করে
ইহকাল পরকাল সব,
একথা জিজ্ঞেস করো
সিরাজের হাফিজ কবিকে।

সত্যের রহস্য সব
বিস্মিত গজল আয়নায়,
গজলের গভীরতা
সমুদ্রের পেয়ালা অতলে।

গজল কাঠামোগতভাবে একটি গীতধর্মী কবিতা। দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে মূলতঃ এটি বিদেশীয়। 'গজল' এর উচ্চারণ করতে গেলেই বোঝা যায় এটি এ উপমহাদেশীয় শব্দ নয়। বিশেষ করে শুরুর অর 'গ' এর উচ্চারণ। গজলে আরব্য কবিতার ধরন (Style) ধারন করে, পরে ফারসীতে বিকাশ লাভ করে। কাঠামোগত ভাবে এটি ছোট গীতধর্মী কবিতা এবং তা একক দৈর্ঘে ও ছন্দে লেখা হয়ে থাকে। কিন্তু অনেক বিদেশী শব্দের মত গজলও এ সংস্কৃতিতে প্রোথিত হয় এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এটি নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়ে বরং আরও বিকশিত হয়ে উঠতে থাকে-প্রথমে ফারসীতে পরে উর্দু এবং দক্ষিণ এশিয় অন্যান্য ভাষায়। উপমহাদেশীয় সঙ্গীত ও কাব্য ধারায় একটি নতুন প্রবাহ সৃষ্টি করে এবং অসম্ভব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

আরবি-পারসিক শব্দের সূত্র থেকে আসা গজল শব্দটির সঠিক উচ্চারণ করতে হলে ঠিক বাংলায় লেখা কঠিন হলেও তা অনেকটা 'গাযাল' বা 'গাজযাল'- ইংরেজীতে লিখলে দাঁড়ায় 'Guzzle'। 'গ' অরটি হলকুম থেকে আবার ফিরে আসে গলায়। আরবিতে গজল বা ঘজল বা গাযাল এর মূল অর্থ 'এক শ্রেণীর আয়ত চু লঘু চপলগতি শৃংঙ্গযুক্ত ছোট আকারের হরিণ'। ইংরেজী 'Gazelle' কথাটিরও অর্থ 'সুদৃশ্য দ্রুতগামী মৃগ বিশেষ'। শব্দের উৎপত্তিগত অর্থের সংগে সঙ্গীত হিসেবে গজলের কাঠামোগত বা ধরনগত মিল পাওয়া যায় হরিণের মায়াবি রূপের আবিষ্টতার সঙ্গে। এছাড়াও আরও অনুষঙ্গে বিষয়টি অনুভবে আনা যায়। 'আপনা মাসে হরিণা বৈরী'- শিকারী বাঘ তাড়া করেছে- হরিণ প্রাণভয়ে পালাচ্ছে- হঠাৎ তার বড় ঝাকড়া শিং আটকে গেল বুনো ঝোপের কাঁটায়। আসন্ন মৃত্যু ভয়-নিজেকে মুক্ত করার যতই চেষ্টা করে ততই জড়িয়ে যায় আরও -কাঁটায় তবিত হতে থাকে। জোরে চিৎকারও করতে পারছেনা- পাছে শিকারী ধরে ফেলে। তার যন্ত্রনায় কুঁকড়ে যাওয়া হরিণের গুমরে উঠা আর্তনাদের সংগে মিলে যায় গজলের অভিব্যক্তি। আবার গজল শব্দের আরেকটি অর্থ 'কস্তুরী হরিনের আর্ত-চিৎকার'। সাধারণ্যে বিশ্বাস যে কস্তুরী বা মৃগনাভী একটি ক্বচিত ঘটনা যা শত শত বছরে একবার ঘটে। এ হরিণ তার পেটে কস্তুরী তৈরী করে যার গন্ধ তীব্র, মাদকতাপূর্ণ ও আকর্ষনীয় এবং সারা বনে তা ছড়িয়ে যায়। দূর্ভাগ্য এই যে ঐ কস্তুরী পেতে গেলে হরিণটিকে হত্যা করতে হয় তবেই পেট চিরে তা পাওয়া যায়। তাই কস্তুরীর এই গন্ধ হরিণটির জন্য মৃত্যুসমান। এ সুবাস হরিণটির আর্তচিৎকার

হিসেবে চিত্রিত করা হয়। গজলকেও মানুষের এই হাহাকার হিসেবে চিত্রিত করা হয়ে থাকে ।

আরবিতে ব্যবহৃত গজলের আরিক অর্থ, 'প্রেমালাপ' 'প্রেমিকার সাথে কথোপকথন' এর পরিভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে, 'তারুণ্যের পরিস্থিতি বর্ণনা করুন, 'ভালবাসার চর্চা করুন'। কিংবা 'রমণীর সংগে বাক্যালাপ'। তাই পরিভাষায় বর্ণিত বিষয়কে অবলম্বন করে গজল গানকে প্রণয় সংগীত বলে চিহ্নিত করা হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসুর বাংলা বিশ্বকোষে গজল এর সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে, 'একজাতীয় সঙ্গীত, ইহা প্রায়ই পারসী ভাষায় রচিত হয়। ইহাতে নায়ক নায়িকার বিরহ বর্ণিত থাকে'।[১] ফারসী শব্দ গজল এর আক্ষরিক অর্থ প্রেমজ কথোপকথন। ফলে কেউ কেউ একে প্রণয় সঙ্গীত (Love Song)ও বলেন ।

The Encyclopedia of Islam, New Edition, Vol.II,1965, E.J.Brill Leiden, Netharland.(Page-1028-1036) -তে গজলকে বলা হয়েছে, Ghazal, Ôsong, elegy of loveÕ, often also Ôthe erotico-elegiac genreÕ. The term is Arabic, but passed into Persian, Turkish and Urdu and acquired a special sense in this languages.

The semantic development of the word from the root gh zl, 'to spin', 'spinning'... The ghazal was not in fact a song of women spinning; but a manÕs song addressed to a girl.[2]

শব্দের অর্থ বিবর্তিত হয়। পরিবর্তিত হয়। অর্থের বিবর্তনে এর অর্থ দাড়ায় 'amorous addresses'। গজল শব্দটি 'lahw' বা Pleasure এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'ইয়ালহু ইলা গাজাল আল-সাবাব' অর্থ- he seeks pleasure in inspired by youthfulness. আবার আরবী Verb taghazzala যার অর্থ 'to compose love-song' এর আলোকে Ghazal এর অর্থ দাড়ায় 'to express a sorrow of love'. একসময় Shabab বা 'youthfulness, youth' এর synonym হিসেবেও গজল ব্যবহার হতো।

নজরুল গবেষক আবদুল মান্নান সৈয়দ এ বিষয়ে তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন, "গজল গান ফারসি, আরবি ও উর্দু কবিতার রূপকল্প। যেমন সনেট কবিতার একটি রূপকল্প . . .। গজল ঐসব ভাষার কবিতা-তবে সুর-সহযোগে গেয়। গজলের বাণী-হতে হবে কবিতার, আবার সুর রাগ-ভিত্তিক হবে। গজলের মূল বিষয় প্রেম-প্রেমিক ও প্রেমিকার। শাস্ত্রীয় সংগীতের কারুকাজ গজলগানের আবশ্যিক অঙ্গ। কবিতা হিশেবে

উত্তীর্ণ হতে হবে গজল গানকে আবার গান হিশেবেও" ।[৩]

গজল আরবী থেকে আসা হলেও মূলত পারস্য বা আজকের ইরান দেশের সঙ্গীত। এ প্রসঙ্গে An Introduction to Persian Literature (1969), গ্রন্থে Reuben Levy গজলের উপাদান বিশ্লেষনে উল্লেখ করেছেন, 'A people with as long a cultural tradition as the Iranians, and one endowed with such fertility of imagination, could not be content merely to borrow. As in other fields, they adapted what they took; out of the erotic prelude of the qasida they fashioned the ghazal (a word derived from an Arabic original meaning 'lovers' exchanges'), a separate lyric form having something of the character of the European sonnet. So far as rhyme is concerned it follows the qasida in structure, but it is normally much shorter, consisting of about eight to fourteen lines, the last of which at a later stage of development contained the poet's pen name. The framework is fixed, since there was no poetic license, and in each line rhythm and meaning coincide. The contents are lighter than those of the qasida, and the style of language used is more polished. The most normal theme was love, mystical or human, the homosexual being recognized; but anything might be touched on that stirred the emotions-the caprices of fortune's whirligig, the mystery of life in the world, the upsurging happiness of springtime, or the joys and sorrows of friendship or other earthly attachments. Subjects like these touch most human beings, and the spark struck by the poet may leap the gap between man and man'.

পারসিক বা ফার্সি ভাষায় গজল বলতেও প্রেম সঙ্গীত বুঝায় যার আয়তন সচরাচর দশ/বার লাইনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এ গানে নর-নারীর বিচিত্র মূর্ত-বিমূর্ত অনুভূতি, মনোভাব, অনুরাগ, পূর্বরাগ, বিরাগ, বিচ্ছেদ, মনস্তাপ, মিলন, বিরহ, আসক্তি, আকাংক্ষা ইত্যাদি প্রকাশ পায়। 'সঙ্গীত মনীষা'-তে অমল দাশশর্মা বলেন, 'গজল উর্দু ও ফার্সী ভাষায় রচিত হয়। এর বিষয়বস্তু সাধারনত প্রেমিক-প্রেমিকার হৃদয়াবেগের বর্ণনামূলক হয়ে থাকে। স্থায়ী ও অন্তরা এই দুই প্রকার সুর সহযোগে সম্পূর্ণ গানটি গাওয়া হয়। এতে কাহারবা, দাদরা, রূপক, পস্তো, দীপচন্দী প্রভৃতি তাল ব্যবহৃত হয়। শিল্পীর অতিউত্তম স্বর ও ভাষাজ্ঞান এবং স্পষ্ট ও সুমধুর উচ্চারণ গজল গান গাইবার জন্য অপরিহার্য্য' ।[৪]

ভাষা বিশেষজ্ঞগন কেউ কেউ আবার গজলকে ফারসী গীতিকবিতারই-সুরসহযোগে উপস্থাপন হিসেবে দেখেছেন। 'গযল ফার্সী শব্দ' মূলত পারসীক কবিতার একপ্রকার গীতিরূপকেই গযল বলা হয়। কালের পরিক্রমে এখন গযল বলতে উর্দু ভাষায় রচিত এক বিশেষ গীতরীতিকেই বুঝানো হয়'।[৫]

দিলীপ কুমার রায় হিন্দুস্থানী গজলকে বলেছেন, চিত্র সংগীত। অর্থাৎ কথার রেখায় সুরের রং ছড়িয়ে গানের ছবিখানি হয়ে ফুটে ওঠাই হল প্রাণের কথা।[৬] হিন্দুস্থানী মুল ধ্রুপদী ধারার সঙ্গে এ পার্থক্য বোধ করি গজলকে উৎপত্তিগত ধারার ইতিহাস বিশ্লেষণের সংঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পারস্য-আরব্য ধারার কবিদের কবিতার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কবিতার রংধনুতে আকৃষ্ট করা; এর ভাব-ব্যঞ্জনায় পাঠককে ভাবিত করা, দর্শনের ত্ত্ব কথায় আলোকিত করা কিংবা নান্দকিতার ছোঁয়ায় আবিষ্ট করা।

সঙ্গীতজ্ঞ মোবারক হোসেন খান এ প্রসংগে বলেন, 'গজলের সুর প্রেমবিষয়ক। গজলে গানের প্রেরণা প্রথম আসে পারস্য দেশ থেকে। গজল গানে সুরের ভাগ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, বাণীই সেখানে প্রধান। গজল সাধারণত লয়ে গীত হয়। কিন্তু লয়ের কারসাজিতে শিল্পীর পরিবেশনার ওস্তাদী বেশ উপভোগ্য। গজলের প্রকৃতি অনেকটা আবৃত্তির মত। মাঝে-মধ্যে সেখানে ছন্দ ভেঙে একটানা দীর্ঘ স্বরে পদ আবৃত্তি করতে হয়, সে জায়গাগুলোকে বলা হয় শ্যের। এই শ্যের গজলের প্রধান বৈশিষ্ট। কাওয়ালী পদ্ধতি গান থেকে মূলতঃ গজলের সৃষ্টি। গজলে অনেকগুলো তুক বা কলি আছে। তার মাত্র একটি ব্যতীত সবগুলো কলিকেই অন্তরা বলা হয়। একটি কলিকে স্থায়ী বলা হয়। গজল সাধারনতঃ উর্দু ও ফারসীতে গীত হয়।[৭]

The New Encyclopaedia Britannica তে গজলের সংজ্ঞা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আকারে যা বলা হয়েছে তা এরকম, 'Ghazal is Islamic literature, genre of lyric poem, generally short and graceful inform and typically dealing with themes of love'।

ম.ন. মুস্তাফার মতে 'গজল এক ধরনের রূপক প্রেমের গান। পারস্য, আধুনিক ইরান এর উৎসস্থান এবং পরবর্তী সময়ে উপমহাদেশে খুব বেশী জনপ্রিয় হয়। মধ্যযুগ থেকে বিশেষভাবে মুসলমান শাসনামল থেকে ভারতীয় উপমহাদেশে গজলের জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে। পারস্য রীতি অনুযায়ী গজলের প্রথম স্তবক সময়ের তালে গাওয়া হয় এবং পরবর্তী অংশটুকু কেবল আবৃত্তি করা হয়।[৮]

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ১৯৪২ সালে 'রুবাইয়াত-ই উমর খৈয়াম' প্রকাশকালে মন্তব্য হচ্ছে, 'ইতালীয় কাব্যের সনেটের মত রুবাই পারসী কাব্যের এক বৈশিষ্ট্য, গযল

বসরাই গোলাপ আর রুবাই গোলাবের নির্যাস। এক ফোঁটা কিন্তু গন্ধে ভরপুর'। তিনি গজলের সংজ্ঞা দিয়েছেন, 'গযলের আভিধানিক অর্থ প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের মধ্যে প্রেমব্যন্জক বাক্যালাপ ও কার্য্যকলাপ। কিন্তু পারস্য সাহিত্যে এক বিশেষ প্রকারে ভাব ও মিলযুক্ত কবিতার নাম গযল।'[৯]

গ) গজলের বিষয়বস্তু ও বৈশিষ্ট্য:

প্রেমিক হৃদয় প্রেমে পড়ে পৃথিবীর যাবতীয় আয়োজনের মধ্যে প্রেম-ভালোবাসাকেই দেখছেন। তকী মীরের ভাষায় বলছেন:

মুহব্বৎ সে হ্যায় ইন্তেজাম-এ জাঁহা
মুহব্বৎ সে গার্দীশমে হ্যায় আসমা॥

অর্থ: এ পৃথিবীর যত আয়োজন সবই তো প্রেমের জন্য
প্রেমের আকর্ষনেই আকাশ চক্রাকারে ঘুরছে।

প্রেমের অসহ্য উন্মত্ততা তাকে অসহায় বানিয়ে ফেলেছে। এ অসহায়ত্বের কারনও সঠিক খুঁজে না পেয়ে নিজের দিলকেই প্রশ্ন করছেন গালিব:

দিল্-এ- নাদান তুঝে হুয়া কেয়া হ্যায়
আখের ইস দর্দ কী দাবা কেয়া হ্যায়॥

অর্থ: অবুঝ ওরে, তোর হয়েছেটা কি?
আর এই ব্যাথার ওষুধই বা কি?

প্রেমিক নিজেই নিজের প্রশ্নের উত্তর পান এবং নিজেকে বলেন:

ইশ্‌ক পার জোর নাহি, ইয়ে উও আতশ, গালিব
জো লাগায়ে না লাগে, অওর বুঝায়ে নাহ্ বুঝে॥

অর্থ: প্রেমের উপর জোর খাটেনা, এ সেই আগুন গালিব
যা জ্বালালে জ্বলেনা, নেভালে নেভে না।

প্রেমিক হৃদয় তার প্রেমস্পদকে নিয়ে সুখস্বপ্ন দেখেন, তার পৃথিবী রঙে ভরে ওঠে, ফুলে ফুলে ছেঁয়ে যায়। ফয়েজ আহমেদ ফয়েজের ভাষায় বলেন:

গুলোমে রাংভারে বাদে নওবাহার চালে
চালেভি আওকে গুলশান কা করোবার চালে॥

তুমি আসলেই ফুলগুলি আরো রঙীণ হয়ে যায়, নতুন বসন্তের বাতাস বইতে থাকে। তুমি চলে আসলেই বাগান ফুলে ফুলে ভরে যায় ।

প্রেমিকাকে গোলাপের পাশে বসাতে চায়। প্রেমিকাকে দেখে গানের বুলবুলির সংগে কথা বলতে চায়। হায়দার আলী অতীশের ভাষায় বলে:

ইয়ে আরজু থি তুঝে গুলকে রু-বা-রু কারতে

হাম অওর বুলবুল-ই-বেতাব গুফতাগু কারতে॥

আবু সায়ীদ আইয়ুব 'গালিবের গজল থেকে' জানাচ্ছেন (পৃষ্ঠা-২৩) 'গুল ও বুলবুল উর্দুকাব্যে প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের গতানুগতিক প্রতীক-ফুল উদাসীন বা নিষ্ঠুর প্রিয়া, গীতরত বুলবুলের সঙ্গে একাত্ম হয়েছেন প্রেমিক-কবি। বসন্তকালে গোলাপ ফুল ফুটেছে বাগানে, কোন একটিকে বেছে নিয়ে বুলবুল তার প্রেমে পড়েছে, মনের হর্ষ-বেদনা-বেদনার মাত্রাই অধিক-মধুর কণ্ঠে জানাচ্ছে।

বুলবুলের পাগলামি দেখে ফুল শুধু হাসে। এই তিক্ত-মধুর দ্বিরালাপের মাঝখানে নিষ্ঠুর জগৎ প্রবেশ করে সৈয়াদ বা ব্যাধরূপে'।

এই নিষ্ঠুর আর উদাসীন প্রিয়া প্রেমিকের কাছ থেকে চলে যেতে চাইলে অকপটে নিজের অসহায়ত্বের কথা প্রেমিকাকে বলে, 'হায় আমি মরে যাবো, লুট হয়ে যাবো' । ফায়াজ হাশমির ভাষায় বলে ওঠে:

'আজ জানে কি জিদ না কারো, ইউ হি প্যাহ্লুমে বৈঠে রাহো

হায়, মার জায়েঙ্গে, হামতো লুট জায়েঙ্গে, অ্যায়সে বাতে কিয়া না কারো' ।

প্রেমের এই শুরুতেই প্রেমাস্পদের জন্য আকুতি আর আর তার বেবফাই প্রেমিকের মনে প্রশ্ন জাগে মীরের ভাষায় বলে:

ইবতেদা-এ ইশ্‌ক মে রোতা হ্যায় কেয়া

আগে আগে দেখিয়ে হোতা হ্যায় কেয়া॥

অর্থ: সবে তো প্রেমের শুরু, এখনই কাঁদছ?

দেখো ক্রমে ক্রমে আরো কত কী-ঘটে?।

যেনো মনে হয় এক ভারী পাথর বুকে চেপে আছে:

ইশ্‌ক ইক মীর ভারী পাথ্‌থার হ্যায়

কাব ইয়ে তুঝ না-তাবাহ্ সে উঠতা হ্যায়

অর্থ: Love is a real burden, Mir, It is a heavy stone
How can it be lifted by weak person alone?

মনে হতে থাকে প্রেমিকাকে বিশ্বাস করার কারণেই তার এত কষ্ট। দাগ দেলভির ভাষায় সে কষ্ট প্রকাশিত হয়:

গাজাব কিয়া, তেরে ওয়াদে পে আইতবার কিয়া
তামাম রাত কিয়ামাত কা ইন্তিজার কিয়া॥

প্রেমিকা কিছুতেই প্রেমিককে বুঝতে চায়না গালিবের ভাষায় বলে:

ইয়া রব উও না সামঝা হ্যায় না সামঝেঙ্গে মেরি বাত
দে অওর দিল্ উনকো, জো না দে মুঝকো জঁবা অওর॥

অর্থ: হে খোদা, সে বোঝেনি, বুঝবেও না আমার কথা
দাও তাকে অন্য হৃদয়, যদি আমাকে অন্য ভাষা না দাও

পরে মনে হতে থাকে কেন এই প্রেমের ফাঁদে সে পড়েছিল:

জিন্দেগী ইউ-ভি গুজার হি যাতি
কিউ তেরা রাহ্ গুজার ইয়াদ আয়া॥

অর্থ: জীবনতো এমনিতেই কেটে যেতো
কেন তোমার পথের কথা মনে এলো?

স্বীকার করে নেয় ভাগ্যের পরিহাসকে, নিয়তিকে:

ইয়ে না থি হামারী কিসমৎ কেহ্ বিলাস-এ-ইয়ার হোতা
আগার আওর জীতে র‍্যাহ্তে উহি ইন্তিজার হোতা॥

অর্থ: বন্ধুর সাথে মিলন ভাগ্যে ছিলনা
যদি আরও বাঁচতাম, এই প্রতীয় চলতো ।

নিরাশার অন্ধকারে পথ খুঁজে বেড়ায় প্রেমিক মন: তার হয়ে গালিব বলেন-

কোই উম্মিদ বার নাহি আতি
কোই সুরাত নাজার নেহি আতি॥

অর্থ: কোন আশাই পূর্ণ হয় না
কোন পথই দেখা যায় না কোথাও ।

নিজে অন্তর্জ্বালায় পুড়ে নিজের প্রেমকেই দোষারোপ করে কাঁদতে থাকে। শাকিল বাদাউনির ভাষায়:

অ্যায় মোহাব্বাত তেরে আনজাম পে রোনা আয়া

জানে কিউ আজ তেরে নাম পে রোনা আয়া।।

নিজেকে প্রবোধ দিতে থাকে বলে তার হৃদয় তো মানুষের-কেউ কাঁদালে তো সে কাঁদবেই। গালিবের ভাষায় বলে:

দিল হি তো হ্যায় না সাঙ্গ ও খিশ্ত, দরদ-সে ভর না আয়ে কিউ ?
রোঁয়েগা হাম হাজার বার, কোই হামে রুলায়ে কিউ?

অর্থ: এ যে মানুষের হৃদয়, ইট পাথর নয়, ব্যথায় ভরে যাবে না কেন ?
আমি হাজার বার কাঁদবো, কেউ আমাকে কাঁদায় কেন ?

মনে হতে থাকে এই প্রেমের সম্পর্কে জড়ানোর আগে তো তার জীবন সুখেরই ছিল। কোন দুঃখ ছিলনা-কোন দুশমন ছিলনা:

হামে কোই গাম নেহি থা গাম-এ-আশিকী সে প্যাহেলে
নাথি দুশমনি কিসিসে তেরি দোস্তি সে প্যাহেলে॥

আবার যে প্রদীপ শিখা পতঙ্গের প্রাণঘাতি হয়ে দেখা দেয় সে শিখাকেই আপন জেনে তাকেই আমন্ত্রণ জানিয়ে প্রেমিক বলে দুঃখ দেয়ার জন্য এবং আবার ছেড়ে যাওয়ার জন্যই না হয় ফিরে আসুক সে। আহমেদ ফারাজের ভাষায়:

রান্জিস হি সাহি দিল হি দুখানে কে লিয়ে আ
আ ফিরসে মুঝে ছোড়কে জানেকে লিয়ে আ

নিজের বরবাদির জন্য নিজেকেই দায়ী করে মীর তকীর ভাষায় উচ্চারণ করে প্রেমিক:

উলটি হো গ্যায়ি সব তদবীরে কুছ না দারানে কাম কিয়া
দেখা ইস বিমারী-এ দিলনে আখির কাম তামাম কিয়া।।

অর্থ: সব ব্যবস্থাই পন্ড হল, সব ওষুধ হলো ব্যর্থ
শেষটা দেখলে তো এই হৃদয়ের রোগই মীরকে বরবাদ করলো ।

এই দুর্দশা থেকে পরিত্রাণের জন্য সুরাতে আশ্রয় খোঁজে প্রেমিক। গালিবের ভাষায় বলে:

ম্যায় সে গর্জ নিশাত হ্যায় কিস রুসিয়াহ্কো
এক গুনাহ বেখুদী মুঝে দিনরাত চাহিয়ে

অর্থ: নেশা করে সুখ পেতে চায় কোন্ মুখপোড়া
আমি চাই কেবল রাতদিন নিজেকে একটুখানি ভুলে থাকতে ।

গজল গানের বাণী বিশে-ষণে দেখা যায় মানব প্রেমের বৈচিত্র্যময় প্রকাশ। কখনো তা, একজন অপরজনের কাছে নিজেকে হেয় করে অন্যকে বড় করে তুলে ধরে, বাঞ্চিত

মানুষকে আয়ত্তে না পেয়ে নিজের জীবনকে ধিকৃত করে, প্রিয়জনের অদর্শনে ব্যাকুল হয়ে পড়ে, প্রেমে ব্যর্থ হয়ে প্রাণ বিসর্জনের সংকল্প করে ।

আরবী/ফারসি/উর্দু সাহিত্যের দীর্ঘ ও উর্বর ঐতিহ্যে গীতিকবিতা গভীরভাবে প্রোথিত। এবং এই ঐতিহ্যের প্রান ভোমরা হচ্ছে গজল। বাককাস এবং ইরোস (Bacchus -Roman god of grape harvest and wine, similar to the Greek Dionysus, এবং Eros -God of desire, similar to the Roman Cupid বা কামদেবী) হচ্ছেন গজলের প্রধান দেবী। তাদের প্রভাবে গজল হয়েছে আবেগপূর্ণ প্রকাশধর্মী এবং যে কোন অপূর্ণ ইচ্ছা আকাংখার আবেগঘন প্রকাশ মাধ্যম। শায়ের সাধারনত রোমান্টিক হিরোর জায়গা থেকে অথবা সেই বেপরোয়া প্রেমিক যে ভালোবাসায় উম্মত্ত অথবা প্রেমিকার চিন্তায় নিবিষ্ট বা আত্মহারা হয়ে আছে তার পক্ষ হয়ে লেখেন। ভালোবাসার মদমত্ততায়, বিচ্ছেদের কাতরতায় সর্বব্যাপী নেশায় আচ্ছন্ন প্রেমিকের প্রকাশ আছে এতে। সে নিজেকে প্রকাশ করে একাকী যন্ত্রনাদ" অথচ হর্ষোচ্ছ্বাসরত কিংবা তাঁর ইচ্ছাপূরণে মরিয়া। এ ইচ্ছা হতে পারে মানবীয় (প্রেমিক/প্রেমিকা), স্বর্গীয়, নিগূঢ়, কিংবা বিমূর্ত-যা ব্যাখ্যাতীত। স্বভাবতই গীতিকবিতায় এই বিষয়গুলি খুবই প্রাসঙ্গিক।

অপর একটি প্রথাগত বিশেষত্ব হচ্ছে, গীতকবিতাগুলিতে ফুলের বাগানের উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করা। ফুল ফোঁটে, ফুল ঝরে- প্রকৃতি হেসে ওঠে, আবার ম্রিয়মান হয়ে পড়ে-প্রকৃতির এই দ্বৈততা মানবীয় অনুভূতির প্রকাশের প্রতিবিম্ব হিসেবে দেখা দেয়। ফুল বাগানে যেমন থাকে সদ্য ফোঁটা ফুল-গন্ধে ভরপুর, আবার থাকে বিগত দিনের ফুলের ঝড়ে পড়া পাপড়ি। প্রকৃতি প্রকাশ করে প্রেমের আবার ভালবাসার ব্যর্থতাকেও।

কবি কাজী নজরুলের ভাষায়, 'কবি ভাবেন-যৌবন আর ফুল সকালে ফুটে সন্ধ্যায় যায় ঝরে। ফুলের মালাকে মিলন-রাতের শেষে স্রোতে ফেলে দিতে হয়। এই তার নিয়তি।

প্রতি মুহূর্তের আনন্দকে স্বীকার করে নিতে হয় তার উদ্ভবের শুভ মুহূর্তে। এ লগ্ন বয়ে গেলে-আর তা ফিরে আসেনা। তাই সে হাতের ফুলকে কখন অভিনন্দিত করে, তখন না-ফোটা গোলাপের জন্য সে কাঁদে। যে ফূল ঝরে গেল, সেই মৃত ফুলের শবকে ধরে সে অতীতের শ্মশানে কাঁদেনা।[১০] সেই 'Ubi-Sunt' ও Carpediem ভাবনা ।

আনন্দে বা দুঃখে সুরাসিন্ধুতে নিমজ্জিত হয়, প্রেমে অন্ধ হয়ে উন্মত্ত অবস্থায় পতিত হয় কিংবা প্রেমাস্পদের স্তুতিতে বিভোর হয়ে পড়ে।

কখনো কখনো গজল নিতান্তই যৌন আবেগের প্রকাশ, ভালোবাসার মানুষের মধ্যে বিচিত্র চাওয়া-পাওয়া, প্রাকবৈবাহিক প্রেম, তীব্র আবেগঘন প্রেম, ঘৃণা বা ক্রোধ, অতৃপ্ত, অনুতপ্ত, অনুশোচনা কখনো প্রেমাস্পদের প্রতি উদাসীনতা, অনীহা-এ সবগুলোই পার্থিব জৈবিক প্রেমের উপকরণ।

‘গযলের মুলভাব বিষয় হলো প্রেম; তাই, গযল প্রধানত প্রেমসংগীতের কোঠায় স্থান লাভ করে। তবে এর কাব্যিক বাণীতে ধর্মভাব, জীবন সম্পর্কিত গভীর প্রজ্ঞাদৃষ্টি ও দার্শনিক মনোভাবও ব্যক্ত হতে দেখা যায়’।[১১] বাককাস এবং ইরোস দেবীর গজলে প্রাধান্য থাকলেও শুধু তাতেই তা সীমাবদ্ধ নয়। দুলাইনের শেরে যখন মিল কাফিয়া ও রাদিফে তখন কিন্তু ততটাই অমিল বিষয়ের অবতারনায়। এক গজলের বিভিন্ন শেরে তাই কখনো মূর্ত কখনো বিমূর্ত ভাবনা, কখনো সামাজিক অসঙ্গতি, কখনো ধর্মানুভূতি, কখনো শোক-বিলাপ, কখনো হিউমার বা স্যাটায়ার, কখনো রাজকীয় পৃষ্ঠপোষক বা নিজের প্রশংসা বা নিজের অমতা, অসহায়তা দেখি। এতে সরলতা, অকপটতা কিংবা একাকির নিঃসঙ্গতার প্রকাশে উপমা ব্যবহারে রহস্যময়তা বা অতীন্দ্রিয়তা কিংবা বাচনিক উৎকৃষ্টতা থাকে।

মূল ভাবনা ভালোবাসা (Central Theme of Love) কে যে কত বিচিত্র চিত্রকল্পে তৈরী করা যায়-গজলে এর প্রকাশ সত্যিই বিস্ময়কর। বিষয়বস্তু ও রীতি কৌশলগত ভাবে (Content and Style) ‘Love’ এর বিচিত্র ও বহুমাত্রিক প্রকাশ গজলকে একটি নির্দিষ্ট গোত্রে (Genre) স্থাপন করেছে।

গজলে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে ‘ভালোবাসা ও অপূর্ণ চাহিদা বা ইচ্ছা (Love and loving)। শায়েব সেই ভালোবাসার বিষয় প্রকাশ করে অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ গযল কবিতা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন, ‘ইহার বিশেষত্ব কেবল ভাবে (Theme) এবং মিলে (Rhyme)। সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণের ভাষায় বলিতে গেলে গযল শৃঙ্গাররসপ্রধান’। বৈষ্ণব পদাবলীতে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর বা শৃঙ্গার রস পাওয়া যায় উল্লেখ করে তিনি আরো বলেছেন, ‘বাৎসল্য ব্যতীত অন্য চার রসের আস্বাদন গজলে পাওয়া যায় । বাৎসল্য রস না পাওয়ার কারন হিসেবে বলেন, ‘ঈশ্বরকে সন্তানরূপে কল্পনা ইসলাম বহির্ভূত। ইসলাম খ্রীষ্টান ধর্মের ঈশ্বরের পুত্রত্ব অস্বীকার করিয়াছে। সুতরাং মুসলিম কবিদের রচনায় বাৎসল্য রস থাকা অসম্ভব। তাহলে আমরা দেখছি তাঁর বর্ণনামতে গজলে শান্ত, দাস্য, সখ্য ও মধুর বা শৃঙ্গার রসের মধ্যে শৃঙ্গার রসই প্রধান। আবার এই রসকে দুইভাগে ভাগ করেছেন

তিনি লিম্ভ ও সম্ভোগ (বা মিলন)। পূবরাগ, মান, প্রেম বৈচিত্ত্য ও প্রবাস (বা বিরহ) এই চারটি বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার। অন্যটি সম্ভোগ বা মিলন'।[১২]

গজলের মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে 'ইশক' বা খড়াব, আরোও স্পষ্ট করলে দাঁড়ায় 'গাম-এ-ইশ্‌ক'- 'ভালোবাসার কষ্ট'-'Unrequited Love'। এ ভালোবাসার জগতে প্রবেশ করলে দেখা যায় এই প্রেমিক জগৎ অত্যন্ত বিরলভাবে বিক্ষিপ্ত। এ জগতে অল্প কয়েকটি চরিত্রের বসবাস। উপন্যাসের শতচরিত্রের বৈচিত্র্য এখানে নেই। সবচেয়ে জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র নিঃসন্দেহে 'আশিক' Lover, প্রেমাস্পদ/প্রেমিক। এই প্রেমিকের চোখে এর পৃথিবী দেখা তারই বর্ণনায়। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে 'মাশুক' বা Beloved। আশিক চিরবিশ্বাসী কিন্তু মাশুক কখনই তা নয়। তার নির্মমতায়, পীড়নে যন্ত্রণাদগ্ধ অথচ হর্ষোচ্ছ্বাসে মদমত্ত প্রেমিক যেন চিরবিরহী। গজলের অন্য চরিত্রগুলি যেন সুনির্দিষ্ট আচরণে অভ্যস্ত এবং পাপেট শো এর পুতুল। এর 'রাকিব' বা Rival যেন সবসময়ের জন্য প্রেমিকের সংঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায়রত। তার ভালো গুনাবলির সংখ্যা প্রেমিকের চেয়ে কম হলেও প্রেমিকার কাছে কেমন করে যেন পৌঁছানোর পথ পেয়ে যায়। 'নাসিহ্‌' বা Advisor বা মনিটর এই প্রেমিককে ভালোবাসার পথ পরিত্যাগ করতে বলে অথচ প্রেমিক তা অবজ্ঞা করে। আরো পার্শ্বচরিত্র আছে যেমন 'রাজদান' যে প্রেমিকের বন্ধু ও তার গোপনীয় বিষয়গুলো জানে, 'পয়গম্বর' যিনি সৃষ্টিকর্তার বাণী বাহক, 'শেখ' যিনি ধর্মবেত্তা আর 'জাহিদ' যিনি নিঃসঙ্গ বসবাসকারী ধর্মপ্রাণ জ্ঞানীব্যক্তি। এই চরিত্রগুলির মাধ্যমে গজলের বিষয়াদির প্রকাশিত হয়, পাঠকশ্রোতার হৃদয় আলোড়িত হয় ।

এ ছাড়া সাকী-শারাব-সাবাব কিংবা প্যায়মানে, ম্যায়খানে এ অনুষঙ্গগুলো তো আছেই। শায়ের তাঁর ভাবনা প্রকাশে বারংবার ব্যবহার করেছেন এগুলো ।

বিষয়বস্তু (Themetically) হিসেবে এই ভালোবাসার আবার সুনির্দিষ্টতা আছে। এ ভালোবাসা 'Ilicit, unattainable love' বা নিষিদ্ধ ও অপ্রাপ্য প্রেম। ঔচিত্যের প্রশ্নে যে প্রেম পাওয়ার চেষ্টা করা উচিৎ নয় কিংবা সাধারন্যে যা অবৈধ সে ধরনের প্রেমের প্রকাশ থাকে গজলে। গজল সবসময় লেখা হয় ক্ষতবিক্ষত প্রেমিক হৃদয়ের আকুতি বর্ণনা করে। যে প্রেমিক হৃদয় প্রতিদান পায়নি, যার ভালোবাসা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, যার ভালোবাসা মিলন পরিণতি পাবার যোগ্য নয়, যে ভালোবাসাকে চিহ্নিত করা হয়েছে অপ্রাপ্য, দূর্লভ বা অসঙ্গত হিসেবে এমন প্রেমিকের কথা বলে গজল। এই প্রেমিকের কথামালাই গজল। গজলগুলি লেখা হয় এই প্রেমিকেরই দৃষ্টিকোন থেকেই। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই থাকে ভালোবাসা হয় তার সঙ্গে যে কোন ভালোবাসার প্রতিদান দেয়না, কখনো নির্মমভাবে উদাসীন থাকে, আবার কখনো সামাজিক

পরিস্থিতির জন্য তা করতে বাধ্য হয়। প্রেমিক তার না পাওয়া প্রেম সম্পর্কে সচেতন কিন্তু ভাগ্যলিপিকে মেনে নেয় অবলীলায়-বিদ্রোহ নেই এখানে বরং আছে প্রেমপাগলদের জন্য অন্ত ভালোবাসা। এই চাঁপা ও ব্যথাতুর উত্তেজনা থেকে হয় গজলের কথামালা। প্রেমিকের এই অসহায়ত্ব কখনো কখনো অতিরঞ্জিত উপমায় অলঙ্কৃত। যেমন এ প্রেমিক কখনো কখনো 'আঁখি বানে' 'হত', প্রেমাস্পদ এখানে গুপ্তঘাতক (assassin) বা কখনো হত্যাকারী (killer)। প্রেমাস্পদের এই মুগ্ধ করার ক্ষমতা প্রেমিকের হৃদয়কে করে ব্যথিত, দ্রবিভূত, বিলীন।

বৈষ্ণব পদাবলীর রাধাকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ, মিলন, বিরহ, মান অভিমান এর সংগে তুলনা করেছেন ডক্টর শহীদুল্লাহ্ তাঁর দীওআন-ই-হাফিয অনুবাদের সময় 'গযল কবিতা' শীর্ষক আলোচনায়। বলেছেন, 'পদকর্তা বাহিরের লোক, তিনি আরধ্য দেবতার প্রেম কীর্ত্তন করিয়াই ধন্য। কিন্তু নারীর মনের নিগূঢ় কথা, যাহা বুক ফাটিলেও মুখ ফুটিয়া বাহির হয় না, তাহা পুরুষ কবির লেখনীতে কতদূর ফুটিতে পারে? আবার বলছেন, 'গযলের কবি ভিতরের লোক; তিনি প্রেমাস্পদের সহিত নিজেরই মিলন, বিরহ প্রভৃতি অনুভূতির বর্ণনা করেন। তাই তাঁহার রচনা অধিক বস্তুতান্ত্রিক, আন্তরিক এবং তজ্জন্য অধিক প্রাণস্পর্শী আবার পদাবলীর সংগে পার্থক্য করে বলেছেন, 'বৈষ্ণব কবিতায় পরমাত্ম পুরুষ, জীবাত্মা নারী। অপর পক্ষে গযল কবিতায় পরমাত্মা নারী, জীবাত্মা পুরুষ। বৈষ্ণবের কল্পনায় অসংখ্য গোপী কৃষ্ণের মিলনের জন্য সদা উন্মাদিনী। কৃষ্ণ কাহাকেও বক্ষে স্থান দিতেছেন, কাহারও নিকট হইতে দূরে অবস্থান করিতেছেন, কাহাকেও হাসাইতেছেন, কাহাকেও কাঁদাইতেছেন। আবার কখনো তিনি প্রিয়ার জন্য ব্যাকুল হইয়া তাহার কুন্জদ্বারে করাঘাত করিতেছেন, তাহার মান ভাঙ্গিতে তাহার পদতলে পতিত হইতেছেন। সুফী কবির কল্পনায় খোদা অপরূপ সৌন্দর্য্যশালিনী বিশ্বপ্রিয়া বা পরম রূপবান্ প্রোমাস্পদ সখা। বিশ্ব তাহাকে পাইতে ব্যাকুল। প্রিয়া বা প্রেমাস্পদ প্রেমিকের হৃদয়কে দলিত মথিত করিতেছেন, তবুও প্রেমিক তাঁহারই পিছু পিছু নিত্য ছুটিতেছে। প্রেমিক দেখিতেছে, প্রিয়ার সেই চন্ডীরুপের মধ্যেরূ প্রমময়ী মূর্ত্তি প্রকাশ পাইতেছে। ক্ষণেকের তরে প্রিয়া প্রেমিককে বলেলেন। তারপর কোথায় প্রিয়া কোথায় প্রেমিক ? বিন্দু সিন্ধুতে গিয়া মিলাইল। কখনো বিরহে প্রেমিকার কলিজা খুন হইয়া যাইতেছে, চক্ষু ফাটিয়া তরল চুনি বাহির হইতেছে, তবু তাহার মনে আশা জাগিতেছে, সে তাহাকে পাইবেই, যেমন জন্মের পূর্বে আধ্যাত্মিক লোকে সে প্রিয়ার ক্রোড়ে ছিল, মরণের পর আবার তাহার সহিত মিলিত হইবে।[১৩]

মানুষের স্বাভাবিক আবেগ-ও মানবিক অনুভূতির বুদ্ধিবৃত্তিক প্রকাশে কখনো কখনো তা আধ্যাত্মিকতার Erotic কে স্পর্শ করেছে। মানবীয় ভালবাসা আর আধ্যাত্মিক

প্রেম একাকার হয়েছে একইসঙ্গে। গালিবের গজলকে উদাহরণ হিসেবে টানা যেতে পারে-

আ-হ্ কো চাহিয়ে এক উম্র আসর হোনে তাক
কন জিতা হ্যায় তেরি জুল্‌ফকে সার হোনে তাক।।

অনুবাদ: একটি দীর্ঘশ্বাসের স্ফুরণ চলছে সারা জীবনভর
কেই বা বেঁচে থাকে এতদিন, তোমার রহস্যের কিনারা জানতে ?

লেখক মুস্তাফা জামান আব্বাসী এই গজল প্রসঙ্গে একটি গবেষণাকর্মের সূত্র ধরে ব্যাখ্যা করছেন: 'গজলটিতে সাতটি শের বা স্তবক। নন্দনতত্ত্ব ও অধ্যাত্ম বিষয়ে উৎসাহীরা এ দিকেই ঝুঁকবেন, কারণ একেকটি শের উন্নিত একেকটি ধাপে, গজলের অভ্যস্ত সিঁড়ি থেকে পেরিয়ে দার্শনিক প্রশ্নের উত্তর দিতে। উত্তর দিতে হবে দু'দিক থেকেই, সাংস্কৃতিক এবং দার্শনিক দিক থেকে। প্রথম মৌলিক প্রশ্নটি হল 'ইনফিনিটি' [অসীমত্ব] না 'একচ্যুয়েলিটি অব টেম্পোরালিটি' [অস্থায়ীত্বের বাস্তবতা]। প্রতিটি শেরেই আছে কামনা ও বেঁচে থাকার বাস্তবতা, যেখান থেকে শুরু হয়েছে কেশদাম, শিশির বিন্দু ও শামাদানের নিভে যাওয়ার রূপকল্প। নেই মানেই যে নেই তা তো নয়, বরং যা নেই সেটি চন্ডভাবে উপস্থিত। আবার নেই বলে চরম ট্র্যাজেডি থেকে ।

একটি দীর্ঘশ্বাসের স্ফুরণ চলছে সারা জীবনভর
কেই বা বেঁচে থাকবে এতদিন, তোমার রহস্যের কিণারা জানতে?

প্রথম বাক্যেই: 'আ-হ্', কবির দীর্ঘশ্বাস, যা পুরনো প্রকাশের আবহ সৃষ্টিকারী, প্রেমিকদের যে একটাই সম্বল, যা প্রকাশিত হতে প্রয়োজন একটি জীবনের। এ জীবন প্রথম দিন থেকে শেষ পর্যন্ত দীর্ঘশ্বাস। প্রথম দিনের কান্না সবাইকে জানিয়ে। শেষের দিনে সবাইকে কাঁদিয়ে রওয়ানা, মাঝখানে যে ক'টি দিন তাতে সেই 'আ-হে'রই সতত সঞ্চরণ, যেন সারা দিন 'আ-হে'র মধ্যেই সম্বরণ করছি। শেরের মালিক পরের বাক্যেই চলে গেছেন নিত্য থেকে অনিত্যের পানে। যেখানে তিনি বলছেন, 'তোমার রহস্যের জানালা খুলতে কেউ বেঁচে থাকবে না'। দু'টো বাক্যের ব্যবধানে কবি একবার নিচ্ছেন এই জীবনের কঠিন বাস্তবে আর পরেরটাতেই নিয়ে যাচ্ছেন শাঁ করে আরেক দিকে, আধ্যাত্মিকতার দিকে যার যাত্রা।[১৪]

আবার 'আহ্' এই দীর্ঘশ্বাস দেখি মীর তকি মীরের বিখ্যাত গজলে:

দেখতো দিল কি জাঁহাসে উঠতা হ্যায়
ইয়ে ধুঁয়া সা কাঁহাসে উঠতা হ্যায়॥
ইউ উঠে 'আহ্' উস গালিসে হাম

য্যায়সে কোই জাঁহানসে উঠতা হ্যায় ।।

অর্থাৎ: দেখোতো দিল নাকি আত্মা থেকে

এই ধুঁয়ার মত উঠে, কোথা থেকে ?

আহ্! এমন করে তার গলি ছেড়ে বেরুলাম

যেনো কেউ ছেড়ে চলে গেলো দুনিয়া থেকে

এই মানবিক প্রকাশে আধ্যাত্মিকতার আবরণ ভিন্ন মাত্রা এনে দেয় গজলে ।

ঘ) সুফীজমের সঙ্গে গজলের সম্পর্ক:

উপমহাদেশীয় গজলে অবশ্য সুফীজমের প্রভাব আছে (Islamic Mysticism)। অতীন্দ্রিয় অনুভব, মহাজাগতিক অনুষঙ্গ গজল ভাবনার মধ্যে প্রোথিত। এই ভালোবাসাকে জাগতিক ও মহাজাগতিক কিংবা ইন্দ্রিয়জ বা অতীন্দ্রিয় দুভাবেই ব্যাখ্যা করা যায় । ভালোবাসাকে সবসময় বিবেচনা করা হয় পরিপূর্ণতার পরিচায়ক হিসেবে । এ ভালোবাসা মানুষকে দেয় পূর্ণতা, জ্ঞানের উঁচুস্তরে পৌঁছানোর সংগে সংগে দেয় অমিয় প্রশান্তি । ট্র্যাডিশনাল গজলে ভালোবাসার মধ্যে দৈহিক কামজ উপাদান থাকতেও পারে আবার নাও পারে । ফলে এ ভালোবাসা স্বভাবতই আধ্যাত্মিক বা পারলৌকিক (Spiritual) ।

প্রেমাস্পদের মধ্যে প্রেমিকের এই বিলীন হবার বিষয়টি সুফীজমের স্রষ্টার মধ্যে সৃষ্টির বিলীন বা 'ফানাফিল্লাহ' অনুষজ্ঞকে স্বভাবতই আলোচনায় নিয়ে আসে । একারণে গজলকে বুঝতে হলে সুফীজম সম্পর্কে অন্তত কিছু ধারণা থাকা জরুরী । এ ধারণা গজলের অর্থকে হৃদয়ঙ্গম করার পথে সাহায্য করবে । তাসাওউফ শব্দ সুফ থেকে উৎপন্ন যার অর্থ পশম। অর্থাৎ সুফী অর্থ 'পশমী পোষাকধারী' । আবার এ গীতিকবিতাকে দেখা হয় শায়েরের 'ভাবোচ্ছাস' হিসেবে । প্রেমিক হৃদয়ের বিচিত্র ভাব-ভাবনা, মিলন-বিরহ, চাওয়া-পাওয়া, আবেগ-অনুরাগ, সুখের লালিত্যে প্রকাশ । এইভাব প্রকাশটি মূখ্য হওয়ায় গজলকে অনেকে ভাবসঙ্গীতও বলে থাকেন । এরা মরমীতত্ত্বের সাধক । বসরার তৎকালীন সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তি ইমাম হাসান আল-বসরী (মৃত্যু-৭২৮খ্রী.) সুফীবাদের জনক হিসেবে স্বীকৃত । ইমাম আবু হামিদ আল-গাযালী (১০৫৮-১১১১খ্রী.) তাঁর মিশকাত আল-আনওয়ার ও 'রিসালা আল-লাদুনীয়া'তে সুফীবাদকে দার্শনিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেন । লুই ম্যাসিইনোর ভাষায় 'প্রতিনিয়ত আবৃত্ত, ধ্যনে ধৃত, জীবনে আচরিত কুরআন থেকেই ইসলামী মরমীবাদ উৎপত্তি ও বিকাশ' । নব্য প্লেটোবাদ, খ্রীষ্টিয় Gnostic ভাবধারার প্রভাব এতে আছে' । 'ফানা' ধারণাটি বৌদ্ধ নির্বাণ থেকে এবং সর্বেশ্বরবাদী ধারনা পারসিক নতুবা ভারতীয় ভাবধারা থেকে উদ্ভুত বলে নিকলসন বিবেচনা করেন । তারা সংসার বিবাগী নন অথচ একমুহূর্তের জন্য আল্লাহকে ভোলেন না । বাগদাদের সুফী আল জুনায়দ (মৃত্যুঃ

৯১০খ্রী.) এর মতে সুফীবাদের মূল লক্ষ্য মানুষের সত্তাকে বিলীন (ফানা) করে দিয়ে সৃষ্টি-পূর্ব আদি সত্তায় প্রত্যাবর্তন করা (বাকা) ও আল্লাহর সান্নিধ্যলাভ। আমি-তুমির পার্থক্য ভুলে স্রষ্টায় সৃষ্টির বিলিন হয়ে যাওয়া। আল গাযালী তিনটি জ্ঞানক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে জ্ঞানলাভের নিম্নতম পর্যায়ে হলো ঈমান । এ পর্যায়ে মানুষ অন্যের কাছ থেকে শুনে ধর্ম গ্রহণ করে। এর নাম তকলীদ বা অন্ধ অনুকরণ। দ্বিতীয় পর্যায় হলো যুক্তিসম্মত জ্ঞান। আলীম, ফকীহ ও অন্য বুদ্ধিজীবী এ জ্ঞানের ধারক। জ্ঞানের সর্বোচ্চ পর্যায় হচ্ছে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা (যওক)। যওকের আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে আস্বাদন। কেউ একে বলেছে হুলুল (পরমাত্মায় মানবাত্মার প্রবেশ), ইত্তিহাদ (মিলন)। বা উসুল (সংযোগ)। আবু ইয়াজিদ আল-বাস্তামী এর তন্ময় অবস্থায় 'সুবহানী মা আ'যামা শানি' (আমার কি গৌরব, আমার মহিমা কত বড়) কিংবা ইবনে মনসুর আল-হাল্লাজ এর 'আনা'ল-হক' (আমিই সত্য) একই ধারার উচ্চারণ।

শাম্‌সে তাব্রিজের গজলের সুফী অভিব্যক্তি এরূপ;

'মকানাম লা মকাঁ বাশাদ, নেশানাম বে নেশাঁ

অর্থাৎঃ আমার অবস্থিতি এখন লা-মকামে অর্থাৎ স্থান (Space) এর অতীতে, এবং আমার এখন বে-নেশান (নিশ্চিহ্ন) অর্থাৎ স্বাতন্ত্রহীন, মহাসত্তায় বিলীন।

সুফীরা পবিত্র কুরআনের গভীর ইঙ্গিতপূর্ণ ভাষার সূক্ষ অর্থের ভেতর প্রবেশ করেন । তাঁরা আল্লাহ্‌কে সৃষ্টি হতে পৃথক দেখেন না।

'কুনতু কান্‌জান মখ্‌ফিয়ান; ফা-আহবাব তু আন ওরাফা; ফা খালাক্‌তুল খাল্‌কা'।

অর্থাৎ: আমি গুপ্ত ভান্ডার ছিলাম, আমার ইচ্ছা হইল নিজেকে প্রকাশ করিব তাই সৃষ্টি করিয়াছি (অর্থাৎ সৃষ্টির ভেতর দিয়া নিজকে প্রকাশ করিয়াছি)।

কিংবা, 'কানাল্লাহু, ওয়া লাম্‌-ইয়াকুন মা'হু শাইয়ীন'

অর্থ: এক আল্লাহ্‌ ছিলেন, অন্য কিছুই ছিলনা (অর্থাৎ আল্লাহ্‌ হইতেই সমস্ত আসিয়াছে)।

এর ধারাবাহিকতায় হযরত আলীর বাণী 'মান আরাফা নাফসাহু, আরাফা রাব্বাহু'- অর্থাৎ যে নিজকে চিনিয়াছে সে তার রবকে চিনিয়াছে।

এসবই সুফীজমের প্যানথিজম বা সর্বসময় আল্লাহর ধারণা প্রকাশের অভিব্যক্তি। জগতে পবিত্র নিষ্কাম ভক্তির প্রতিষ্ঠাই যার লক্ষ্য।

ওমর খৈয়ামের নজরুল কর্তৃক অনুবাদকৃত নিম্নের রুবাইটি (৪৬ নং) লক্ষ্য করা যেতে পারে,

'আমি চাহি, স্রষ্টা আমার সৃজন করুন শ্রেষ্ঠতর
আকাশ ভুবন, এই এখনই যে আবার আঁখির পর
সেই সাথে চাই সৃষ্টি খাতায় দিক কেটে আমার নাম
কিংবা আমার যা প্রয়োজন তা মিটাবার দিক যে বর।

এই রুবাইতে বাহ্যিকভাবে 'শেরিকি' বোধ রয়েছে, স্রষ্টার সৃজন সমতুল্য ক্ষমতা অর্জন করতে চেয়েছেন খৈয়াম অথবা স্রষ্টা হতে চেয়েছেন। কিন্তু আদতে স্রষ্টার অংশ হিসেবে আশরাফুল মাখলুকাত সুফী চিন্তায় স্রষ্টার অস্তিত্বের সঙ্গে মিশে যাওয়া, তারপর স্রষ্টা থেকে বর নেওয়া মহৎ কর্ম- এটা খুদীতত্ত্ব, আল্লামা ইকবাল বলেন,

খুদী কো কর বুলন্দ এতনা কে হর হদিসে পহলে
খোদা বান্দা কো খোদ পুচে বাতা তেরি রেজা কেয়া হ্যয়,

অর্থাৎ, তকদির বিতরণের আগে নিজকে এত বড় করে তোলো যে খোদা নিজ থেকে ডেকে বলবেন, তোমার কি প্রয়োজন তা তুলে নাও'।[১৫]

ইসলামের শুরু এবং তৎপরবর্তী গজল কবিরা হয় নিজেরাই সুফী ছিলেন যেমন ওমর খৈয়াম, শেখ সাদি, আত্তার, জালাল-উদ-দীন রুমি কিংবা হাফিজ অথবা সুফীমতের আলোকে আলোকপ্রাপ্ত বা অন্ততঃ সেমতের প্রতি সহানুভূতিশীল। বেশিরভাগ গজলকেই কিন্তু আধ্যাত্মিক বাতাবরনে ব্যাখ্যা করা যায়, অনুভব করা যায়। এখানে প্রেমিকের প্রেমাষ্পদ সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং আবার কখনো বা শায়েরের আধ্যাত্মিক গুরু। গজলে অবিরাম যে ভালোবাসার কথা পাই তাকে সুফীজমের 'স্বর্গীয় ভালোবাসা' হিসেবে অনুভবে আনা যেতে পারে। সুফীকবিদের গজলে মানব-মানবীর প্রেমের রূপকে প্রকাশিত হয় জীবাত্মা ও পরমাত্মার তথা আশেক-মাশেকের বহুশ্রুত প্রেমরূপ। ফলে তাঁদের গজলে এরূপ বর্ণনা মরমীদর্শনের অনুষজ্ঞ হিসেবে এসেছে। মানব-মানবীর প্রেমের আড়ালে যেন প্রকৃতপক্ষে ঐশী প্রেমের দ্যোতনা।

ভালোবাসা (Love) দু'ধরনের । একটিকে বলে ইশক-ই-হাকিকি বা Divine Love বা স্বর্গীয় ভালোবাসা, আর এক ধরন হচ্ছে ইশক-ই-মাজাজী বা Earthly Love বা পার্থিব ভালোবাসা। গজল পন্ডিতগন কিছু গজলকে সম্পূর্ণভাবে স্বর্গীয় আর কিছু গজলকে পার্থিব বলে চিহ্নিত করেছেন- আবার- বেশ কিছু গজলকে বলেছেন যা এর যে কোন দৃষ্টিকোন দিয়ে বিবেচনা করা যায়। স্বর্গীয় বা পার্থিব যে কোন দৃষ্টিতে দেখা যায়।

একটি উদাহরণ দিলে তা স্পষ্ট হয়। এটি বিখ্যাত শায়ের মীর তাকি মীরের লেখাঃ

'দিখায়ি দিয়ে ইয় কে বেখুদ কিয়া
হামে আপ সে ভি জুদা কার চালে'॥

এর অর্থ 'She appeared in such a way that I lost myself

And went by taking my 'self' with her'

ভাবার্থ 'সে প্রেমিক এমনভাবে দেখা দিলো যে আমি নিজেকে হারিয়ে ফেললাম-

সে চলে গেলো আমা থেকে আমি কে নিয়ে, একা করে'।

এখানে সে পার্থিব দৃষ্টিতে প্রেমিকা। আবার একে ইশক-ও ফিকর দৃষ্টিতে দেখলে, 'সে কোন নারী নয় বরং God নিজে।

এখানে মীর মানুষের সাথে divinity এর মিথষ্ক্রিয়ার বিষয় উল্লেখ করছেন বলে ব্যাখা করা যায়। খোদা যখন কোন মানুষের কাছে প্রকাশিত হন তখন যে প্রতিক্রিয়া হয় তা এমন। 'দিখায়ি দিয়ে ইয়ুকে বেখুদ কিয়া-' When I see you God, I lost all sense of 'self' 'হামে আপসে ভি জুদা কার চালে'- ও forgot my own identity'.

সেজন্য গজল আবার সুফীভাবনার কাব্যসঙ্গীত নামেও পরিচিত। আল্লাহর প্রতি প্রেম, ভক্তি, ভালোবাসাও প্রকাশ পায়। লোকায়ত ভালোবাসার পাশাপাশি দার্শনিকতা, স্রষ্টার প্রতি আরাধনাও মূর্ত হয়। ঈশ্বরের কাছে মান-অভিমান, ঈর্ষা-ঈপ্সা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি ও উদ্বেল-উচাটন ভাব প্রকাশ পায় গানে। অন্য কাব্যগীতির মত গজলেরও সঙ্গীতাদর্শ হচ্ছে সুরের সাহায্যে গানের বাণীকে ধ্বনিত করে তোলা যেন পদবাহিত ব্যঞ্জনা সুরের স্পর্শে প্রমূর্ত হয়ে উঠে।

রুমি, হাফিজ প্রমুখ বিশ্ববিশ্রুত মরমী ফার্সি কবিরা গজলের প্রতিভূস্বরূপ। এরা অসাধারণ কাব্যসৌন্দর্য্যের প্রকাশের সংগে সংগে গজলকে তাদের গূঢ় ভাবনার প্রকাশ মাধ্যম করেছেন। আপাতঃ সরল অর্থের অন্তরালে লোকোত্তর জগতের দ্যোতনা। এখানে থাকে আপাত প্রত্যক্ষ জগতের সংবেদনের অন্তরালে অপ্রত্যক্ষ জগতের গভীর ইংগিত। যেমন মাসনবীয়ে রুমিতে উল্লেখিত হয়েছেঃ

বেশনু আয ন্যায় চূঁ হেকায়েত মী কুনাদ

ওয়ায্ জুনাঈহা শেকায়েত মী কুনাদ।

অর্থাৎ কান পেতে শোন, বাঁশী কি অবস্থা বর্ণনা করছে

বিরহ-বিচ্ছেদের কি অভিযোগ করছে।

এই বাঁশী কিংবা বিরহ বিচ্ছেদ বলতে কেউ যদি পার্থিব অনুষঙ্গ বোঝেন তাতে ক্ষতি নেই। আবার লোকোত্তর ব্যাখায় এ বাঁশি হচ্ছে রূহ বা আত্মা। সে বলছে আত্মার জগৎ থেকে রূহ দেহের জগতে এসে কুস্বভাবে পতিত হয়ে বিলাপ করছে।

আবার রুমি, হাফিজ, খৈয়াম এরা সুফী, কবিই নন- দার্শনিকও বটে। ফলে তাঁদের গজলে দর্শনের বিষয়সমূহ বিশেষকরে জন্ম মৃত্যু, সৃষ্টি-ধ্বংস, ইহকাল-পরকাল কিংবা

স্রষ্টা-সৃষ্টির রহস্যবাদ ও প্রোথিত হয়ে আছে এ অনন্ত জিজ্ঞাসাসমূহের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আছে। রূপের হাত ধরে অরূপ জগতে প্রবেশের প্রচেষ্টা আছে ।

দার্শনিক অভিজ্ঞতায় তা প্রকৃতি থেকে অতিপ্রাকৃত, সহজ থেকে রূপক, দেহ থেকে দেহাতীত পানে ধাবিত। ইন্দ্রিয় প্রায় গ্রাহ্য প্রেমের আড়ালে অন্তহীন গূঢ় অতপ্রন্দ্রিয় প্রেম/প্রেমিক পান মানব-মানবীর প্রেমানুভূতি আর সুফীগন পান পারমার্থিক দ্যোতনা। ইন্দ্রিগ্রাহ্যতার মধ্যে অতীন্দ্রিয় ভাবালুতা, প্রত্যক্ষের মধ্যে অপ্রত্যক্ষের প্রকাশ গজলকে নিয়ে যায় অন্য মাত্রায়।

এ প্রসঙ্গে দিলীপকুমার রায় তার 'সাঙ্গীতিকী' তে বলেন, 'সাধক যদি চান ওর মধ্যে পাবেন পারমার্থিক ব্যন্‌জনা, আবার প্রণয়ী যদি চান ওর মধ্যে পাবেন নরনারীর প্রেমব্যন্‌জনা'' ।

'পারস্য কাব্যের সাধারণ মূর্তি প্রায় সর্বত্রই এইরূপ। খোদাতা'লার মহিমা বর্ণন, হযরত মুহম্মদ (সঃ)-এর প্রশংসা, আশ্রয়দাতার (patron) গুণকীর্তন, স্বদেশের মাহাত্ম্য বর্ণন ও সেই সঙ্গে স্ব স্ব আত্মপ্রশংসা, এই সকলের ধারাবাহিক অবতারণা প্রত্যেক কাব্যের প্রারম্ভে দৃষ্ট হইয়া থাকে। আশ্রয় দাতার অতিরিক্ত প্রশংসা করা প্রাচীন কবিদিগের একটি স্বাভাবিক ও জাতিগত অভ্যাস। আত্মপ্রশংসাও প্রাচ্যদেশীয়দের একটি প্রকৃতিগত দোষ। ফিরদৌসী হইতে জামী, কালিদাস হইতে মাইকেল, কেহই এ দোষ হইতে নির্মুক্ত নহেন। গীতি-কবিতাগুলির আলোচ্য বিষয় প্রেম ও সৌন্দর্য। প্রকৃতির বক্ষে উদ্ভাসিত যে সৌন্দয্যের ধারা মনকে সংসারের কলুষরাশি হইতে অপসারিত করিয়া অনন্ত অনধিগম্যের দিকে প্রেরণা দেয়, নদীর কলনাদে ও পাখীর কুজনে, উষার সৌন্দর্যে ও চন্দ্রের কৌমুদীতে যে মহিমা, যে কমনীয়তা স্ফুরিত হইতেছে, সেই সকল অবলম্বন করিয়া মানবাত্মা কিরূপে বিধাতার উদ্দেশ্যে আপনার উচ্ছ্বসিত প্রেমরাশি উজাড় করিয়া দেয়, পারস্য গীতি-কবিতায় তাহাই দেখিতে পাওয়া যায়'।[১৬]

শ্রেষ্ঠ গজলগুলির রসাস্বাদনের জন্য তাই অর্থের ঐ দ্বৈততার বিষয়টি অনুভবে আনতে হবে। লৌকিক থেকে অলৌকিক কিংবা প্রেমের মানবিক প্রকাশ থেকে ঐশী প্রেমানুভূতিকে আমলে নিতে হবে। দিলীপকুমার রায়ের ভাষায় ''গজলের মূল বানীটি হলো এই অপরোক্ষ অনুভবের বাণী-এই অতীন্দ্রিয় স্বপ্নমন্ত্র। ওর ভাব নিছক বিশ্বানুগ না-ও হল বিশ্বাতিগ। মাটিতে ওর জন্ম, কিন্তু দৃষ্টি-আকাশে। এ জন্যেই শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর পারস্য গজল কাব্য এত গভীর ব্যান্‌জনাময়'।

হযরত আমীর খসরুর (১২৫৩-১৩২৫) হাত ধরে এ উপমহাদেশে গজল চর্চা শুরু হয় যিনি উর্দু ভাষার জনক ও শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে আবির্ভূত হন। উর্দুতে গজল চর্চার পাশাপাশি পরবর্তীকালে স্থানীয় অন্যান্য ভাষাতেও লেখা হয়ে থাকে।

আমীর খসরু নিজে নিজামউদ্দিন আউলিয়ার শিষ্য এবং আধ্যাত্মিক ব্যক্তি ছিলেন- ফলে তার গজলে পারস্য গজলের মতই দ্বিঅর্থবাচক কিংবা উচ্চমার্গীয় আধ্যাত্মজ্ঞানের প্রকাশ লক্ষ্যণীয়। কিন্তু পরবর্তীতে কুলিকুতুব শাহ্, রফি সওদা, মীর তকী মীর, গালিব, জউক প্রমূখ যারা গজল লিখেছেন-তারা বেশী লিখেছেন উর্দুতে কিন্তু-হাফিজ, রুমি, খসরুর গজলের আদর্শ অনুসরণ করেই-তাতে পারস্য গজলের অনুষঙ্গ, প্রকাশভঙ্গি, ফর্ম, অলংকার, শব্দবিন্যাস ইত্যাদি একইরূপ ছিল। পরবর্তীতে উপমহাদেশে যারা উর্দু ভাষায় গজল রচনায় আত্মনিয়োগ করেন তারা সাধনা-সঙ্গীত গূঢ়রহস্য সন্ধানী নন বরং তারা দিল্লী, লখনৌ, রামপুরের সঙ্গীত রসপিপাসু। ফলে- গজলে ফারসী অনুষঙ্গের দ্বিঅর্থবোধক ব্যাঞ্জনা ও দার্শনিকতা কমে গেল।

এর স্থান দখল করলো উত্তরভারতের হিন্দুস্তানী সঙ্গীতের লাইট ক্ল্যাসিক্যালের সুরমাধুর্য্য এবং বহুভঙ্গিম রোমান্টিসিজম। খেয়ালের মত তানের বিস্তার না করে ছোট ছোট তান, গমক ইত্যাদি অলংকার দিয়ে ঠুমরী-টপ্পার কাছাকাছি এক লঘু উচ্চাঙ্গ সংগীতে পরিণত হলো। গজলের এই রাগ রং উপস্থাপনার কৌশল গায়কীয় অভিনবত্বে গজল নতুনরূপে ধরা দিলো।

দিলিপ কুমার রায় যাকে বলেছেন, 'ভারতে ফারসি গজল উর্দু গজলে পেয়েছে নবজন্ম'।[১৭]

ঙ) উপসংহারঃ

রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন, 'কি জানি কিসের লাগি প্রাণ করে হায় হায়', তখন প্রতিটি হৃদয়ের তন্ত্রীতে অনুরণিত হয় যে বিরহের করুণ সুর তা থেকে উত্থিত হয় গজল। নজরুল যখন গেয়ে ওঠেন,

> 'শাওন আসিল ফিরে, সে ফিরে এলোনা,
>
> বরষা ফুরায়ে গেলো আশা তবু গেলনা'

এই আশা নিরাশার দোলাচলে দুলে উঠে গজল। নিতান্তই হালের হুমায়ুন আহমেদ এর- 'যদি মন কাঁদে তুমি চলে এসো এক বরষায়'- এই ক্রন্দন, কি আমন্ত্রণ প্রিয় মানুষের কাছে যাওয়ার-তাই গজল।

আর তাই,

যখন আমাদের অন্তরাত্মা কেঁদে ওঠে দেহ ছেড়ে তখন গজল সৃষ্টি হয়। গজল তখন সৃষ্টি হয় যখন অপর হৃদয়ের জন্য নিজ হৃদয়ে অদ্ভুত শীতল শোণিত বয়ে যায়। গজল তখনই মূর্ত হয়ে ওঠে যখন কারও উচ্চারিত শব্দমালায় হৃদয় অনুপ্রাণিত বোধ করে। বিমূর্ত রাত্রিতে মৌনতার সুতোয়বোনা ভাবনাগুলো রঙীন চাদরের প্রচ্ছদপট হয়ে ওঠাই গজল। যখন কারও আগুনে আরক্তিম হয়ে হৃদয় তখন গজল সৃজিত হয়। যখন ভালোবাসায় আমাদের হৃদয় অত্যাচারিত হয় তখন গজল সৃজিত হয়। যখন কারও

উপস্থিতি কাউকে কাঁদায় বারংবার তখন সেটি গজল। যখন তার অনুপস্থিতি কাউকে কাঁদায় আবার বার বার-তখন সেটি গজল। কাউকে পাবার আশায় উর্ধ্বাকাশের নীরবতায় উড়ে কল্পনার ফানুস-তা গজল। পেয়েও হারানোর আশংকায় দুলে ওঠে মন-তা গজল। সৃষ্টি যখন স্রষ্টায় বিলীন হওয়ার উন্মত্ততায় পতিত হয় তখন তা গজল। ইন্দ্রিয়জ অনুভবগুলি যখন অতীন্দ্রিয়তার পানে ধাবিত হয় তখন তা হয়ে উঠে গজল। যখন কারও আলোবাসায় হৃদয় ভেঙ্গে পড়ে খান খান হয়ে - সে শব্দগুলো গজল। যখন ঘন ঘোর বরষায় মন কেমন কেমন করে তা গজল। ভাদ্রের পুর্ণিমায় গলে গলে পড়া জোসনায় অবগাহন করার নামই গজল। চৈত্রের দীর্ঘ দুপুরে স্মৃতির পুরোনো পুঁথির আবেগঘন পাতা ওলটানোই গজল। শীতের কুয়াশা ভেজানো রাতে শিশিরের টুপটাপ শব্দে তাকে মনে করাই গজল। তীব্র ঠান্ডার রাত্রে স্মৃতির রঙিন চাদরে ঢেকে থেকে ওম পাবার অপর নাম গজল। পৃথিবীর এত প্রয়োজন, আয়োজনের অসারতায় নির্মোহ হৃদয়ের অপর নাম গজল। অসম্পূর্ণতার অনুভূতি যখন তাড়িয়ে নিয়ে ফেলে সৃষ্টির সরোবরে তখন গজল তৈরী হয়।

প্রেমাস্পদের জন্য ব্যকুল, উদভ্রান্ত আত্মবিস্মৃত প্রেমিক, আর প্রেমিকার নির্মম উদাসীনতা 'বেবফাই' গজলগুলিকে চিরকালীন করেছে। উর্দু গজলগুলির প্রতি শেরে এসকল ভাবব্যঞ্জনায় মূর্ত। তকী মীরের গজল প্রসঙ্গে আবু সয়ীদ আইয়ুব এর মন্তব্য বোধকরি সকল শ্রেষ্ঠ গজল শের এর জনই প্রযোজ্য। তিনি বলেন, 'এদিকে প্রেমিক আকুল, অধীর, উদ্‌ভ্রান্ত, আত্মবিস্মৃত, দিশেহারা, অন্যপক্ষে প্রেমাস্পদ হয় সম্পূর্ণ উদাসীন' নয় ক্ষণে হাতে দড়ি দেন, ক্ষণে চাঁদ.... । 'কিন্তু কত বিচিত্রভাবে ভঙ্গিতে কৌশলে কতরকম অলংকৃত এবং নিরলংকার, কখনো অতিরঞ্জিত কখনও ঊনরঞ্জিত রূপরেখায়, কখনো নিজেকে নিয়ে হালকা ব্যঙ্গকৌতুক কিংবা বক্রোক্তি করে কখনও বা ঋজু সরল আবেগপূর্ণ ভাষায় ঐ কথাটি অভিব্যক্ত হয়েছে লক্ষ্য করলে আমরা বিস্মিত হই, মুগ্ধ হই ।

অতিরঞ্জন অবশ্য উর্দুকাব্যের সর্বব্যাপী ভঙ্গিমা, সে কাব্যে অনভ্যস্ত পাঠক এই অতিরঞ্জনকে মেনে নিয়ে এবং মন খানিকটা সরিয়ে রেখে রসের সন্ধান করবেন, নইলে তাঁদের রসাস্বাদন পদে পদে বিঘ্নিত হবে। অনেকটা ব্যর্থ হবে'।[১৮]

উর্দু গজলের এই প্রকাশভঙ্গির মূল উদগাতা সম্ভবত পূর্বতন ফারসী কাব্য। 'দর্শন ও ফারসী কাব্য প্রবন্ধে তাই শিবলী নোমানী বলেন, ' ফারসী কাব্যভান্ডারে কেশ, আঁচিল, রেখা, মিথ্যা তোষামোদ, স্তুতি, অতিরঞ্জন ও কল্পনা বিণ্যাস ছাড়া অন্য কিছু নেই'।[১৯] তবে গজল পরিপূর্ণতা পায় তখনই যখন,

'বন্দিশ-এ আলফাজ হি হ্যায় নেহি কাফি গজলকে লিয়ে
দোয়া বুদ খুনে জিগর ভি চাহিয়ে আসরকে লিয়ে॥

অর্থাৎ শব্দের সুবিণ্যাস আর সুরের মাধুর্য্যই যথেষ্ট নয়- গজল হতে হলে অন্তত বুকের দু'ফোঁটা রক্ত-তাতে মিশিয়ে দিতেই হয় ।

তথ্যনির্দেশঃ

১। শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু, বিশ্বকোষ, পঞ্চম ভাগ, বি আর পাবলিশিং কর্পোরেশন, শক্তিনগর, দিল-ী-১১০০৭।

২। The Encyclopedia of Islam, New Edition, Vol.II,1965, E.J.Brill Leiden, Netharland.(Page-1028-1036)

৩। আব্দুল মান্নান সৈয়দ, নজরুলের গজল গান, দৈনিক ইনকিলাব ২৯/০৮/২০০৮।

৪। অমল দাশ শর্মা, সংগীত মনীষা পৃষ্ঠা-২০২।

৫। আব্দুল হেনা সাদউদ্দীন, সংগীত বিদ্যা, পৃষ্ঠা-১৩৬।

৬। দিলিপ কুমার রায়, সাঙ্গীতিকী, প্রথম প্রকাশ, কলিকাতা, ১৯৩৮, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃঃ ৮৬।

৭। মোবারক হোসেন খান, সংগীত প্রসঙ্গ, পৃষ্ঠা-৬০।

৮। ম ন মুস্তাফা, আমাদের সঙ্গীত ইতিহাসের আলোকে, প্রথম প্রকাশ-জুন ১৯৮১।

৯। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, দীওআন-ই-হাফিয' ২য় সংস্করণ ১৯৫৯, পাতা ২৫।

১০। আসাদুল হক, নজরুল যখন বেতারে, পৃষ্ঠা-১৭৭।

১১। আবুল হেনা সাদউদ্দীন, সংগীতবিদ্যা-পৃষ্ঠা-১৩৬।

১২। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, দীওআন-ই-হাফিয' ২য় সংস্করণ ১৯৫৯, পাতা-২৬।

১৩। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৭।

১৪। মুস্তাফা জামান আব্বাসী, গালিবের হৃদয় ছুঁয়ে, পৃষ্ঠা-১১৮-১১৯।

১৫। শামসুল আলম সাঈদ, বাংলায় খৈয়াম ও নজরুল অনুবাদ, পৃষ্ঠা-১২৭।

১৬। মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্, পারস্য প্রতিভা, সপ্তম (ই,ফা,বা প্রথম) সংস্করণ এপ্রিল ১৯৮৭, পৃষ্ঠা-৯।

১৭। মোহাম্মদ আবুল খায়ের, নজরুল সঙ্গীতে নান্দনিকতা, পৃষ্ঠা-৬০।

১৮। আবু সয়ীদ আইয়ুব, মীরের গজল থেকে, পৃষ্ঠা-১২।

১৯। মোহাম্মদ আবদুল মান্নান অনূদিত, শিবলী নোমানীর নির্বাচিত প্রবন্ধাবলী, পৃষ্ঠা-১১৮।

ISSN 1605 - 7023

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা
পঞ্চদশ বর্ষ সংখ্যা
১৪২২ বঙ্গাব্দ/২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

টেকসই উন্নয়নঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

তমালিকা সুলতানা *

Abstract: *At present Sustainable Development is an important issue. Traditionally development was perceived as high productivity and economic mobility. Sometimes these were achieved even at the cost of destroying natural resources in the name of development. Since people realized that development is the reason behind environmental pollution due to man-made hazards, attempts were made to protect environment. Development which is eco-friendly and as well as fulfills peopleÕs demands is considered to be sustainable development. The United Nations and its representatives all over the world agreed that we should preserve our natural resources for our future generations. As a member of the United Nations Bangladesh participated in all environmental conferences and summits on sustainable development. Bangladesh has agreed to implement the strategies and agendas of these conferences and summits. Bangladesh also has prioritized its importance in its national policy for sustainable development. The goal of formulating and implementing policies is to ensure a balance between the existing livelihood requirements of the people and sound environmental resource management that can ensure sustainability.*

ভূমিকা

আমাদের জীবনধারা প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। এই পরিবর্তনের ক্ষেত্রে উন্নয়নকে সর্বাগ্রে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। বিংশ শতাব্দীকে একই সাথে সফলতম এবং ব্যর্থতম শতাব্দী হিসেবে উল্লেখ করা যায়। বিগত শতাব্দীর সবচেয়ে বড় সফলতা ছিল প্রযুক্তিগত এবং জিনগত প্রযুক্তির ক্ষেত্রে। অষ্টাদশ শতকের শিল্প বিপ্লবের পর বিংশ শতকের তথ্য ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যে বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল যা মানুষের অস্তিত্বের ক্ষেত্রে আরও একটি মাইল ফলক হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। বিংশ শতকের সবচাইতে বড় ব্যর্থতা ছিল পরিবেশগত অবনতির মাধ্যমে মানবতাকে বিপর্যস্ত করা।[১] পরিবেশগত বিষয়গুলো আজ আর কোন স্থানীয় বা আঞ্চলিক বিষয় নয় এর সাথে সমগ্র বিশ্বের পরিবেশগত পরিবর্তন জড়িত। অতীতে উন্নয়ন প্রচেষ্টা বলতে মূলত বিভিন্ন ক্ষেত্রে উচ্চ উৎপাদনশীলতাকে বোঝানো হতো। এ ক্ষেত্রে শিল্পায়নের মাধ্যমে যে উন্নয়ন হয় তাকেই গুরুত্ব দেয়া হতো। অধিক শিল্পায়নের কারণে প্রাকৃতিক সম্পদের অপচয় এবং জীবাশ্ম জ্বালানীর উপর অধিক নির্ভরশীলতার কারণে পরিবেশের মারাত্মক দূষণ ঘটেছে। কৃষিক্ষেত্রে অধিক উৎপাদনশীলতার জন্য রাসায়নিক ও জৈবিক প্রযুক্তির ব্যবহার করতে হচ্ছে। বিভিন্ন ধরনের সেচের কারণে

* সহকারী অধ্যাপক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।

ভূপৃষ্ঠের এবং ভূঅভ্যন্তরের পানির ব্যবহার বাড়ছে। কাজেই আমরা বলতে পারি উন্নয়ন করতে গিয়ে মারাত্মকভাবে পরিবেশ বিপর্যস্ত হচ্ছে । উন্নয়নশীল দেশগুলোর জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে পরিবেশগত বিভিন্ন সমস্যা মারাত্মক হয়ে দেখা দিচ্ছে। এসব সমস্যার মধ্যে রয়েছে অপরিকল্পিত নগরায়নের কারণে সৃষ্ট পরিবেশগত বিপর্যয়, প্রাকৃতিক সম্পদের অনুপযুক্ত ব্যবহার, বনভূমির ধ্বংস সাধন, নিচু জমি ও জলাশয় ভরাটের কারণে ইকোসিস্টেমের ব্যাঘাত ইত্যাদি। বাড়তি জনসংখ্যার মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য উন্নয়নকে বেশী গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। উন্নয়ন করতে গিয়ে আমরা পরিবেশগত বিষয়কে এড়িয়ে চলছি যা আমাদের অস্তিত্বকে হুমকীর সম্মুখীন করছে। তাই বেঁচে থাকার জন্যই টেকসই উন্নয়নকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হচ্ছে। বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশ, অন্যান্য দেশের মতই বাংলাদেশকেও বিভিন্ন ধরনের পরিবেশগত বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এই প্রবন্ধে টেকসই উন্নয়ন কেন গুরুত্বপূর্ণ এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে এর প্রয়োজনীয়তা অনুসন্ধান করা হবে একই সাথে সরকার কর্তৃক গৃহীত এ সংক্রান্ত কর্মকৌশলের বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করা হবে।

টেকসই উন্নয়নের ধারণা

বিভিন্ন ধরনের পরিবেশগত বিপর্যয় পৃথিবীর সর্বত্র লক্ষ করা যাচ্ছে। টেকসই উন্নয়ন বলতে সেই উন্নয়নকে বোঝায় যা টিকে থাকবে, মানুষের প্রয়োজন মেটাবে এবং মানুষের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন ঘটাবে।[২] টেকসই উন্নয়ন মূলত সামাজিক ও পরিবেশগত প্রক্রিয়া যা মানুষের প্রয়োজনীয়তাকে পূরণ করবে এবং একই সাথে পরিবেশ সংরক্ষণ করবে। টেকসই উন্নয়নের ধারণা মূলত পরিবেশের শিক্ষাকে অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াতে প্রয়োগের পরামর্শ প্রদান করে।[৩] টেকসই উন্নয়নের ধারণা পরিবেশ উন্নয়ন ও সংরক্ষণের ধারণা থেকে বিংশ শতকের ষাটের দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সূচনা হয়েছিল। আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯৮০ সালে International Union For the Conservation of Nature (IUCN) যখন World Conservation Strategy (WCS) প্রকাশ করে এবং টেকসই উন্নয়ন কথাটি ব্যবহার করে তার পর থেকে উন্নয়নের সাথে পরিবেশকে যুক্ত করার প্রবণতা বিশ্বব্যাপী লক্ষ করা যায়। তখন WCS তিনটি প্রধান লক্ষ্যের কথা বলেছিল। এই লক্ষ্যগুলি হচ্ছে প্রয়োজনীয় পরিবেশগত প্রক্রিয়া, জীব প্রজাতির সংরক্ষণ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার।[৪] World Commission on Environment and Development যা Brundtland Commission নামে পরিচিত, এই কমিশন ১৯৮৭ সালে একটি রিপোর্ট পেশ করে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে এটা পেশ করা হয়। এতে টেকসই উন্নয়নের সংজ্ঞা প্রদান করা হয় এভাবে "টেকসই উন্নয়ন হচ্ছে এমন ধরনের উন্নয়ন যা বর্তমান প্রজন্মের প্রয়োজনীয়তাকে পূরণ করবে এবং কোনো ধরনের আপোষ ছাড়াই তা ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য সংরক্ষণ করবে"।[৫]

টেকসই উন্নয়নের সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং পরিবেশগত নিরাপত্তার বিষয়টি সম্পর্কযুক্ত। অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রথমে পরিবেশের বিষয়টি মাথায় রেখে তারপর নীতি প্রণয়নে মনোযোগী হতে হবে। টেকসই উন্নয়ন শুধু পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়কেই গুরুত্ব দেয় না, বিস্তারিতভাবে বলতে গেলে এখানে তিনটি সাধারণ নীতির ক্ষেত্র বিদ্যমান যা হচ্ছে অর্থনৈতিক নীতি, পরিবেশ সংক্রান্ত নীতি এবং সামাজিক নীতি। টেকসই উন্নয়নকে বলা যায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক উন্নয়ন এবং পরিবেশ সংরক্ষণ। এছাড়াও অনেকে টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে সংস্কৃতিক বৈচিত্যকে এর আর একটি নীতি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কৃষ্টি ও সংস্কৃতির উন্নয়নের মাধ্যমেও জনসাধারণের মধ্যে পরিবেশ সংক্রান্ত সচেতনতা সৃষ্টি করা যায়।

১৯৮৩ সালের নভেম্বর মাসে The World Commission on Environment and Development (WCED) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানটি মূলত উন্নয়নশীল দেশগুলো উন্নয়ন প্রচেষ্টার সাথে সাথে যেসব পরিবেশগত সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে সে সম্বন্ধে দৃষ্টি দিচ্ছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে উন্নয়ন সংক্রান্ত নীতি এমনভাবে প্রণীত হবে যার সাথে পরিবেশের অস্তিত্বের কোনো বিরোধ ঘটবে না। টেকসই উন্নয়ন বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করার জন্য WCED ১৯৮৭ সালে যে প্রয়োজনগুলোকে গুরুত্ব দিয়েছে তার মধ্যে প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলো (যেমনঃ খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, চাকুরী ইত্যাদি) পূরণ করতে হবে। পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ে মানুষের মূল্যবোধের উন্নতি ঘটাতে হবে। জনগণের প্রয়োজন অনুসারে দেশের সম্ভাব্য উৎপাদনশীলতাকে বাড়াতে হবে। পৃথিবীতে যেসব প্রাকৃতিক উপাদান মানুষের বাঁচার ক্ষেত্রে সাহায্য করে তাদের ধ্বংস করা যাবে না। বনভূমি সংরক্ষণ এবং জীব প্রজাতি রক্ষার মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করতে হবে। সীমিত সম্পদকে সঠিক কারিগরী প্রচেষ্টার মাধ্যমে নতুন করে ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে ফেলে দেওয়া বর্জ্যগুলোকে Recycling এর মাধ্যমে কাজে লাগানোর ব্যবস্থা করতে হবে। এ প্রসঙ্গে পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন বৈশ্বিক প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করা যায় যেখানে এইসব বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে বৈশ্বিক প্রচেষ্টা

উন্নয়নের সাথে পরিবেশগত বিষয়কে যখন থেকে গুরুত্ব দেওয়া শুরু হয় তখন থেকেই বিশ্বব্যাপী টেকসই উন্নয়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে চিন্তাভাবনারও পথ উন্মুক্ত হয় কারণ পরিবেশগত বিষয় কোনো নির্দিষ্ট দেশের নয়, এর সাথে সমগ্র বিশ্বের স্বার্থ জড়িত। পরিবেশগত অবনতির বিষয়টি স্থানীয়ভাবে, আঞ্চলিকভাবে এবং বৈশ্বিকভাবে বর্তমানে আলোচিত হচ্ছে। এই বিষয়টি বিবেচনা করে বিশ্বের নেতৃবৃন্দ টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে সম্মিলিত প্রচেষ্টাকে বেশি গুরুত্ব প্রদান করেছেন। বিভিন্ন সময়ে বিশ্বে পরিবেশ বিষয়ক নানা বিষয়কে সামনে রেখে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

এসব সম্মেলনে সমবেত হয়ে বিশ্ব নেতাগণ নিজেদের দেশের বিভিন্ন সমস্যা আলোচনার পাশাপাশি বিশেষজ্ঞদের এইসব বিষয় সংক্রান্ত বিভিন্ন পরামর্শকেও গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করছেন। মূলত এসব লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিশ্বে বিভিন্ন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। নিম্নে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনের আলোচিত বিষয়গুলোকে উল্লেখ করা হচ্ছে।

বিশ্ব ধরিত্রী সম্মেলন

টেকসই উন্নয়ন নিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা শুরু হয়েছিল ১৯৯২ সালের জুন মাসে, ব্রাজিলের রিও-ডি-জেনেরিওতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব ধরিত্রী সম্মেলনে। United Nations Conference on Environment and Development(UNCED) এই সম্মেলনের আয়োজন করেছিল। এই সম্মেলনে বিশ্বব্যাপী পরিবেশ সংরক্ষণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালানো অর্থাৎ টেকসই উন্নয়নের পক্ষে প্রচারণা চালানো হয়। এই সম্মেলনে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এজেন্ডা ২১ গৃহীত হয়েছে। এই সম্মেলনে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা এবং পরিবেশ দূষণের কারণে যে ধরনের স্বাস্থ্যের ঝুঁকি হয় সেগুলো দূর করার কথা বলা হয়েছে। পৃথিবীর অধিকাংশ জনসংখ্যার জন্য উপযুক্ত বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। পরিবেশ সংক্রান্ত দূষণ রোধে স্থানীয়, আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক প্রচেষ্টা থাকতে হবে। ওজোন স্তরের ক্ষয় হ্রাস, বিশ্বের উষ্ণতা বৃদ্ধি সহ এই ধরনের পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ে আরও গবেষণার প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়। ভূমির টেকসই ব্যবস্থাপনা, বিশুদ্ধ পানির উৎসগুলোকে রক্ষা করা, বনসম্পদ ধ্বংস হতে রক্ষা, সামুদ্রিক পরিবেশকে সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য genetic resource গুলোকে সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে। কৃষি ক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়নের জন্য আলোচ্যসূচিতে জমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যবহারের উপর জোড় দেয়া হয়। এতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে শুরু করে সকল পর্যায়ে মহিলাদের অংশগ্রহণের কথা বলা হয়। বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, কলকারখানা, ট্রেড ইউনিয়ন, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিবর্গ স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করার মাধ্যমে তাদের প্রতিষ্ঠানের নীতি নির্ধারণ করবে। এতে শিক্ষা এবং তথ্যের মাধ্যমে জনগণকে পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ে সচেতন করার কথাও বলা হয়। আলোচ্যসূচিতে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে পরিবেশ সংক্রান্ত আইনের এবং পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের পদ্ধতির দিকে গুরুত্ব দেয়ার কথা বলা হয়। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে টেকসই উন্নয়নকে সঠিকভাবে কার্যকর করার জন্য অর্থনৈতিক সাহায্যের প্রয়োজন। এজেন্ডা ২১ এ বিভিন্ন ধরনের বহুজাতিক সংস্থা যেমন: বিশ্ব ব্যাংক, IDA, Global Economic Facility সহ অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাগুলোকে টেকসই উন্নয়ন এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য অর্থ সাহায্য প্রদানের কথা বলা হয়েছে।[৬] এজেন্ডা ২১ এ টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশ্বের প্রচেষ্টা

কি হওয়া উচিৎ সে সম্পর্কে বিস্তারিত রূপরেখা প্রদান করা হয়েছে। এই আলোচ্যসূচিতে স্বাক্ষরকারী দেশগুলো এর নীতি অনুসরণের ব্যাপারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। জাতিসংঘের Commission on Sustainable Development (CSD), UNCED চুক্তিকে কার্যকর করার নির্দেশ প্রদান করেছে।[৭] টেকসই উন্নয়নকে কার্যকর করার জন্য বিশ্বে বিভিন্ন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে এসব সম্মেলনের মধ্যে ২০০২ সালের বিশ্ব টেকসই উন্নয়ন সম্মেলন উল্লেখযোগ্য।

বিশ্ব টেকসই উন্নয়ন সম্মেলন (World Summit on Sustainable Development)

২০০২ সালের ২৬ আগষ্ট-৪ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে অনুষ্ঠিত হয়েছিল বিশ্ব টেকসই উন্নয়ন সম্মেলন। জাতিসংঘের উদ্যোগে এই সম্মেলনের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং বিশ্ব পরিবেশ সংরক্ষণে টেকসই উন্নয়ন ও এর কৌশল নির্ধারণ। এই সম্মেলনের মূল এজেন্ডা নির্ধারিত ছিল পানি ও পয়:নিষ্কাসন ব্যবস্থা, কৃষি, স্বাস্থ্য, জ্বালানী, জীব-বৈচিত্র্য সম্পর্কিত বিষয়ে।

টেকসই উন্নয়ন জোহানেসবার্গ ঘোষণা-২০০২

জোহানেসবার্গে অনুষ্ঠিত টেকসই উন্নয়নে ৩৭ দফা ঘোষণা করা হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো হলো:

সম্মিলিত শক্তি ও টেকসই উন্নয়নের অভিন্ন লক্ষ্য অর্জনে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলস এন্ড দ্য জোহানেসবাগ প্লান অব ইমপ্লিমেনটেশন অনুযায়ী সব কার্যক্রমে মেয়েদের সমান অধিকার, নারীর ক্ষমতায়ন এবং নারী শক্তি নিশ্চিত করার সর্বাত্মক চেষ্টা। এ সম্মেলন মানুষের সমান অধিকারের ওপর আলোকপাত এবং মৌলিক চাহিদা যেমন: বিশুদ্ধ পানি, পয়:নিস্কাশন, পর্যাপ্ত আশ্রয়, জ্বালানি, স্বাস্থ্যসেবা, খাদ্য নিরাপত্তা এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণকে গুরুত্ব দেয়া হয়। টেকসই উন্নয়নের দীর্ঘ সময়ে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র দ্বীপ ও স্বল্পোন্নত দেশসমূহের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেয়ার কথা আলোচনা হয়। টেকসই উন্নয়ন পরিচালনার লক্ষ্যে স্থানীয় ভিত্তিতে আঞ্চলিক সংগঠন এবং জোটগুলোকে অনিবার্যভাবে এগিয়ে আসার কথা বলা হয়। উন্নয়নের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য উন্নত দেশগুলোর প্রতি আবেদন জানানো হয়।[৮]

রিও+২০ সম্মেলন

২০১২ সালের ২০-২২ জুন ব্রাজিলের রিও-ডি-জেনেরিওতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল রিও+২০ সম্মেলন। বিশ্ব ধরিত্রী সম্মেলনের ২০ বছর পর এবং বিশ্ব টেকসই উন্নয়ন সম্মেলনের ১০ বছর পর অনুষ্ঠিত হওয়া এ সম্মেলন যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এ

সম্মেলনে ২০ বছর ব্যাপী বিভিন্ন সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী দেশ সমূহের কর্মপন্থা মূল্যায়ন করা হয় এবং এর ভিত্তিতে নতুন করে কর্মসূচি নির্ধারণ করা হয়। এই সম্মেলনের প্রধান দুইটি প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে:

১. পরিবেশবান্ধব অর্থনীতি যার ভিত্তিতে টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্যকে সমূলে উৎপাটন করা।

২. টেকসই উন্নয়নের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নির্ধারণ করা।

এই সম্মেলনে টেকসই উন্নয়নের ব্যাপারে অনেকগুলো ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে, যেগুলো হচ্ছে: দারিদ্র্যকে সমূলে উৎপাটন, খাদ্যনিরাপত্তা, পুষ্টি এবং টেকসই কৃষি ব্যবস্থা গ্রহণ করা, পানি এবং পয়:নিষ্কাসন ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটানো, নবায়নযোগ্য ও অনবায়নযোগ্য শক্তির ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, পর্যটন, যোগাযোগ, নগর ও জনসাধারণের বাসস্থানের টেকসই ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং সকলের জন্য স্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণ, সকলের জন্য পূর্ণমেয়াদে ভাল চাকুরীর চেষ্টা করা এবং সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের কথাও বলা হয়। সাগর এবং মহাসাগরের পরিবেশ রক্ষা করা, জলবায়ুর পরিবর্তন, বনভূমি রক্ষা ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে করণীয় নির্ধারণের ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়েও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[৯]

পরিবেশ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সম্মেলন প্রতি বছর আনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই সব সম্মেলনের আলোচ্যসূচি এবং সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ফলাফল অনুসারে ২০১৫ সালে নতুন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১২ সালের পরে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সম্মেলনের তালিকা নিম্নে প্রদান করা হলো।

২০১২ সালের পর অনুষ্ঠিত গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশ সংক্রান্ত সম্মেলন ও এর আলোচ্যসূচির তালিকা

সম্মেলন	স্থান	সময়	আলোচ্যসূচি
COP 11	হায়দ্রাবাদ, ভারত	(৮-১৯) অক্টোবর, ২০১২	জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় আলোচনা।
COP 19	ওয়ারশ, পোল্যান্ড	(১১-২৩) নভেম্বর, ২০১৩	গ্রীন হাউস গ্যাসের নির্গমনের মাত্রা বর্তমানের চেয়ে ২ ডিগ্রি কমানোর বিষয়ে আলোচনা।
COP 12	দক্ষিণ কোরিয়া	(৬-১৭) অক্টোবর,২০১৪	টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষন সম্পর্কে আলোচনা।
COP 20	লিমা, পেরু	(১-১৪) ডিসেম্বর,২০১৪	প্যারিস চুক্তির খসড়া তৈরির বিষয়ে সমঝোতা।
৩য় দুর্যোগের ঝুঁকি প্রশমন সংক্রান্ত সম্মেলন	জাপান	(১৪-১৮) মার্চ, ২০১৫	২০১৫ পরবর্তী সময়ে দুর্যোগের ঝুঁকি প্রশমনের কৌশল নির্ধারণ।
COP 21	প্যারিস, ফ্রান্স	৩০নভেম্বর-১২ডিসেম্বর, ২০১৫	গ্রীন হাউস গ্যাস নির্গমন কমিয়ে আনা সংক্রান্ত চুক্তি ও ২৯০০ কোটি ডলারের জলবায়ু তহবিল গঠনের সিদ্ধান্ত।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ (Sustainable Development Goals)

২৫ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫ জাতিসংঘের সাধারন পরিষদে নতুন কর্মপরিকল্পনা Sustainable Development Goals নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০১৫ সাল পর্যন্ত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার পরবর্তী ধারাবাহিক পদক্ষেপ হিসেবে এটা গ্রহণ করা হয়েছে। এতে ১৭টি লক্ষ্যকে ঠিক করে ২০৩০ সালের মধ্যে তা অর্জনের প্রচেষ্টার কথা বলা হয়েছে। এই লক্ষ্যসমূহ হচ্ছে বিশ্বের সব জায়গা থেকে দারিদ্র্যের সমাপ্তি, খাদ্য নিরাপত্তা ও টেকসই কৃষি, সবার জন্য স্বাস্থ্যসম্মত জীবন নিশ্চিত করা, মানসম্মত ও জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা, লিঙ্গীয় সমতা অর্জন ও নারীর ক্ষমতায়ন, টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা ও স্যানিটেশন, টেকসই ও গ্রহনযোগ্য শক্তির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা, উৎপাদনশীল চাকুরি নিশ্চিত করা, টেকসই শিল্পায়ন, নিরাপদ শহর ও বাসস্থান, ব্যবহার ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা। এছাড়াও জলবায়ুর পরিবর্তন এবং এর প্রভাবের ক্ষেত্রে আশু পদক্ষেপ গ্রহণ, সাগর, মহাসাগর এবং সামুদ্রিক সম্পদের টেকসই উন্নয়ন সংরক্ষণ, বন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ, টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার কথা বলা হয়। সবশেষে টেকসই উন্নয়নের জন্য এই লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বৈশ্বিক অংশিদারিত্বকে জোরদার করার কথাও বলা হয়।[১০]

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়নের গুরুত্ব

বাংলাদেশের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশের পক্ষে টেকসই উন্নয়নকে এগিয়ে নেওয়া কতটা সম্ভব এ বিষয়ে চিন্তার অবকাশ রয়েছে। আসলে সমস্যাগুলো বহুমুখী এবং একটা অন্যটার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এগুলোকে জনগণের সমস্যা এবং অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষিতে প্রাধান্য দিয়ে সমাধান করতে হবে।

১. জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও জনসম্পদের উন্নয়ন

উচ্চ হারের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পরিবেশ দূষণের অন্যতম কারণ। বাংলাদেশ সাফল্যজনকভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। যদিও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এখনও তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেনি। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিকে আরও গুরুত্ব দিতে হবে কারন এটা টেকসই উন্নয়ন এর ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। মানব সম্পদের উন্নয়ন বাংলাদেশকে আরও সমস্যায় ফেলেছে। দারিদ্র বিমোচন, উপযুক্ত শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা ইত্যাদির অপর্যাপ্ততা সর্বত্র লক্ষ্যণীয়, আর্সেনিক দূষণ স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে নতুন করে সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এই সমস্যা না কাটলে মানব সম্পদের টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়।

২. কৃষি ক্ষেত্রে টেকসই ব্যবস্থাপনা

গতানুগতিক কৃষির ব্যবস্থাপনা পরিবেশগতভাবে টেকসই। কিন্তু বাংলাদেশ বর্তমানে এই পদ্ধতি থেকে সরে আসছে। সবুজ বিপ্লবের ফলশ্রুতিতে আমরা জৈব রাসায়নিক পদ্ধতিতে ফসল উৎপাদন করছি। আমরা এখন বিভিন্ন ধরনের উচ্চফলনশীল শস্য উৎপাদন করছি। এতে করে রাসায়নিক সারের ব্যাপক ব্যবহার করতে হচ্ছে কিন্তু এই ধরনের পদ্ধতিতে কীটপতঙ্গের আক্রমণ ঠেকানোর ক্ষেত্রেও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হচ্ছে। যে কারণে উৎপাদনের খরচও বেড়ে যাচ্ছে। এটা মাটির মারাত্মক ক্ষতি করছে, একই সাথে ইকোসিস্টেমেরও ক্ষতি হচ্ছে। এই সব নির্দিষ্ট ক্ষেত্রগুলোতে আমাদের নির্ভরশীলতা বেড়ে গেছে যে কারণে কৃষি ক্ষেত্রে জীনগত বৈচিত্র্য হারিয়ে যাচ্ছে। কৃষি ক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়নের জন্য রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার কমিয়ে প্রাকৃতিক পদ্ধতির দিকে ঝুঁকতে হবে। আমাদেরকে মনে রাখতে হবে বর্তমানে কৃষিও বিভিন্ন বহুজাতিক সংস্থা কৃর্তক নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এরা উচ্চ ফলনশীল বীজ উন্নয়নশীল দেশগুলোর উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ব্যবহারের পরামর্শ প্রদান করছে। এই বীজ ব্যবহারের পূর্বে দুইটি বিষয় বিবেচনা করতে হবে (১) এর দীর্ঘ মেয়াদী ফলাফল কি হতে পারে। (২) স্থানীয় কৃষকেরা এর মাধ্যমে তাদের উৎপাদনের ক্ষেত্রে কতটা ক্ষতির সম্মুখীন হবে। শুধুমাত্র উৎপাদন ও লাভের দিক বিবেচনা না করে পরিবেশের ক্ষতিকর দিক এবং মানুষের ক্ষতির কারণগুলো বিবেচনার মাধ্যমে কৃষি ক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়ন করতে হবে।[১১]

৩. শিল্প ক্ষেত্রে টেকসই ব্যবস্থাপনা

শিল্প ক্ষেত্রে টেকসই ব্যবস্থাপনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পরিবেশগত বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে শিল্প কারখানার নির্গত বিষাক্ত গ্যাস, বর্জ্য ইত্যাদি দায়ী। যে কারনে এই বিষয়টিকে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করতে হবে।[১২] পৃথিবীর বিপুল জনসংখ্যার চাহিদা পূরণের জন্য শিল্পোৎপাদন করতেই হবে। শিল্প ক্ষেত্রে টেকসই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আমরা পরিবেশ বান্ধব শিল্প কারখানা স্থাপন করতে পারি। গ্রীনহাউস গ্যাসের নির্গমন কমানোর জন্য

আমাদের কিয়োটো প্রটোকলের নীতিসমূহকে মেনে চলতে হবে। এক্ষেত্রে Clean Development Mechanism (CDM) গ্রহণ করতে হবে। এটা হচ্ছে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক না হয়। নতুন শিল্প স্থাপনের সময় Environmental Impact Assessment (EIA) করতে হবে। EIA হচ্ছে নতুন শিল্প স্থাপনের ফলে পরিবেশের লাভ-ক্ষতির সাথে আর্থিক লাভ-ক্ষতি নির্ধারণের একটা পদ্ধতি। পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তির ব্যবহার, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রসারের মাধ্যমেও শিল্প ক্ষেত্রে টেকসই ব্যবস্থাপনা সম্ভব।

৪. পানি, বন, ভূমির ক্ষেত্রে টেকসই ব্যবস্থাপনা

আমাদের প্রকৃতির প্রয়োজনীয় উপাদান যেমনঃ পানি, বন, ভূমির ক্ষেত্রেও টেকসই ব্যবস্থাপনাকে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।

শিল্প বর্জ্য, সুয়ারেজ বর্জ্য, গৃহস্থালী বর্জ্যের কারনে নগরের পানির উৎসসমূহ দূষিত হচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে সার, কীটনাশকের ব্যবহারের জন্য এবং আর্সেনিকের কারনে ভূ-পৃষ্ঠের এবং ভূ-অভ্যন্তরের পানি দূষিত হচ্ছে। ২০০০ সালের দিকে এদেশের প্রায় ৫১ মিলিয়ন জনগণ আর্সেনিকের ঝুঁকিতে ছিল।[১৩] বাংলাদেশ ভূ-গর্ভস্থঃ পানিকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করছে। এর ব্যবহার যেমনঃ কৃষিক্ষেত্রে রয়েছে, গৃহস্থালীতেও এর ব্যবহার রয়েছে। যে কারণে বাংলাদেশে গ্রীষ্মের মৌসুমে ভূ-গর্ভস্থঃ পানির স্তর অনেক নীচে নেমে যায়। এ ক্ষেত্রে প্রযুক্তির মাধ্যমে নদী ও জলাশয়ের পানি শোধনের মাত্রা বাড়াতে হবে। এই পানি সম্পদকে রক্ষার জন্য সঠিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বর্জ্যের পুনঃশোধনের ব্যবস্থা করতে হবে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে টেকসই কৃষি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সার ও কীটনাশকের ব্যবহার হ্রাস করা সম্ভব হলে বিশুদ্ধ পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা যাবে। আর্সেনিক সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করতে হবে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি, নগরায়ন, শিল্পায়ন ইত্যাদি কারনে বনভূমির পরিমান দিন দিন কমছে। মানুষের সচেতনতা এবং পরিবেশ নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে বনভূমির সংখ্যা বাড়ানো সম্ভব। যদি দেশের প্রয়োজনীয় বনাঞ্চলের সংখ্যা বাড়ানো যায় তাহলে বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমানও কমে যাবে। জীবিকার জন্য বনভূমির উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

ভূমির ক্ষেত্রে টেকসই ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বিভিন্ন ধরণের বর্জ্য যথাস্থানে না ফেললে এগুলো মাটিতে মিশে ক্ষতিকারক ব্যকটেরিয়ার সংক্রমন ঘটিয়ে ভূমিকে দূষিত করবে। এক্ষেত্রে সঠিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ভূমিকে রক্ষা করতে হবে।

দক্ষিনাঞ্চলে চিংড়ি চাষের কারনে জমিতে লবণাক্ততার পরিমান দিন দিন বাড়ছে। যে কারনে ধানসহ আন্যান্য ফসলের উৎপাদন কমছে।১৪ এক্ষেত্রে লবণাক্ততা সহনীয় ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে এই ভূমির টেকসই ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। একই জমিতে একই ফসল প্রত্যেক মৌসুমে চাষ করলে জমির উর্বরতা কমে যায় এবং ফসলের উৎপাদন কম হয়। শস্যাবর্তনের মাধ্যমে একই জমিতে প্রতি মৌসুমে বিভিন্ন শস্য উৎপাদনের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়।

৫. পরিবেশগত সচেতনতা বৃদ্ধি

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে উপযুক্ত শিক্ষার অভাবের কারণে বিভিন্ন ধরনের পরিবেশগত বিপর্যয় ঘটছে। কারণ মানুষ জানে না তাদের কর্মকান্ডের ফলে পরিবেশের কি ধরনের ক্ষতি হতে পারে। টেকসই উন্নয়ন এর জন্য জনসাধারণকে এ বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করতে হবে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিবেশের বিভিন্ন বিষয় তাদের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করবে। এতে শিক্ষিত জনগোষ্ঠী পরিবেশ বিষয়ে সচেতন হবে এবং এদের মাধ্যমে তাদের আশপাশের মানুষ সচেতন হতে পারবে। অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমেও জনসাধারণকে পরিবেশ বিষয়ে সচেতন করে তোলা সম্ভব। এক্ষেত্রে রেডিও, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

৬. আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি

অনেক ধরনের পরিবেশগত সমস্যা রয়েছে যেগুলো প্রাকৃতিকভাবে এক দেশের নয়। এইসব সমস্যা প্রতিরোধে সম্মিলিতভাবে এগিয়ে আসতে হবে। এই সব সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে দ্বি-পাক্ষিক,আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সমঝোতার প্রয়োজন।

যেমন: বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি, ওজোন স্তরের ক্ষয় এই ধরনের সমস্যা সারা বিশ্বের। সারা বিশ্বের সব দেশেরই উচিৎ হবে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এর প্রতিরোধে যেসব কর্মপন্থা গৃহীত হয়েছে সেগুলো মেনে চলা। আবার ফারাক্কা বাঁধের কারণে বাংলাদেশের পদ্মা নদীর পানি প্রবাহে বিঘ্ন ঘটছে এবং এই অঞ্চলের পরিবেশের উপর যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে এই সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের জন্য ভারতের সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার প্রয়োজন।

৭. প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে দৃষ্টি প্রদান

বাংলাদেশে প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ করতে হবে। নবায়নযোগ্য এবং অনবায়নযোগ্য সম্পদকে টেকসই উন্নয়ন এ ব্যবহার করতে হবে। কারণ যদি প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ না করা হয় তাহলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ক্ষতির সম্মুখীন হবে। নবায়নযোগ্য ও অনবায়নযোগ্য সম্পদকে যথাযথভাবে ব্যবহার করতে হবে। তেল, গ্যাস এর পরিবর্তে সৌরশক্তি ও বাতাসের শক্তিকে আমাদের উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করতে হবে।

৮. জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ

জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ যেকোনো দেশের জন্য জরুরী। কোনো দেশের কৃষিসম্পদ, পশুসম্পদ, মৎস সম্পদ, বনজ সম্পদ ইত্যাদির সমন্বয়ে সেই দেশের জীববৈচিত্র্য গড়ে ওঠে। এই জীববৈচিত্র্য যদি ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশের বিপর্যয় ঘটে। প্রাকৃতিক পরিবেশের বিপর্যয়ের কারণে উন্নয়ন ব্যাহত হয়।[১৫]

টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রচেষ্টা

বাংলাদেশ এজেন্ডা ২১ সহ বিভিন্ন ধরনের পরিবেশ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছে এবং এ সংক্রান্ত চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। যে কারণে বাংলাদেশ টেকসই উন্নয়ন এর ব্যাপারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৮ (ক) অনুচ্ছেদে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষা ও উন্নয়ন সম্পর্কে বলা হয়েছে "রাষ্ট্র পরিবেশ রক্ষা ও উন্নয়নের প্রচেষ্টা করবে এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র্য, জলাভূমি, বনভূমি ও বন্য জীবজন্তু সংরক্ষণ ও রক্ষা করবে বর্তমান ও ভবিষ্যত নাগরিকদের জন্য"। এভাবে টেকসই উন্নয়নকে বাংলাদেশে সংবিধানিকভাবে বাধ্যবাধকতার মধ্যে রাখা হয়েছে।

১৯৯৯ সালের ২রা মার্চ ঢাকায় ডি-৮ এর শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা ঘোষণায় টেকসই উন্নয়ন এর ব্যাপারে বাংলাদেশসহ অন্যান্য অংশগ্রহণকারী দেশ নিশ্চয়তা প্রদান করেছে।

বাংলাদেশের ষষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় (২০১১-২০১৫) টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং দূর্যোগ ব্যবস্থাপনাসহ এ সংক্রান্ত অন্যান্য পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে।[১৬] এগুলো হচ্ছে।

(১) জলবায়ু পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট অভিযোজন এবং উপশমের জন্য উপযুক্ত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার দিকে গুরুত্ব প্রদান।

(২) দারিদ্র্য বিমোচন এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়ণের জন্য পরিবেশের টেকসই ব্যবস্থাপনাকে গুরুত্ব দিতে হবে।

(৩) পরিবেশের সম্পদকে সুষ্ঠু ব্যবস্থপানার মাধ্যমে জনগণের উপযোগী করে তুলতে হবে।

(৪) জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং এর টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করা।

(৫) দরিদ্র্য এবং মহিলাদের লোকজ উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে পরিবেশের সংরক্ষণ করার কথা বলা হয়েছে।

(৬) উন্নয়ন কর্মকান্ডে পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তির ব্যবহারকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

(৭) প্রাকৃতিক সম্পদ ভিত্তিক উন্নয়ন কর্মকান্ডকে সংরক্ষণ করার কথা বলা হয়।

(৮) সরকারী এবং বেসরকারী খাতে পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়ে উদ্যোগ নিতে হবে।

(৯) মাটি, পানি এবং বাতাসের দূষণ পর্যবেক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ এবং প্রতিরোধের ব্যবস্থা নিতে হবে।

(১০) আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং আইন অনুযায়ী পরিবেশ সংক্রান্ত যেকোন উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে ।

(১১) পরিবেশ সংক্রান্ত স্থানীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ও আর্ন্তজাতিক প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের সহযোগিতার উদ্যোগ নিতে হবে ।

(১২) বিভিন্ন দেশের মধ্যে পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ে উন্নত প্রযুক্তি,আধুনিক যন্ত্রপাতি, গবেষণা এবং তথ্যের আদান প্রদানের ব্যবস্থা থাকতে হবে ।

(১৩) পরিবেশ সম্পর্কিত বিষয়ে পূর্ব ধারণা এবং প্রতিবেদন গ্রহণ করতে হবে ।

(১৪) বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কমানো, পুন:ব্যবহার এবং পুন:শোধনের ব্যবস্থা নেয়া হবে ।

(১৫) ভাল জ্বালানী এবং উন্নত যানবাহনের মাধ্যমে বায়ু দূষণ রোধের প্রচেষ্টা চালানো হবে ।

(১৬) জীবাশ্ম জ্বালানীর উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে সৌর শক্তি ও অন্যান্য পরিবেশ বান্ধব শক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে ।

(১৭) দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য শিল্প কারখানায় পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করতে হবে ।

(১৮) জনসাধারণের পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ে সচেতনতার উদ্যোগ নেয়া হবে ।

জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশলপত্র

ব্রাজিলে ১৯৯২ সালে অনুষ্ঠিত বিশ্ব ধরিত্রী সম্মেলনের কর্মপন্থা গ্রহণ করে বাংলাদেশ এর লক্ষ্য অর্জনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ । পরবর্তীতে ১৯৯৭ সালের রিও +৫ এবং ২০০2 সালের বিশ্ব টেকসই উন্নয়ন সম্মেলন বাংলাদেশের জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশলপত্র প্রনয়ণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। শেষ পর্যন্ত রিও + ২০ সম্মেলনে জাতিসংঘের ১৯২টি দেশের সদস্যবৃন্দ একটা চুক্তিতে উপনীত হয়েছে কিভাবে এই লক্ষ্য অর্জন সম্ভব । জাতিসংঘের United Nations Environment Programme (UNEP) এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশলপত্র ২০০৯ সালে প্রনয়ণ করা হয়েছিল । পরবর্তীতে এতে কিছু পরিবর্তন করা হয় এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র, ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং রূপকল্প ২০২১এর কৌশলসমূহের সাথে সমন্বয় করা হয়েছে ।

২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ বাংলাদেশের জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশলপত্রের চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়েছে ।[১৭]

দেশকে মধ্যম আয়রে দেশে রূপান্তর ঘটানোর উদ্দেশ্য এই টেকসই উন্নয়ন এর কৌশলপত্র গ্রহণ করা হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন কৌশলপত্রে প্রস্তাবিত পদক্ষেপগুলো ২০২১ সালের মধ্যে বাস্তবায়নযোগ্য বলা হয়েছে। এছাড়া কৌশলপত্রটি সরকারের রূপকল্প ২০২১, ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-১৫), বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২১) এবং সরকারের অন্যান্য বিদ্যমান পরিকল্পনা, নীতি, কৌশলসমূহ এবং বাস্তবায়ন পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে প্রণীত হযছে। দেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক, প্রাতিষ্ঠানিক, বৈজ্ঞানিক এবং অর্থনৈতিক সামর্থের ভিত্তিতেই জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশলপত্র সাফল্যজনকভাবে বাস্তবায়িত হবে। এতে বলা হযছে, ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়রে অর্থনীতির মর্যাদা অর্জনের লক্ষ্যে অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার মধ্যে অন্যতম হলো টেকসই উন্নযন। জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশলপত্রে সুখী ও সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গঠনের দিকে দৃষ্টি দেয়া হয়েছে যাতে দেশের সব নাগরিকেরা হবে সম্পূর্ণ ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অসমতা, নিরক্ষরতা, দুর্নীতি মুক্ত এবং সবাই ভাল পরিবেশে বসবাস করবে। অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক উভয় উৎস থেকে যথাক্রমে প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট পরিবেশ অবক্ষয় ও জলবায়ু পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রবৃদ্ধি স্থিতিশীল করার চ্যালেঞ্জ তৈরি হয়েছে। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও স্থিতিশীল পরিবেশের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য এ কৌশলপত্রে প্রয়োজনীয় কৌশলসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে। এতে ৫টি কৌশলগত ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। এই ক্ষেত্রগুলি হচ্ছে :

(১) টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান সমস্যাগুলো হচ্ছে স্বল্প বিনিয়োগ ও সঞ্চয় হার, অদক্ষ মানব সম্পদ, প্রান্তিক মানের মোট উপকরণের উৎপাদনশীলতা এবং ভূমির দুষ্প্রাপ্যতা বা প্রতিবন্ধকতা, অবকাঠামো কর্মসূচীতে ক্রমবর্ধমান সরকারি বিনিয়োগ, মানবসম্পদ উন্নয়ন, গবেষণা ও উন্নয়ন, পিপিপি, বিনিয়োগ ও বিনিয়োগ প্রণোদনা বৃদ্ধির মাধ্যমে আইটি খাত উৎসাহিতকরণ, বেসরকারি বিনিয়োগ, গবেষণা ও উন্নয়ন, শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন, দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ, রফতানি প্রবৃদ্ধি ও বৈচিত্র্যকরণ, বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি। এই সমস্যাগুলো সমাধানে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে।

(২) অগ্রাধিকার খাতের উন্নয়ন

কৃষি, শিল্প, জ্বালানি ও পরিবহন হলো অগ্রাধিকার খাত যা দেশের টেকসই উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জ্বালানি খাতের টেকসই উন্নয়ন কৌশলের লক্ষ্য হলো, অর্থনৈতিক উনয়ন ও শিল্পোন্নয়নের গতি ত্বরান্বিতকরণ নিশ্চিত করার জন্য গতানুগতিক ও অপ্রচলিত জ্বালানির নিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের মধ্য দিয়ে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। বিদ্যুৎ খাতের কৌশলের লক্ষ্যসমূহ হলো উৎপাদন বৃদ্ধি এবং

আমদানির মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, চাহিদা ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, বিদ্যুৎ উৎপাদনে গ্যাস নির্ভরতা কমিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনে কয়লা, পারমাণবিক শক্তি এবং অন্যান্য পরিচ্ছন্ন প্রযুক্তি অর্থাৎ পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির ব্যবহার। গ্যাসের ক্ষেত্রে বলা হযছে, বাপেক্সের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা বৃদ্ধি করা, উপকূলবর্তী প্রাকৃতিক গ্যাসের জন্য আন্তর্জাতিক কোম্পানিকে আকৃষ্ট করা, গ্যাস বিতরণের কৌশলসমূহের কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি, প্রান্তিক গ্যাস ব্যবহারকারীদের মূল্য সমন্বয় করা, দুর্ঘটনার ঝুঁকি এড়ানো, দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যত চাহিদা এবং আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক জ্বালানি সহযোগিতার সমতা রক্ষা করে গ্যাস উত্তোলন করা। কয়লার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, কযলা নীতি প্রণয়নে বর্তমান ও ভবিষ্যত উত্তোলন, সম্প্রসারণ ও ব্যবহার এবং যেগুলোতে পরিবেশের ওপর কম প্রভাব পড়ে সে ধরনের প্রযুক্তি গ্রহণ ও ব্যবহারের বিষযটি তুলে ধরাই হলো কয়লা খাতের প্রধান টেকসই কৌশল। এছাডা টেকসই উন্নযন কৌশলপত্রে পরিবহন, মানব সম্পদ উন্নয়ন, জনসংখ্যা পরিকল্পনা, মানসম্মত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা ও পয:নিষ্কাসন, উন্নত পুষ্টি, খাদ্য নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়কে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রহণ করা হয়েছে।

(৩) নগরের পরিবেশ

এই কৌশলপত্রে নগরের পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখার জন্য নগরবাসীদের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা, নগরের বস্তি এলাকার সুষ্টু ব্যবস্থাপনা, পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ এবং পয:নিষ্কাসন ব্যবস্থা, জনব্যবস্থাপনা, নগরের যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া কৌশলপত্রে বলা হয়েছে, দুর্যোগের কারণে ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কী ধরনের ঝুঁকি আসতে পারে সেটা মূল্যায়নের জন্য নগর কমিউনিটি ঝুঁকি মূল্যায়ন জরিপ পরিচালনা করা হবে। সব নগরের জন্য ঝুঁকি হ্রাসকরণ এ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়ন করা হবে। এই এ্যাকশন প্ল্যান অনুযায়ী ক্ষুদ্র ও মধ্যম পর্যায়ের ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য যে অবকাঠামোগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে তার নকশা প্রণয়নের কাজ নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

(৪) সামাজিক নিরাপত্তা এবং প্রতিরোধ

এতে বিভিন্ন ধরনের কৌশল অবলম্বনের প্রস্তাব করা হয়েছে মূলত নাগরিকদের অধিকার এবং উন্নত জীবন নিশ্চত করার জন্য। নীতিমালা রয়েছে, বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য, বস্ত্র, ন্যূনতম আশ্রয়, উৎপাদনশীল নিয়োগ, গুণগত শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও উপযোগ সেবা, পর্যাপ্ত সামাজিক নিরাপত্তা এবং সুষ্ঠু পরিবেশের নিশ্চযতা বিধান করার বৃহত্তম চ্যালেঞ্জ। এতে মহিলা, শিশু, বয়স্ক, অসামর্থ এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির জনগণের সামাজিক অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে।

(৫) পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

এই কর্মকৌশলের প্রাথমিক লক্ষ্যের ক্ষেত্র হচ্ছে, মানবজাতির জন্য পরিবেশ রক্ষা করা

যার মাধ্যমে ইকোসিস্টেম ও প্রাকৃতিক সম্পদের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চত করা সম্ভব। এতে ভূমি, বনভূমি, পানি সম্পদ, জীববৈচিত্র্যে উপকূল ও সামুদ্রিক সম্পদ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত বিভিন্ন কৌশল তুলে ধরা হয়েছে। এতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জলবায়ুর পরিবর্তনকে যদি বিশেষ বিবেচনায় না রাখা যায় তাহলে টেকসই উন্নয়ন কখনও সম্ভব নয়।

টেকসই উন্নয়নের কর্মকৌশলের প্রাধান্যের ক্ষেত্রগুলির সাথে আরও তিনটি ক্ষেত্রকে এর সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে :

(১) দূর্যোগের ঝুঁকি উপশম এবং জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোজন

দূর্যোগের ঝুঁকি কমানো এবং জলবায়ুর পরিবর্তন মোকাবিলার জন্য এই কর্মকৌশলে উপশম, প্রযুক্তি হস্তান্তর, অভিযোজন, সামর্থ বৃদ্ধিকে সকল সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে যুক্ত করার কথা বলা হয়েছে। এসব ক্ষেত্রের মধ্যে কৃষি, শিল্প, শক্তি, যোগাযোগ ব্যবস্থা, নগরের আবাসন উল্লেখযোগ্য।

(২) সুশাসন

সুশাসনের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের কর্মকৌশলকে বাস্তবায়নের চেষ্টা করতে হবে। এক্ষেত্রে যেসব বিষয়কে বেশী প্রাধান্য দেয়া প্রয়োজন আগ্রাধিকার ভিত্তিতে তার প্রাধান্য দিতে হবে।

(৩) লিঙ্গ

দেশের অর্ধেক জনসংখ্যা নারী। নারীকে বাদ দিয়ে কোনো ধরনের উন্নয়ন আশা করা যায় না। এ কারণে টেকসই উন্নয়নের কর্মকৌশলের সকল ক্ষেত্রগুলিতে নারীর অংশগ্রহণের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অর্জন

বাংলাদেশ টেকসই উন্নয়নকে অর্জনের জন্য সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে বিভিন্ন নীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে এবং বাস্তবায়ন করছে। ২০১৫ সাল পর্যন্ত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সময় নির্ধারণ করা হয়েছিল। এই সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রত্যাশার তুলনায় বেশি সাফল্য পেয়েছে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে আশানুরূপ সফলতা অর্জন করতে পারে নাই। বাংলাদেশ দারিদ্র্য ও ক্ষুধা বিমোচনের ক্ষেত্রে মন্তব্যজনক উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। ১৯৯১-৯২ সালের দিকে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার ছিল ৫৬.৭% ২০১০ সালে যা হয়েছিল ৩১.৫%। ২০১৫ সালের মধ্যে এর লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল ১.৭৪% কমানো কিন্তু ২০১২ সালের মধ্যেই বাংলাদেশ এই লক্ষ্য (২৯.০%) অর্জন করেছে।[১৮] সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্তরে লিঙ্গীয় সমতা অর্জিত হয়েছে। ২০১৩ সালের জানুয়ারি মাসে প্রধানমন্ত্রী সকল বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারি

করার ঘোষনা প্রদান করেন এই সময়েই ২৬,১৯৩ টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারি করা হয়।[১৯] লিঙ্গীয় সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য সফলতার দাবিদার। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে লিঙ্গীয় সমতা অর্জন সম্ভব হয়েছে। গ্রামাঞ্চলের মেয়েদের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে সরকার থেকে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। নারীদের শিক্ষা ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার জন্য সরকার স্নাতক ও সমপর্যায়ের ছাত্রীদের জন্য ১০০০কোটি টাকার শিক্ষা ট্রাস্ট গঠন করে এই ফান্ডের লভ্যাংশ ৭৫.১৫ কোটি টাকা ১.৩৩ লক্ষ ছাত্রীকে বৃত্তি প্রদানের জন্য বরাদ্দ করেছে। ২০১১ সালে নারী উন্নয়ন নীতি প্রনয়ণ করা হয়েছে। মহিলাদের জন্য জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসন সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। গত জাতীয় নির্বাচনে সংসদের মোট আসনের ২০% মহিলা সাংসদ হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে। যদিও কৃষি ক্ষেত্রে এবং গৃহকর্মে নিযুক্ত অনেক মহিলা কোনো মজুরি ছাড়াই কাজ করছে।[২০] বাংলাদেশে শিশু মৃত্যুর হার কমানো সম্ভব হয়েছে। পাঁচ বছরের নিচের শিশু মৃত্যুর হার ১৯৯০ সালে ছিল ১০০০ এর মধ্যে ১৫১ জন ২০১৩ সালে যা কমে হয় ৪১।[২১] মাতৃ মৃত্যুর হার কমানোও সম্ভব হয়েছে। ১৯৯০-৯১ সালে ১ লক্ষের মধ্যে ৫৭৪ জন মাতা শিশুকে জন্মদানের সময় মারা যেত ২০১০ সালে সেই সংখ্যা কমে ১৯৪ হয় এবং ২০১৩ সালে তা হয় ১৭০ জন।[২২] বাংলাদেশ এইচ আই ভি, ম্যালেরিয়াসহ অন্যান্য রোগের বিস্তার কমাতে সক্ষম হলেও এই ক্ষেত্রে আরও গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। টেকসই পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য দেশের বিভিন্ন নীতিতে সমন্বিত টেকসই উন্নয়নকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশে ৩০ ভাগ বনভূমি থাকার কথা বলা হলেও বর্তমানে মাত্র ১৩.৪০% বনভূমি রয়েছে। ২০১৫ সালের মধ্যে যে লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল বনভূমির পরিমান তার তুলনায় কম।[২৩] সরকারি উদ্যোগে বনায়ন করা হলেও মানুষের অসচেতনতার কারনে বনভূমির পরিমান বাড়ানো সম্ভব হচ্ছে না। নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন সুবিধা, কার্বন নির্গমন কমানো ইত্যাদি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ২০১১-১৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের জন্য ৭৮.২ বিলিয়ন ডলার অর্থ নির্ধারণ করা হয়েছিল। যার সম্পূর্ণ অর্থ উন্নয়ন সহযোগী দেশসমূহের নিকট থেকে পাওয়া সম্ভব হয় নি। ৯০-৯১ অর্থ বছর থেকে ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের মধ্যে বাংলাদেশ প্রত্যেক বছরে গড়ে ০.৬৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদান এবং ১.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ হিসেবে পেয়েছে। এই সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ মাত্র ৫০.৮২% আনুষ্ঠানিক উন্নয়ন সাহায্য গ্রহণ করেছে।[২৪] যে কারনে বাংলাদেশকে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যকে সামনে রেখে বৈশ্বিক অংশীদারিত্বের সম্ভাবনা তৈরি করতে হবে। এক্ষেত্রে কূটনৈতিক তৎপরতা বাড়ানোর মাধ্যমে তা অর্জন করা সম্ভব হতে পারে। বাংলাদেশ টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পেয়েছে। এসব পুরস্কারের মধ্যে ২০১০ সালের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সাফল্যজনক অর্জনের জন্য জাতিসংঘের MDG এওয়ার্ড, ২০১২ সালে তথ্য ও

যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং নারী ও শিশু স্বাস্থ্যের সুরক্ষার জন্য South-South (digital) এওয়ার্ড, ২০১৩ সালের জুন মাসে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ১নং লক্ষ্যের ক্ষেত্রে সাফল্যজনক অবদানের জন্য খাদ্য ও কৃষি সংস্থা কর্তৃক প্রাপ্ত ডিপে-্মা এওয়ার্ড, ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দারিদ্র্য দূরীকরণের স্বীকৃতি স্বরূপ South-South এওয়ার্ড, ২০১৪ সালে নারীর ক্ষমতায়ন এবং মেয়েদের শিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ সাফল্যের জন্য UNESCO Peace Tree এওয়ার্ড, ২০১৫ সালে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য দূর করার জন্য WIP এওয়ার্ড এবং ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাতিসংঘের সর্বোচ্চ পরিবেশ পুরস্কার Champion of the Earth প্রদান করা হয়েছে। এসব পুরস্কার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গ্রহণ করেছেন।[২৫] বাংলাদেশের পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন নীতি ও উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য এসব পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশই প্রথম ২০০৯ সালে সমন্বিত জলবায়ুর পরিবর্তনের কৌশল ও কর্মপন্থা গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ ২০০৯-১০ অর্থ বছরে প্রথম জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করে। শুরু থেকে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে এই ফান্ডের জন্য ৩০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। দাতাদের নিকট থেকেও অর্থ সংগ্রহ করা হচ্ছে। সরকার সাম্প্রতিক সময়ে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজনের জন্য জাতীয় বাজেটের ৬-৭% অর্থ বরাদ্দ করেছে যা প্রায় ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।[২৬] প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের প্রচেষ্টাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। এটা এমন একটা পদ্ধতি যার মাধ্যমে পরিবেশের উন্নয়ন এবং জলবায়ুর পরিবর্তন সংক্রান্ত পদ্ধতিগত ও প্রযুক্তিগত অভিজ্ঞতা বিভিন্ন দেশের সরকার, বেসরকারি সংস্থা, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, গবেষণা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে বিনিময় করা।[২৭] বিভিন্ন পরিবেশ সম্মেলনে এ বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করার কথা বলা হচ্ছে। বাংলাদেশ বিভিন্ন দেশের সাথে প্রযুক্তি হস্তান্তরের চেষ্টা করছে।

বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতা

টেকসই উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অনেক লক্ষ্য অর্জন করলেও কিছু কিছু বিষয়ে সম্পূর্ণ অর্জন সম্ভব হয়নি। এখন জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে সে বিষয়গুলো আর্জন করা বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের জন্য প্রযুক্তি হস্তান্তরের বিষয়টি চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। প্রবন্ধের আলোচনায় টেকসই উন্নয়নের বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও টেকসই উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে অধিক জনসংখ্যা, দাতা সংস্থা কর্তৃক অপর্যাপ্ত সাহায্য ও ঋণ প্রাপ্তি, প্রাকৃতিক দূর্যোগ, প্রভাবশালী গোষ্ঠী কর্তৃক পরিবেশ আইন না মেনে পেশিশক্তি ও অর্থের বিনিময়ে অপরাধ হতে অব্যাহতি ইত্যাদিকে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

উপসংহার

বর্তমানে বিশ্বের সকল দেশ উন্নয়নকে যেমন গুরুত্ব দিচ্ছে একই সাথে টেকসই উন্নয়নকেও বিবেচনায় রাখছে। টেকসই উন্নয়ন নিয়ে উৎকণ্ঠার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত টেকসই উন্নয়ন সংক্রান্ত সম্মেলনে গৃহিত কর্মপন্থার মাধ্যমে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশও টেকসই উন্নয়নের গুরুত্ব উপলব্ধি করে বিভিন্ন ধরনের কর্মপন্থা গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ বিভিন্ন ধরনের সম্মেলনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে এসব সম্মেলনে গৃহিত নীতিমালার সাথে সম্মতিজ্ঞাপন করেছে। আমাদের উন্নয়ন কর্মকান্ডকে ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্যে সরকার ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন কর্মকৌশলসহ সরকারের বিভিন্ন নীতিতে একে গুরুত্বসহকারে দেখা হচ্ছে এবং গৃহিত নীতি বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা অনেকাংশে সফল হয়েছে। আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর এজেন্ডায় দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে পরিবেশগত বিষয়কেও অন্তর্ভূক্ত করা হচ্ছে যাতে টেকসই উন্নয়নকে অনেকাংশে অর্জন করা সম্ভব হয়। বাংলাদেশের পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় The National Environment Management Action Plan (NEMAP) তৈরী করেছে। এছাড়াও Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan(BCCSAP) প্রনয়ণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। স্থানীয় পর্যায়ে জনসাধারণকে বিভিন্নভাবে বোঝানো হচ্ছে পরিবেশ সংরক্ষণের কথা। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পরিবেশ বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের গবেষণা হচ্ছে। জলবায়ুর পরিবর্তন টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে অন্যতম বাধা। এই বাধা দূর করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন নীতিতে অভিযোজন এবং প্রশমনের বিষয়কে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। একই সাথে মানুষের সৃষ্ট কর্মকান্ড যেমনঃ জনসংখ্যা বৃদ্ধি, নগরায়ন, কৃষিজমি হ্রাস, বনভূমি কর্তন ইত্যাদি যাতে টেকসই উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে সে উদ্দেশ্যেও বিভিন্ন বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এভাবে সব ক্ষেত্রে সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নকে বাস্তবে রূপদান করা সম্ভব হবে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যসমূহ অর্জিত হবে বলে আশা করা যায়।

তথ্য নির্দেশিকা

1. Elliott, Jannifer A., An Introduction to Sustainable Development: The Developing World, New York, Routledge, 1996, p. 3.
2. Ibid.
3. Redclift, Michael., Sustainable Development Exploring the Contradictions, New York, Methuen,,1987, p. 133.
4. WCED 1987, Our Common Future, The World Commission on Environment and Development, New York, Oxford University Press, 1987, p. 43.
5. Ibid.
6. Khuda, Zinatunnesa R. M. M., Environmental Degradation: Challenges of the 21st century, Dhaka, Environmental Survey and Research Unit, 2001, pp. 228-230.
7. Ibid, p. 231.
8. www.unmillenniumproject.org/.../131302_wssd_report_reissued.pdf .(accessed 20 November, 2015)
9. https://sustainabledevelopment.u.. (accessed 12 November, 2015)
10. Bhattacharya, Debapriya, The Agenda of Sustainable Development Goals: Implementation Challenges For Bangladesh, Dhaka, Centre for Policy Dialogue (CPD), 2015.
11. Alauddin, Mohammad, and Tisdell, Allan Clement, The Environment and Economic Development in South Asia: An Overview Concentrating on Bangladesh, New York, Macmillan Press Ltd. and St. MartinÕs Press, Inc.1998, p.127.
12. Gain, Philip (ed.), Bangladesh Environment: Facing the 21st Century, Dhaka, Society for Environment and Human Development, p.165.
13. Ahmed, M. Feroze (ed.), Bangladesh Environment 2000, Dhaka, Bangladesh Poribesh Andolon, 2000, p. 84.

14. Alauddin, Mohammad, and Tisdell, Allan Clement, op. cit., p. 146.

15. Khuda, Zinatunnesa R. M. M., op. cit., p. 236.

16. Planning Commission, The Sixth Five Year Plan of Bangladesh 2011-2015, Dhaka, General Economic Division, Planning Commission, Ministry of Planning, Government of the PeopleÕs Republic of Bangladesh, 2011.

17. www.plancomm.gov.bd/.../Nati...(accessed 15 November, 2015)

18. Planning Commission, Millennium Development Goals: Bangladesh Progress Report 2015, Dhaka, General Economic Division, Planning Commission, Government of the PeopleÕs Republic of Bangladesh, 2015, p.9.

19. Ibid, p.10.

20. Ibid.

21. Ibid.

22. Ibid, p.11.

23. Ibid, p.13.

24. Ibid.

25. www.UNEP.org/.../Default.aspx?...(accessed 29December, 2015)

26. www.bcct.gov.bd/index.php/trust-fund. (accessed 29December, 2015)

27. https://www.thegef.org/gef/Techonology-Transfer. (accessed 29December, 2015)

ISSN 1605 - 7023

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা
পঞ্চদশ বর্ষ সংখ্যা
১৪২২ বঙ্গাব্দ/২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

উপশহরীয় মানুষের সামাজিক অসঙ্গতি দূরীকরণ ও সচেতনতা সৃষ্টিতে গণমাধ্যমের প্রভাব: ধামরাই পৌরসভার উপর একটি সমীক্ষা

গাজী ইব্রাহীম আল মামুন*

***Abstract**: Mass media (Newspaper, television, radio etc.) is one of the main media of socialization process. It provides news/information, entertainment and education to masses. In this factor, the media can be change people's views, idea-opinion, behavior and mentality. That means the media has influenced in many ways on life and thought of masses. In Bangladesh as like the developed world, the suburb is rising in the surrounding areas of the city. Different types of media plays importance role for expulsion of social incompatibility and creation social awareness in this type of society. As a result, the positive change in suburb's society. Again, through the media, the western culture has infiltrated in our suburb society as well as increasing social incompatibilities and crimes such as drug addiction, moral decadence of youths, terrorism, violence especially women violence, corruption, starkness, killing, etc. In this factor, Positive or negative impact of the media is not the same at all levels. All media is not positive or negative for expulsion incompatibility and creation of social awareness in suburb's society. A different kind of media plays roles differently. In this criterion the main focus of this article is to examine the impact of media for expulsion incompatibility and creation of social awareness in suburb's society of Bangladesh and identify the effective media in this factor; analyze the negative role of media for increasing incompatibilities and social crimes in suburb's society and try to some recommendations have been presented for the role of media more positive to expulsion incompatibility and creation of social awareness in suburb's society of Bangladesh.*

ভূমিকা

সমাজজীবনে প্রচারমাধ্যম বা মিডিয়ার ভূমিকা অনস্বীকার্য। গণমাধ্যম প্রধানত তিনটি কাজ করে। প্রথমত গণমাধ্যম তথ্য সরবরাহ করে, দ্বিতীয়ত বিনোদন দেয় এবং তৃতীয়ত এটা জনগণকে 'শিক্ষিত' করে তোলে।[১] এ প্রেক্ষাপটে ব্যক্তি, সমাজ-রাষ্ট্র, নীতি-নৈতিকতাবোধ তথা সামাজিক মূল্যবোধ, আচার-আচরণ প্রভৃতি সম্পর্কে গণমাধ্যম দ্বারা অতি সহজেই ধারণা লাভ করতে পারে এবং তৈরি হয় ব্যক্তির সামাজিক সচেতনতা। এ প্রসঙ্গে Dawsan & Prewit বলেন, "By reading

---

* প্রভাষক, ঢাকা সিটি কলেজ, ঢাকা।

১ নাসরীন, গীতি আরা ও অন্যান্য (সম্পাদিত), গণমাধ্যম ও জনসমাজ, শ্রাবণ, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ১৭।

newspaper reports, listening to radio-talk and seeing telivision-flims people develop taste as well as distaste to certain norms and values".[২] এ জন্যই বর্তমান সময়ে গণমাধ্যমকে বিশেষজ্ঞরা সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে আখ্যায়িত করেন। গণমাধ্যম তথ্যপ্রদান, শিক্ষাদান ও বিনোদনের মাধ্যমে সমাজের সকল স্তরে প্রভাব বিস্তার করে। বলা হয়ে থাকে, মানুষ গণমাধ্যমের সংস্পর্শেই নিজেকে বিকশিত করে, এমনকি মানুষের সাধারণ আচার-ব্যবহার, পারস্পরিক সম্পর্কের মাত্রা কেমন হবে তা অনেকটা গণমাধ্যমই নির্ধারণ করে দেয়। কাজেই বলা যায় যে, গণমাধ্যম মানুষের সামাজিক-সাংস্কৃতিক উপাদানের সাথে এমনভাবে জড়িত যে, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও গণমাধ্যম একটি অনুষঙ্গ হিসেবে বর্তমানে অনুমিত। আমরা এ প্রবন্ধে গণমাধ্যম কীভাবে মানুষের সামাজিক-সাংস্কৃতিক দিককে প্রভাবিত করে এবং এ প্রভাব মাত্রা পরিবর্তনশীল সমাজ প্রেক্ষাপটে মানুষের সামাজিক অসঙ্গতি দূরীকরণ ও সচেতনতা সৃষ্টিতে কতটা ইতিবাচক ও কতটা নেতিবাচক তা পরীক্ষা করার চেষ্টা করব।

২.০: গবেষণার উদ্দেশ্য:

১. বাংলাদেশের উপশহরীয় সমাজ জীবনে বিভিন্ন ধরনের গণমাধ্যম কী ধরনের প্রভাব সৃষ্টি করে তার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা;

২. বাংলাদেশের উপশহরীয় সমাজের অসঙ্গতি দূরীকরণে ও সচেতনতা সৃষ্টিতে বিভিন্ন ধরনের গণমাধ্যম কতটুকু ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করে এবং কোন ধরনের গণমাধ্যম এক্ষেত্রে বেশি কার্যকরী ভূমিকা পালন করে তা পরীক্ষা করা;

৩. উপশহরীয় সমাজে গণমাধ্যম কী ধরনের নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করে এবং কোন ধরনের গণমাধ্যম এ ক্ষেত্রে বেশি দায়ী তা পরীক্ষা করা;

৪. পরিবর্তনমুখী উপশহরীয় সমাজে অসঙ্গতি দূরীকরণে ও সচেতনতা সৃষ্টিতে গণমাধ্যমের ভূমিকাকে আরও ইতিবাচক করার জন্য কতিপয় সুপারিশ উপস্থাপন করা।

২.১: তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি:

এ গবেষণা কর্মটি প্রধানতঃ প্রাথমিক তথ্য নির্ভর হওয়ায় গবেষণা কৌশল হিসেবে এখানে জরিপ পদ্ধতি (Survey method) ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বয়স, পেশা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, লিঙ্গ প্রভৃতি জনসংখ্যাতাত্ত্বিক (Demographic) চলকের ভিত্তিতে গবেষণা এলাকা ধামরাই উপশহরের ৩১০ জন উত্তরদাতার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণায় প্রশ্নপত্র মূলত কাঠামোগত ও অকাঠামোগত প্রকৃতির। এতে কিছু কিছু প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তর নির্দিষ্ট উত্তরের মধ্যে আবদ্ধ, আবার কিছু কিছু বিশ্লেষণধর্মী। গবেষণার প্রয়োজনে দ্বিতীয়

[২] Daswan. Richard E. & Prewit, Kenneth, Political Socialization, Little Brown (Fourth Printing), 1969, p. 76

পর্যায়ের বা মাধ্যমিক উৎস (বিভিন্ন গ্রন্থ, জার্নাল, সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সমীক্ষা, বিভিন্ন প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত রিপোর্ট এবং ইন্টারনেট প্রভৃতি) হতেও সহায়তা নেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, গবেষণার এলাকা হিসেবে ধামরাই উপশহরকে প্রতিনিধিত্বমূলক (Typical) গবেষণা এলাকা হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

২.৩: ধারণার কার্যকরী সংজ্ঞায়ন: উপশহর ও গণমাধ্যম

Suburb বা উপশহর বলতে শহর বা নগর হতে দূরে কিংবা নগরের প্রতিবেশি হিসেবে স্বীকৃত এলাকা যেখানে নাগরিক সুবিধাদি নগরের মতোই; তবে নগরের মতো এতো বেশি জনসংখ্যা ধারণ করে না। ডেভিট রাস্কের (David Rusk) মতে, নগর বা বড় শহরের পাশাপাশি এলাকা, যেখান হতে জাতীয় পরিষদে প্রতিনিধি থাকে, যেখানে পৌরসভা বিদ্যমান এবং যা নগরের পাশাপাশি হলেও নগর হতে আলাদা বা পৃথক সেধরনের ইউনিকর্পোরেট এলাকা বা অঞ্চলকে উপশহর বলা হয়।[৩] এর মানে হলো উপশহর হলো নগরের পাশাপাশি আধুনিক শহরমুখ এলাকা যেখানে নগরের মতো শিল্প প্রতিষ্ঠান যেমন গড়ে উঠছে তেমনি নগরের মতো এতো বেশি জনসংখ্যার চাপ নেই এবং যার আলাদা প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক কাঠামো রয়েছে। বর্তমান গবেষণায় উপর্যুক্ত সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে এমন এলাকা হিসেবে 'ধামরাই পৌর এলাকা'কে উপশহর হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। অন্যদিকে গণমাধ্যম হলো যন্ত্র দ্বারা সুগঠিত একটি 'ওয়াকিং গ্রুপ' (working group)। যা বহু মানুষের কাছে একই সঙ্গে একই বার্তা পৌঁছে দেয়। রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র, বই-পুস্তক, সাময়িকী, কার্টুন, পোস্টার, লিফলেট, মাইকিং, সিনেমা, ইন্টারনেট প্রভৃতি গণমাধ্যমের অন্তর্ভূক্ত।[৪] তবে বর্তমান গবেষণায় গণমাধ্যম বলতে রেডিও, টেলিভিশন ও সংবাদপত্রকে বুঝানো হয়েছে।

৩.০: মানুষের সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবন ও গণমাধ্যম: তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেই মানুষের বসবাস। সমাজ ও মানুষের জীবন একসূত্রে গাঁথা। আর সংস্কৃতি হলো সমাজের অংশ। মানুষ সংস্কৃতির শিক্ষা এই সমাজ হতেই আরোহণ করে। এক্ষেত্রে সামাজিক সংস্কৃতি, মানুষের আচার-আচরণ, মূল্যবোধ তথা মানুষকে সামাজিক মানুষে পরিণত করার প্রধান ভূমিকা পালন করে গণমাধ্যম। ব্যক্তির সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার অন্যতম প্রধান মাধ্যম হলো গণমাধ্যম। ব্যক্তি জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য সম্পর্কে ধারণা নেয় বিভিন্ন ধরনের গণমাধ্যমের সাহচর্যেই। আর এ প্রক্রিয়ায় ব্যক্তির ব্যক্তিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক, জাতীয় জীবনের করণীয় বিভিন্ন বিষয় নির্ধারিত হয়। অর্থাৎ গণমাধ্যম ব্যক্তির সামাজিক-সাংস্কৃতিক তথা জাতীয় জীবন গঠনের বা পরিচালনের অন্যতম নিয়ামক হিসেবে ভূমিকা পালন

---

৩ Rusk, David, Cities without Suburbs, ISBN 0-943875-73-0, Wikipedia, the free encyclopedia, dated 30 july, 2012.

৪ Campbell and Martin, Media and Culture: An Introduction to Mass Communication, Bedford/St. Martin's, Boston, 2000, p. 4.

করে। গণমাধ্যমের বিভিন্ন বার্তা সামাজিক মানুষের মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন তথা ব্যক্তিমানস গঠন করে এবং সামাজিক অনুকূল ও প্রতিকূল পরিস্থিতির সাথে ব্যক্তিকে খাপ খাইয়ে নিতে সহায়তা করে।[৫] এপ্রেক্ষিতে লক্ষ করা যায় যে, গণমাধ্যম ব্যক্তির সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনকে দু'টি প্রধানতম দিক হতে প্রভাবিত করে। যথা:

১. মনস্তাত্ত্বিক দিক

যেক্ষেত্রে গণমাধ্যমের বিভিন্ন বার্তা ব্যক্তির ব্যক্তিমানসের ওপর প্রভাব বিস্তার করে এবং তার মনোজাগতিক ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-চেতনা, ভাবধারার পরিবর্তন সাধনকল্পে কাজ করে। Prof. Melvin L. DeFleur and Sandra S. Ball Rokeach ব্যক্তির জীবনের উপর গণমাধ্যমের এ মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবকে 'মনস্তাত্ত্বিক মডেল'-এর মাধ্যমে স্পষ্ট করেছেন। মডেলটি নিম্নরূপ:

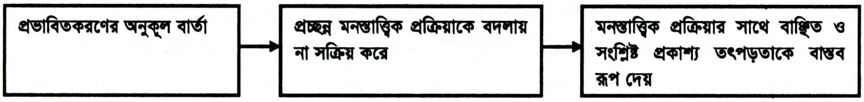

(উৎস: Melvin L. DeFleur and Sandra S. Ball-Rokeach (মূল), আফতাব হোসেন (অনুবাদ), গণযোগাযোগ তত্ত্বাবলী, বাংলা একাডেমী প্রকাশনা, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ.২৬৬।)

উপর্যুক্ত মডেলটি থেকে লক্ষ্য করা যায় যে, গণমাধ্যম ব্যক্তিকে প্রভাবিত করার অনুকূল তথা উর্পযুক্ত বার্তা প্রেরণ করে। এ বার্তার মাধ্যমে ব্যক্তি মনস্তাত্ত্বিকতা তথা দৃষ্টিভঙ্গি বা মনকে আরো সক্রিয় করে তোলে। ব্যক্তি মানসিকভাবে যে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল, গণমাধ্যমের বার্তা দেখা, শোনা বা পড়ার পড়ে সে প্রক্রিয়াকে আরো সক্রিয় করে তোলে। এভাবে ব্যক্তি একটি কাজে উদ্বুদ্ধ হয়ে তার বাস্তবায়ন তরান্বিত করে। লক্ষ্যণীয় যে, এ কাজটি সমাজের জন্য ইতিবাচক আবার নেতিবাচক ফলাফলও বয়ে আনতে পারে। যেমন, টিভিতে কোন নেতার ভাষণ দেখে তার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বা সমর্থন তৈরি হওয়া কিংবা কোন সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের চলচ্চিত্র দেখে সে ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে উদ্বুদ্ধ হওয়া ইত্যাদি।

২. সামাজিক-সাংস্কৃতিক দিক

ব্যক্তি প্রায় সব সময় একটা সামাজিক পরিসরে কাজ করে আর নিজে নিজের আচরণ কি হবে সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার বেলায় সে ঐ সামাজিক পরিসরের কথা বিবেচনা করে। এক্ষেত্রে সামাজিক পরিসরের বিভিন্ন ধরনের বার্তা বহন করে গণমাধ্যম। Prof. Melvin L. DeFleur and Sandra S. Ball Rokeach ব্যক্তির জীবনের উপর গণমাধ্যমের এ মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তার পাশাপাশি 'সমাজ-

[৫] DeFleur, Melvin and Frank R. Westie, "Verbal and Overt Acts", American Sociological Review 23, no 6, 1958, p. 673.

সাংস্কৃতিক মডেল' নামে একটি মডেল ব্যক্ত করেছেন। যেটিকে তাঁরা ব্যক্তির উপর গণমাধ্যমের প্রভাবের ক্ষেত্রে বেশি কার্যকর বলে উল্লেখ্য করেছেন। নিম্নে সমাজ-সাংস্কৃতিক মডেলটি দেখানো হলো:

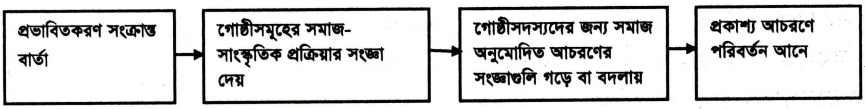

(উৎস: Melvin L. DeFleur and Sandra S. Ball-Rokeach (মূল), আফতাব হোসেন (অনুবাদ), গণযোগাযোগ তত্ত্বাবলী, বাংলা একাডেমী প্রকাশনা, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ.২৭৩।)

উপর্যুক্ত মডেলের মাধ্যমে লক্ষ্য করা যায় যে, গণমাধ্যমের জ্ঞাপিত বার্তাগুলো কতগুলো প্রপঞ্চের প্রেক্ষিতে ক্রিয়াকারক ব্যক্তিমানুষকে নতুন ও দৃশ্যত গোষ্ঠী সমর্থিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের কাজে ব্যবহৃত হয়। এমনিভাবে ব্যক্তির আচরণের মধ্যস্থতা সম্ভব কেননা ঐ ব্যক্তিদেরকে যেসব বার্তা প্রেরণ করা হয় সেগুলো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের আভাস হতে তারা উপযুক্ত আচরণ ও বিশ্বাসের সংজ্ঞা পেয়ে যান।[৬] যেমন, কোন মা তার শিশুকে পোলিও টিকা খাওয়াবে। এক্ষেত্রে 'টিকা' খাওয়াবে কি খাওয়াবে না, সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে সামাজিক সচেতনতা একটি অন্যতম বিষয়। এই সচেতনতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গণমাধ্যম অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। একজন মা শিশুকে টিকা খাওয়াতে হবে কী হবে না সে ব্যাপারে গণমাধ্যম হতে সচেতনতামূলক বার্তা পেয়ে থাকেন। যার মাধ্যমে তিনি তার শিশুর স্বাস্থ্যগত সমস্যা সমাধানে তৎপড় হন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, গণমাধ্যম ব্যক্তির সামাজিক-সাংস্কৃতিক মনস্তত্ত্ব গঠন এবং সে অনুসারে তার পারিপার্শ্বিকতা সৃষ্টি করতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। এরূপ ভূমিকা বা গণমাধ্যমের প্রভাব অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তির সামাজিক জীবনে ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনে আবার অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তি স্বার্থকে উন্মোচিত করে নেতিবাচকভাবে সমাজের ক্ষতিসাধনে ব্যবহৃত হয়। এপ্রেক্ষিতে গবেষণা এলাকা ধামরাই উপশহরের মানুষের সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনের অনুষঙ্গগুলোর উপর গণমাধ্যম কীভাবে প্রভাব বিস্তার করে তা গবেষণা এলাকার প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করার প্রয়াস চালানো হয়েছে।

৪.০: সামাজিক অসঙ্গতি দূরীকরণ ও সচেতনতা সৃষ্টিতে গণমাধ্যম: উপশহরীয় সমাজে গণমাধ্যমের ইতিবাচক প্রভাব

সমাজ জীবনের নানা অসঙ্গতি-কুসংস্কার তুলে ধরে গণমাধ্যম মানুষকে সচেতন করে তোলে। আর সচেতনতাবোধ থেকেই মানুষ তার জীবনকে কল্যাণময় করে গড়ে তোলার চেষ্টা করে। গণমাধ্যম বিশ্লেষকদের মতে, "প্রতিটি দেশের সংবাদমাধ্যম তার

[৬] আফতাব হোসেন (অনুবাদ), গণযোগাযোগ তত্ত্বাবলী, বাংলা একাডেমী প্রকাশনা, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ.২৭৩।

আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন কোন বিষয় নয়। প্রতিটি যুগের সংবাদমাধ্যম সেই যুগেরই সৃষ্টি এবং যুগকেই ধারণ করে। প্রতিটি প্রগতিশীল সংবাদপত্র তার যুগকে বদলে দেওয়ারও চেষ্টা করে। জাতির অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নির্মাণের অঙ্গিকার করে। যেমন, ইংরেজ আমলে দেশপ্রেমিক সংবাদপত্রগুলোর মূল লড়াই ছিল সামন্তবাদী সমাজকাঠামো ও ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে। পাকিস্তান আমলে ছিল অবাঙালিদের শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে জনগণের আবেগ অনুভূতি তুলে ধরা। স্বাধীনতার পরে আমাদের গণমাধ্যমের ঘাড়ে যে দায়িত্ব বর্তায় তাহলো, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, মানবাধিকার সমুন্নত রাখা, দেশ গঠন"।[৭] কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, দেশের গণমাধ্যমগুলো গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা, সমাজে মানুষের ন্যায় বিচার, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে সামাজিক অসঙ্গতি ও কুসংস্কার দূরীকরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। এসব সামাজিক অসংঙ্গতি ও কুসংস্কারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোসমাজে দুর্বলদের উপর অত্যাচার-নির্যাতন; ফতোয়া দ্বারা সমাজের ক্ষমতাকাঠামো হরণ; সামাজিক অন্যায়-অবিচার; শোষণ-বঞ্চনা তথা মানবাধিকার হরণ; দুর্নীতি, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, ছিনতাই, রাহাজানি; সামাজিক অপসংস্কৃতি, যৌতুক, নারীদের অধিকার বঞ্চনা, ইভটিজিং প্রভৃতি। এক্ষেত্রে প্রিন্টিং মিডিয়া বিভিন্ন ধরনের প্রতিবেদন, সম্পাদকীয়, কেস স্টাডির মাধ্যমে সচেনতা সৃষ্টি করে; আবার ইলেকট্রনিক মিডিয়া বিভিন্ন ধরনের সচেতনতামূলক নাটক, সিনেমা, চলচ্চিত্রের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে সচেতনতাবোধ সৃষ্টি করে। তবে লক্ষ্যণীয় যে, সব ধরনের সমাজকাঠামোতে একই ধরনের সামাজিক অসঙ্গতি ও কুসংস্কার বিরাজমান থাকেনা। একেক ধরনের সমাজ প্রেক্ষাপটে একেক ধরনের সামাজিক অসঙ্গতি বেশি লক্ষ করা যায় আবার কোনো কোনো সমাজে এই সমস্ত অভিশাপ অনেকটা হ্রাস পেয়েছে গণমাধ্যম, কর্তৃপক্ষ ও জনগণের যৌথ প্রচেষ্টায়। যার অন্যতম উদাহরণ জাপান, মালায়েশিয়া, সিঙ্গাপুরের মতো দেশগুলো। যাদের ধর্মীয় গোড়ামী, কুসংস্কারমুক্ত সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করেছে গণমাধ্যম। সামাজিক অসংঙ্গতি ও কুসংস্কার দূরীকরণের ক্ষেত্রে পরিবর্তনমুখী উপশহরীয় সমাজব্যবস্থায় গণমাধ্যমের প্রভাব ব্যাপকভাবে লক্ষণীয়। সঙ্গত কারণেই গবেষণা এলাকার সামাজিক সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি ও অসঙ্গতি দূরীকরণে গণমাধ্যমের ভূমিকা কতটা ইতিবাচক তা মাঠ গবেষণার প্রাপ্ত তথ্যের মাধ্যমে নিম্নে বিশ্লেষণ করা হলো।

শিক্ষার ধরন	সামাজিক অসঙ্গতি ও কুসংস্কার দূরীকরণে গণমাধ্যম			মোট ও শতকরা হার
	ইতিবাচক	নেতিবাচক	নিরুত্তর	
প্রাথমিক	৫০ (৮৪.৭৫)	৫ (৮.৪৭)	৪ (৬.৭৮)	৫৯ (১৯.০)*
মাধ্যমিক	১৪৯ (৯৫.৫২)	৭ (৪.৪৮)	০	১৫৬ (৫০.৩)
উচ্চ মাধ্যমিক	৩০ (৮৫.৭২)	০	৫ (১৪.২৮)	৩৫ (১১.৩)
স্নাতক	৪২ (৮০.৭৭)	২ (৩.৮৫)	৮ (১৫.৩৮)	৫২ (১৬.৮)
স্নাতকোত্তর	৮ (১০০)	০	০	৮ (২.৬)
মোট ও শতকরা হার	২৭৯ (৯০.০)	১৪ (৪.৫০)	১৭ (৫.৫০)	৩১০ (১০০)

(*দেয়া বন্ধনীযুক্ত সংখ্যা হলো শতকরা হার)

[৭] আবুল মকসুদ, সৈয়দ (সম্পাদকীয় কলাম), "রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম", দৈনিক প্রথম আলো, ১৬ আগস্ট, ২০১১।

উপর্যুক্ত সারণির মাধ্যমে লক্ষ করা যায় যে, সামাজিক বিভিন্ন অসঙ্গতি ও কুসংস্কার দূরীকরণে গণমাধ্যম ভূমিকা পালন করে কিনা (?), এমন প্রশ্নে মোট ৩১০ জন উত্তরদাতার মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিতদের ৫৯ জন উত্তরদাতার ৫০ জন (৮৪.৭৫%) এ বিষয়ে ইতিবাচক মতামত প্রকাশ করেছেন। এ বিষয়ে ৪ জন (৬.৭৮%) উত্তরদাতা নিরুত্তর থেকেছেন এবং ৫ জন (৮.৪৭%) উত্তরদাতা নেতিবাচক মতামত পোষণ করেছেন। মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষিতদের ১৫৬ জনের মধ্যে ১৪৯ জন (৯৫.৫২%) উত্তরদাতা সামাজিক অসংগতি ও কুসংস্কার দূরীকরণে গণমাধ্যম ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে বলে মত প্রকাশ করে। এক্ষেত্রে ৭ জন (৪.৪৮%) নেতিবাচক মতামত প্রকাশ করে। উল্লেখ্য যে, এ বিষয়ে কোন উত্তরদাতাই উত্তর প্রদানে নিরব থাকেনি। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের ৩৫ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৩০ জন (৮৫.৭২%) ইতিবাচক এবং ৫ জন (১৪.২৮%) নিরুত্তর থেকেছে। স্নাতক পর্যায়ের ৫২ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৪২ জন (৮০.৭৭%) সামাজিক অসঙ্গতি ও কুসংস্কার দূরীকরণে গণমাধ্যমের ভূমিকা ইতিবাচক বলে মত প্রকাশ করে, এক্ষেত্রে ২ জন (৩.৮৫%) নেতিবাচক এবং ৮ জন (১৫.৩৮%) উত্তরদাতা এ বিষয়ে নিরুত্তর থেকেছে। স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ৮ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৮ জন (১০০%)-ই গণমাধ্যমের এ ধরনের কার্যক্রম তাদের সমাজের জন্য ইতিবাচক বলে মতামত প্রকাশ করেন।

সুতরাং লক্ষ করা যায় যে, শিক্ষার ভিত্তিতে গবেষণা এলাকায় সামাজিক বিভিন্ন অসঙ্গতি ও কুসংস্কার দূরীকরণে গণমাধ্যমের কার্যক্রম তাকে সব শ্রেণীর শিক্ষিত মানুষই সমর্থন করে বা ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখে। যার অর্থ হলো সামাজিক বিভিন্ন অসঙ্গতি দূরীকরণে গণমাধ্যমের যে ভূমিকা ইতিবাচক।

সারণি-১.২: উত্তরদাতার শিক্ষার ভিত্তিতে গণমাধ্যমের সামাজিক সচেতনতামূলক সংবাদ পরিবেশনের মাত্রা (%)

শিক্ষার ধরন	গণমাধ্যমের সামাজিক সচেতনতামূলক সংবাদ পরিবেশনের মাত্রা			মোট ও শতকরা হার
	ইতিবাচক	নেতিবাচক	নিরুত্তর	
প্রাথমিক	৪২ (৭১.১৯)	১২ (২০.৩৪)	৫ (৮.৪৭)	৫৯ (১৯.০)*
মাধ্যমিক	১৩৩ (৮৫.২৬)	৯ (৫.৭৭)	১৪ (৮.৯৭)	১৫৬ (৫০.৩)
উচ্চ মাধ্যমিক	২৯ (৮২.৮৬)	১ (২.৮৫)	৫ (১৪.২৯)	৩৫ (১১.৩)
স্নাতক	৪৬ (৮৮.৪৭)	০	৬ (১১.৫৩)	৫২ (১৬.৮)
স্নাতকোত্তর	৮ (১০০)	০	০	৮ (২.৬)
মোট ও শতকরা হার	২৫৮ (৮৩.২৩)	২২ (৭.১০)	৩০ (৯.৬৭)	৩১০ (১০০)

(*দেয়া বন্ধনীযুক্ত সংখ্যা হলো শতকরা হার)

উপর্যুক্ত সারণির মাধ্যমে লক্ষ করা যায় যে, সামাজিক সচেতনতামূলক সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে, মোট ৩১০ জন উত্তরদাতার মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিতদের ৫৯ জন উত্তরদাতার ৪২ জন (৭১.১৯%) ইতিবাচক মতামত প্রকাশ করেছেন। এ বিষয়ে ৫ জন (৮.৪৭%) উত্তরদাতা নিরুত্তর থেকেছেন এবং ১২ জন (২০.৩৪%)

উত্তরদাতা এ বিষয়ে নেতিবাচক মতামত পোষণ করেছেন। মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষিতদের ১৫৬ জনের মধ্যে ১৩৩ জন (৮৫.২৬%) উত্তরদাতা মনে করেন যে, সামাজিক সচেতনতামূলক সংবাদ পরিবেশনে গণমাধ্যম ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। এক্ষেত্রে ৯ জন (৫.৭৭%) নেতিবাচক মতামত প্রকাশ করে এবং ১৪ জন (৮.৯৭%) উত্তরদাতা এ বিষয়ে কোন উত্তরদানে বিরত থেকেছেন। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের ৩৫ জন উত্তরদাতার মধ্যে ২৯ জন (৮২.৮৬%) ইতিবাচক এবং ১ জন (২.৮৫%) নেতিবাচক মতামত পোষণ করেছেন। স্নাতক পর্যায়ের ৫২ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৪৬ জন (৮৮.৪৭%) সামাজিক সচেতনতামূলক সংবাদ পরিবেশনে গণমাধ্যমের ভূমিকা ইতিবাচক বলে মত প্রকাশ করেন, এক্ষেত্রে ৬ জন (১১.৫৩%) উত্তরদাতা এ বিষয়ে মতামত পোষণে বিরত থেকেছে। স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ৮ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৮ জন (১০০%)-ই মনে করেন যে, সামাজিক সচেতনতামূলক সংবাদ পরিবেশনে গণমাধ্যম ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে।

সুতরাং দেখা যায় যে, উপশহরীয় এলাকার ৮০ শতাংশ মানুষই মনে করেন যে, গণমাধ্যম বর্তমান আধুনিক যুগে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির অন্যতম মূল শক্তি। আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির উত্তরাত্তোর বিকাশের ফলে সামাজিক যোগাযোগ বর্তমানে আরও সহজ থেকে সহজতর হচ্ছে। আর এ প্রেক্ষাপটে মানুষ কুসংস্কার, সামাজিক বিভিন্ন অসঙ্গতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে সমাজ কাঠামোকে নতুনত্ব দান করে চলছে।

৪.১: সামাজিক অসঙ্গতি দূরীকরণ ও সচেতনতা সৃষ্টিতে বিভিন্ন ধরনের গণমাধ্যমের সম্পৃক্ততার হার

সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি ও কুসংস্কার রোধে বিভিন্ন ধরনের গণমাধ্যমের কার্যক্রম বিভিন্ন। আবার সমাজের সব ধরনের মানুষ একই ধরনের গণমাধ্যম ব্যবহার করে না। এক্ষেত্রে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি ও কুসংস্কার রোধে বিভিন্ন ধরনের গণমাধ্যমের সামাজিক প্রভাবও বিভিন্ন। এক্ষেত্রে গণমাধ্যম সামাজিক জীবনে যেমন ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে তেমনি নেতিবাচক প্রভাবও বিস্তার করে। যেমন, সংবাদপত্রে অনেক সময়ই খুনের ঘটনা প্রথম পাতায় ছবিসহ বড় করে ছাপা হয়। যা মানুষের মনের ওপর বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করে। টেলিভিশনে কিংবা সংবাদ মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের অশালীন ছবি প্রদর্শন, বিজ্ঞাপন সামাজিকভাবে সচেতনতা বৃদ্ধির বিপরীতে মানুষকে বিশেষ করে যুব সমাজকে বিপদগামী করে তোলে। তথাপিও এ কথা সত্যি যে, গণমাধ্যম সামাজিক বিভিন্ন কুসংস্কার রোধে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকে। যেমন, ফতোয়া নিরোধ, এসিড সন্ত্রাসের বিপরীতে আইনী সচেতনতা, বাল্য-বিবাহ, বহু-বিবাহ প্রতিরোধে সচেতনতা, দুর্নীতি রোধে সামাজিক ঐক্যগত সচেতনতাবোধ সৃষ্টি প্রভৃতি। নিম্নে গবেষণা এলাকায়, কোন ধরনের গণমাধ্যম সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও কুসংস্কার রোধে মাত্রাগত দিক হতে কতটুকু কার্যকর ভূমিকা পালন করছে তা বিশ্লেষণের প্রয়াস চালানো হয়েছে।

সারণি-১.৩: উত্তরদাতার বয়সের ভিত্তিতে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও কুসংস্কার রোধে বিভিন্ন ধরনের গণমাধ্যমের সম্পৃক্ততার হার (%)

বয়স	সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও কুসংস্কার রোধে বিভিন্ন ধরনের গণমাধ্যমের সম্পৃক্ততা				মোট ও শতকরা হার
	সংবাদপত্র	টেলিভিশন	রেডিও	অন্যান্য	
+২০	২ (১০.০)	১৮ (৯০)	০ (০)	০	২০ (৬.৪৫)*
২০-৩০	১৩ (১৫.১২)	৬৯ (৮০.২৩)	৪ (৪.৬৫)	০	৮৬ (২৭.৭৪)
৩০-৪০	৪০ (৩৭.৭৪)	৬৩ (৫৯.৪৩)	১ (০.৯৪)	২ (১.৮৯)	১০৬ (৩৪.১৯)
৪০-৫০	২৪ (৩২.৪৩)	৪৮ (৬৪.৮৬)	২ (২.৭০)	০	৭৪ (২৩.৮৭)
৫০-৬০	৬ (২৮.৫৭)	১৫ (৭১.৪৩)	০	০	২১ (৬.৭৮)
৬০+	০	৩ (১০০)	০	০	৩ (০.৯৭)
মোট ও শতকরা হার	৮৫ (২৭.৪২)	২১৬ (৬৯.৬৭)	৭ (২.২৬)	২ (০.৬৫)	৩১০ (১০০)

(*দেয়া বন্ধনীযুক্ত সংখ্যা হলো শতকরা হার)

উপর্যুক্ত সারণির মাধ্যমে লক্ষ করা যায় যে, মোট ৩১০ জন উত্তরদাতার মধ্যে +২০ বছর বয়সী ২০ জনের মধ্যে ১৮ জন (৯০%) অভিমত পোষণ করে যে, বিভিন্ন ধরনের গণমাধ্যমের মধ্যে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও কুসংস্কার রোধে টেলিভিশনই সবচেয়ে বেশি প্রভাব সৃষ্টি করে, এদের মধ্যে মাত্র ২ জন (১০%) এ বিষয়ে সংবাদপত্রকে বেশি প্রভাব বিস্তারকারী মিডিয়া হিসেবে মন্তব্য করে। ২০-৩০ বছর বয়সের ৮৬ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৬৯ জন (৮০.২৩%) উত্তরদাতা টেলিভিশনকে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তারকারী গণমাধ্যম হিসেবে অভিহিত করে; এক্ষেত্রে ১৩ জন (১৫.১২%) সংবাদপত্র এবং ৪ জন (৪.৬৫%) রেডিওকে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও কুসংস্কার রোধে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তারকারী গণমাধ্যম বলে মন্তব্য করেছে। ৩০-৪০ বছর বয়সী ১০৬ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৬৩ জন (৫৯.৪৩%) উত্তরদাতা টেলিভিশনকে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তারকারী গণমাধ্যম হিসেবে অভিহিত করে; এক্ষেত্রে ৪০ জন (৩৭.৭৪%) সংবাদপত্র, ১ জন (০.৯৪%) রেডিও এবং ২ জন (১.৮৯%) অন্যান্য মিডিয়া হিসেবে চলচ্চিত্র, ইন্টারনেট (ফেইসবুক, টুইটার প্রভৃতি) কে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও কুসংস্কার রোধে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তারকারী গণমাধ্যম বলে মন্তব্য করেছে। ৪০-৫০ বছর বয়সের ৭৪ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৪৮ জন (৬৪.৮৬%) উত্তরদাতা টেলিভিশনকে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তারকারী গণমাধ্যম হিসেবে অভিহিত করে; এক্ষেত্রে ২৪ জন (৩২.৪৩%) সংবাদপত্র এবং ২ জন (২.৭০%) রেডিওকে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও কুসংস্কার রোধে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তারকারী গণমাধ্যম বলে মন্তব্য করেছে। ৫০-৬০ বছর বয়সের ২১ জন উত্তরদাতার মধ্যে ১৫ জন (৭১.৪৩%) উত্তরদাতা টেলিভিশনকে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তারকারী গণমাধ্যম হিসেবে অভিহিত করে; এক্ষেত্রে ৬ জন (২৮.৫৭%) সংবাদপত্রকে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও কুসংস্কার রোধে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তারকারী গণমাধ্যম বলে মন্তব্য করেন। ৬০+ বছর বয়সী মোট ৩ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৩ জন (১০০%)-ই সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও কুসংস্কার রোধে বিভিন্ন

ধরনের গণমাধ্যমের মধ্যে টেলিভিশনকে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা পালনকারী তথা প্রভাব বিস্তারকারী গণমাধ্যম হিসেবে অভিহিত করেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও কুসংস্কার রোধে বিভিন্ন ধরনের গণমাধ্যম সমাজে কাজ করলেও তাদের কাজের ক্ষেত্রে মানুষের ওপর মাত্রা এক নয়। এক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় যে, গবেষণা এলাকার অধিকাংশ মানুষই টেলিভিশনকে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও কুসংস্কার রোধের সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তারকারী গণমাধ্যম হিসেবে উল্লেখ্য করেছে। কেননা টেলিভিশনের ব্যবহার মাত্রা সমাজে যেমন বেশি, তেমনি সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক অনুষ্ঠান তথা কার্যও বেশি; যা প্রচার-প্রদর্শনের মাধ্যমে মানুষকে খুব সহজেই প্রভাবিত করতে পারে।

সারণি-১.৪: উত্তরদাতার শিক্ষার ভিত্তিতে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও কুসংস্কার রোধে বিভিন্ন ধরনের গণমাধ্যমের সম্পৃক্ততার হার (%)

শিক্ষার ধরন	সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও কুসংস্কার রোধে বিভিন্ন ধরনের গণমাধ্যমের সম্পৃক্ততা				মোট ও শতকরা হার
	সংবাদপত্র	টেলিভিশন	রেডিও	অন্যান্য	
প্রাথমিক	৬ (১০.১৭)	৪৯ (৮৩.০৫)	৪ (৬.৭৮)	০	৫৯ (১৯.০)*
মাধ্যমিক	৬৫ (৪১.৬৭)	৮৯ (৫৭.০৫)	২ (১.২৮)	০	১৫৬ (৫০.৩)
উচ্চ মাধ্যমিক	৫ (১৪.২৯)	২৫ (৭১.৪২)	৫ (১৪.২৯)	০	৩৫ (১১.৩)
স্নাতক	১১ (২১.১৫)	৩৯ (৭৫.০)	২ (৩.৮৫)	০	৫২ (১৬.৮)
স্নাতকোত্তর	২ (২৫.০)	৪ (৫০.০)	০	২ (২৫.০)	৮ (২.৬)
মোট ও শতকরা হার	৮৯ (২৮.৭১)	২০৬ (৬৬.৪৫)	১৩ (৪.১৯)	২ (০.৬৫)	৩১০ (১০০)

উপর্যুক্ত সারণির মাধ্যমে লক্ষ করা যায় যে, মোট ৩২০ জন উত্তরদাতার মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত ৫৯ জনের মধ্যে ৪৯ জন (৮৩.০৫%) অভিমত পোষণ করে যে, বিভিন্ন ধরনের গণমাধ্যমের মধ্যে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও কুসংস্কার রোধে টেলিভিশনই সবচেয়ে বেশি প্রভাব সৃষ্টি করে, এদের মধ্যে ৬ জন (১০.১৭%) এ বিষয়ে সংবাদপত্রকে এবং ৪ জন (৬.৭৮%) উত্তরদাতা রেডিওকে বেশি প্রভাব বিস্তারকারী মিডিয়া হিসেবে মন্তব্য করে। মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষিত ১৫৬ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৮৯ জন (৫৭.০৫%) উত্তরদাতা টেলিভিশনকে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তারকারী গণমাধ্যম হিসেবে অভিহিত করে; এক্ষেত্রে ৬৫ জন (৪১.৬৭%) সংবাদপত্র এবং ২ জন (১.২৮%) রেডিওকে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও কুসংস্কার রোধে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তারকারী গণমাধ্যম বলে মন্তব্য করেছে। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষিত ৩৫ জন উত্তরদাতার মধ্যে ২৫ জন (৭১.৪২%) উত্তরদাতা টেলিভিশনকে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তারকারী গণমাধ্যম হিসেবে অভিহিত করে; এক্ষেত্রে ৫ জন (১৪.২৯%) সংবাদপত্র, ৫ জন (১৪.২৯%) রেডিওকে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও কুসংস্কার রোধে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তারকারী গণমাধ্যম বলে মন্তব্য করেছে। স্নাতক পর্যায়ের ৫২ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৩৯ জন (৭৫%) উত্তরদাতা টেলিভিশনকে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তারকারী গণমাধ্যম হিসেবে অভিহিত করে; এক্ষেত্রে ১১ জন (২১.১৫%) সংবাদপত্র এবং ২ জন (৩.৮৫%)

রেডিওকে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও কুসংস্কার রোধে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তারকারী গণমাধ্যম বলে মন্তব্য করেছে। স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ৮ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৪ জন (৫০%) উত্তরদাতা টেলিভিশনকে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তারকারী গণমাধ্যম হিসেবে অভিহিত করে; এক্ষেত্রে ২ জন (২৫%) সংবাদপত্রকে এবং ২ জন (২৫%) অন্যান্য মিডিয়া হিসেবে চলচ্চিত্র, ইন্টারনেট (ফেসবুক, টুইটার প্রভৃতি) কে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও কুসংস্কার রোধে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তারকারী গণমাধ্যম বলে মন্তব্য করেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও কুসংস্কার রোধে বিভিন্ন ধরনের গণমাধ্যমের প্রভাব মাত্রা বিভিন্ন। লক্ষ্যণীয় যে, এক্ষেত্রে টেলিভিশনই সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তারকারী সামাজিক গণমাধ্যম। যা প্রায় ৬৭ শতাংশ মানুষের সামাজিক সচেতনতা ও কুসংস্কার বৃদ্ধিতে প্রভাবক হিসেবে কাজ করে এবং এক্ষেত্রে সংবাদপত্র প্রায় ২৯ শতাংশ ও রেডিও প্রায় ৫ শতাংশ।

৫.০: সামাজিক অসঙ্গতি দূরীকরণ ও সচেতনতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা: উপশহরীয় সমাজে গণমাধ্যমের নেতিবাচক প্রভাব

সামাজিক অসঙ্গতি দূরীকরণ ও সচেতনতা সৃষ্টিতে গণমাধ্যম যেমন মুখ্য ভূমিকা পালন করে তেমনি সমাজের অপরাধপ্রবণতা, সামাজিক বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টির জন্য এসব গণমাধ্যমই প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে। কেননা গণমাধ্যমের বিভিন্ন সংবাদ, অনৈতিক, অশ্লীল, নগ্ন চিত্র, উসকানিমূলক খবর সামাজিক সহনশীলতার বিপরীতে সামাজিক অসহিষ্ণুতা বৃদ্ধি করে। লক্ষ করলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের তথ্য পাবার অধিকার যেমন সীমিত তেমনি দেশের গণমাধ্যম ধনিক অভিমুখীন, শহর অভিমুখীন, এলিট ও পুরুষ অভিমুখীন; মিডিয়ার মালিকরা মূলত মুনাফা অর্জন, দ্রুত ব্যবসায়িক উন্নতি লাভ, রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল আর কর্পোরেট স্বার্থকে সামনে রেখেই মিডিয়া পরিচালনা করে, জনস্বার্থের বিষয়টি তাদের কাছে গৌণ।[৮] বাংলাদেশের মূলধারার কাগজে তৃণমূলের গরীব-প্রান্তিক মানুষদের প্রবেশাধিকার নেই বললেই চলে। প্রতিদিনের কাগজে বাংলার মুখ, সারা দেশ বা বিশাল বাংলার মতো বিশেষ পাতায় নিরস আর প্রাণহীনভাবে তাদেরকে উপস্থাপন করা হয়। এক সমীক্ষায় দেখা যায় যে, দেশের ৯৯ ভাগ নারীর সংগ্রামী আর বঞ্চিত জীবনে যেহেতু সেন্সেশন নেই, তাই তারা কাগজেও আসে না। মুনাফালোভী এক শ্রেণীর সংবাদপত্র এসিড ঝলসানো নারীর রঙিন ছবি ছাপিয়ে ব্যবসা করতে দ্বিধা করে না।[৯] এছাড়া আমাদের দেশে গণমাধ্যমের সাংবাদিক নির্যাতন, সাংবাদিকদের উপঢৌকন বা ঘুষ দিয়ে সংবাদকে প্রভাবিতকরণ, মালিক শ্রেণী কর্তৃক সাংবাদিকদের ওপর অত্যাচার প্রভৃতি কারণে গণমাধ্যমের অনৈতিক কার্যকলাপ যেমন উৎসারিত হয়, তেমনি এর প্রভাবে

---

[৮] ফেরদৌস, রোবায়েত, (প্রবন্ধ), "গণমাধ্যমের রাজনৈতিক অর্থনীতি ও তৃণমূল মানুষের তথ্য-অধিকার", বিশ্ব মুক্তগণমাধ্যম দিবস-২০০৭ এর সাময়িকী পত্র, ম্যাস-লাইন মিডিয়া সেন্টার (এমএমসি), ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ৩২।

[৯] ফেরদৌস, রোবায়েত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২।

সামাজিক অসংগতি বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশে সামাজিক অনৈতিকতার সাথে গণমাধ্যমের সম্পৃক্ততার যেসব কারণ রয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতাদের মিডিয়ার মালিক হওয়া ও রাজনৈতিক স্বার্থে মিডিয়ার ব্যবহার;

- পশ্চিমের মতো ব্যবসায়ীক স্বার্থে একই হাউস থেকে দৈনিক, সাপ্তাহিক আর টিভি চ্যানেল বের হওয়া;
- মিডিয়ার মালিকানা মাস্তান, দুর্নীতিবাজ, কালো টাকার মালিক আর দুষ্ট লোকদের হাতে চলে যাওয়া;
- সরকার নিজেদের স্বার্থে বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনকে যুক্তিহীনভাবে ব্যবহার করা।[১০]

উপর্যুক্ত এসব কারণে সামাজিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের অসঙ্গতি বৃদ্ধি পায়। কেননা মানুষ গণমাধ্যম; বিশেষ করে রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্রের খবরের মাধ্যমে বেশি প্রভাবিত হয়। উল্লেখ্য যে, ২৩ ডিসেম্বর, ২০১২ সালে ভারতের নয়া দিল্লীতে মেডিকেল কলেজ ছাত্রীকে চলন্ত বাসে জঘন্যভাবে যে ধর্ষণ করা হয়েছে, তার জন্য দেশটির সিনেমাকেই দায়ী করা হয়েছে। এ বিষয়ে বিশিষ্ট চলচ্চিত্র অভিনেতা নাসিরউদ্দিন শাহ বলেন যে, "সিনেমা হলো মানুষের মনকে প্রভাবিত করার অন্যতম মাধ্যম, আমাদের সিনেমায় যেভাবে ধর্ষণের চিত্র দেখানো হয় তাতে দুবৃত্তরা বাস্তবক্ষেত্রেও একইভাবে অনুপ্রাণিত হয়"।[১১] অতএব একথা সত্যি যে, গণমাধ্যম সামাজিক অসঙ্গতি রোধে যেমন সহায়ক ভূমিকা পালন করে তেমনি অসঙ্গতি বৃদ্ধিতেও এর প্রভাব স্পষ্ট। নিম্নে গবেষণা এলাকার সামাজিক অসঙ্গতি ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের প্রভাব আলোচনা করা হলো।

চিত্র-১.১: উত্তরদাতার শিক্ষার ভিত্তিতে গণমাধ্যমের নেতিবাচক প্রভাবে সমাজে বিভিন্ন ধরনের অসঙ্গতির মাত্রা (%)

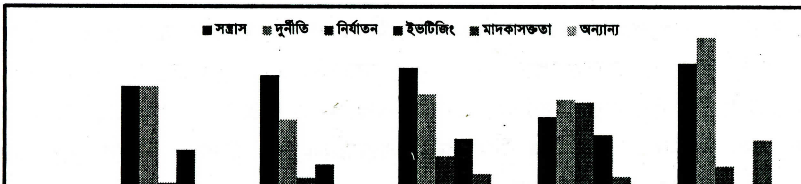

	প্রাথমিক	মাধ্যমিক	উচ্চ মাধ মিক	স্নাতক	স্নাতকোত্তর
সন্ত্রাস	৬৭.৮৬	৭৫.১৬	৮০	৪৮.০৭	৮৩.৩৩
দুর্নীতি	৬৭.৮৬	৪৬.৩	৬২.৮৫	৫৯.৬১	১০০
নির্যাতন	৫.৩৬	৮.৭২	২২.৮৫	৫৭.৬৯	১৬.৬৬
ইভটিজিং	২৬.৭৯	১৭.৪৪	৩৪.২৮	৩৬.৫৩	০
মাদকাসক্ততা	০	০.৬৭	১১.৪২	৯.৬১	৩৩.৩৩
অন্যান্য	০	২.০১	০	০	০

---

[১০] ফেরদৌস, রোবায়েত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২।

[১১] দৈনিক প্রথম আলো, ০১ জানুয়ারি, ২০১৩।

উপর্যুক্ত চিত্রের মাধ্যমে লক্ষ করা যায় যে, মোট ৩১০ জন উত্তরদাতার মধ্যে ২৯৮ জন উক্ত বিষয়ে মতামত প্রদান করেছে। এক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিতের ৫৬ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৩৮ জন (৬৭.৮৬%) মন্তব্য করে যে, গণমাধ্যমের প্রভাবে সমাজে সন্ত্রাস ও দুর্নীতি বৃদ্ধি পাচ্ছে, ২ জন (৫.৩৬%) মনে করে গণমাধ্যমের প্রভাবে সমাজ জীবনে নির্যাতনের মতো সামাজিক অসঙ্গতি বৃদ্ধি পাচ্ছে, ১৫ জন (২৬.৭৯%) মনে করে গণমাধ্যমের প্রভাবে সমাজে ইভটিজিং বৃদ্ধি পাচ্ছে। মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষিতদের ১৪৯ জন উত্তরদাতার মধ্যে ১১২ জন (৭৫.১৬%)-ই মন্তব্য করে যে, গণমাধ্যমের প্রভাবে সমাজে সন্ত্রাস বৃদ্ধি পাচ্ছে, ৬৯ জন (৪৬.৩%) মতামত প্রকাশ করে যে, গণমাধ্যমের প্রভাবে সমাজ জীবনে দুর্নীতি বৃদ্ধি পাচ্ছে, ১৩ জন (৮.৭২%) মনে করে গণমাধ্যমের প্রভাবে সমাজ জীবনে নির্যাতনের মতো সামাজিক অসঙ্গতি বৃদ্ধি পাচ্ছে, ২৬ জন (১৭.৪৪%) মনে করে গণমাধ্যমের প্রভাবে সমাজে ইভটিজিং বৃদ্ধি পাচ্ছে, ১ জন (০.৬৭%) উত্তরদাতা মত প্রকাশ করে যে, গণমাধ্যমের নেতিবাচক প্রভাবে সমাজের তরুণদের মধ্যে মাদকাসক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ৩ জন (২.০১%) মন্তব্য করে যে, গণমাধ্যমের প্রভাবে সমাজে এসব অসঙ্গতি ছাড়াও অন্যান্য যেমন-মানুষের মধ্যে কলহ-বিবাদ, উগ্রতা, সাম্প্রদায়িকতার মনোভাব প্রভৃতি বৃদ্ধি পাচ্ছে। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষিতদের ৩৫ জন উত্তরদাতার মধ্যে ২৮ জন (৮০%)-ই মন্তব্য করে যে, গণমাধ্যমের প্রভাবে সমাজে সন্ত্রাস বৃদ্ধি পাচ্ছে, ২২ জন (৬২.৮৫%) মতামত প্রকাশ করে যে, গণমাধ্যমের প্রভাবে সমাজ জীবনে দুর্নীতি বৃদ্ধি পাচ্ছে, ১২ জন (৩৪.২৮%) মনে করে গণমাধ্যমের প্রভাবে সমাজ জীবনে নির্যাতনের মতো সামাজিক অসঙ্গতি বৃদ্ধি পাচ্ছে, ৪ জন (১১.৪২%) মনে করে গণমাধ্যমের প্রভাবে সমাজে ইভটিজিং বৃদ্ধি পাচ্ছে, ১ জন (০.৬৭%) উত্তরদাতা মত প্রকাশ করে যে, গণমাধ্যমের নেতিবাচক প্রভাবে সমাজের তরুণদের মধ্যে মাদকাসক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষায় শিক্ষিতদের ৫২ জন উত্তরদাতার মধ্যে ২৫ জন (৪৮.০৭%)-ই মন্তব্য করে যে, গণমাধ্যমের প্রভাবে সমাজে সন্ত্রাস বৃদ্ধি পাচ্ছে, ৩১ জন (৫৯.৬১%) মতামত প্রকাশ করে যে, গণমাধ্যমের প্রভাবে সমাজ জীবনে দুর্নীতি বৃদ্ধি পাচ্ছে, ৩ জন (৫৭.৬৯%) মনে করে গণমাধ্যমের প্রভাবে সমাজ জীবনে নির্যাতনের মতো সামাজিক অসঙ্গতি বৃদ্ধি পাচ্ছে, ১৯ জন (৩৬.৫৩%) মনে করে গণমাধ্যমের প্রভাবে সমাজে ইভটিজিং বৃদ্ধি পাচ্ছে, ৫ জন (৯.৬১%) উত্তরদাতা মত প্রকাশ করে যে, গণমাধ্যমের নেতিবাচক প্রভাবে সমাজের তরুণদের মধ্যে মাদকাসক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষায় শিক্ষিতদের ৬ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৫ জন (৮৩.৩৩%)-ই মন্তব্য করে যে, গণমাধ্যমের প্রভাবে সমাজে সন্ত্রাস বৃদ্ধি পাচ্ছে, ৬ জন (১০০%) মতামত প্রকাশ করে যে, গণমাধ্যমের প্রভাবে সমাজ জীবনে দুর্নীতি বৃদ্ধি পাচ্ছে, ১ জন (১৬.৬৬%) মনে করে গণমাধ্যমের প্রভাবে সমাজ জীবনে নির্যাতনের মতো সামাজিক অসঙ্গতি বৃদ্ধি পাচ্ছে, ২ জন (৩৩.৩৩%) উত্তরদাতা মত প্রকাশ করে যে, গণমাধ্যমের নেতিবাচক প্রভাবে সমাজের তরুণদের মধ্যে মাদকাসক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সুতরাং লক্ষণীয় যে, গণমাধ্যম সমাজের বিভিন্ন ধরনের অসঙ্গতি রোধে যেমন ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম তেমনি এর নেতিবাচকতাও স্পষ্ট। কেননা টেলিভিশন, সংবাদপত্রের মতো গণমাধ্যমগুলোর বিভিন্নধর্মী অনুষ্ঠান সমাজের মানুষের মধ্যে যেমন সচেতনতা সৃষ্টি করে তেমনি সামাজিক মানুষের মূল্যবোধের অবক্ষয়ের জন্য দায়ী। কেননা সংবাদপত্রের এমন কিছু স্পর্শকাতর সংবাদ সামাজিক মানুষের মধ্যে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড কিংবা সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তি উন্মোচিত করে। আবার বাজার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বর্হিবিশ্বের দ্রব্যমূল্যে উর্ধ্বগতি দেখে আভ্যন্তরীণ বাজারেও ব্যবসায়ীরা মূল্য বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হয়ে ওঠে। একইভাবে টেলিভিশনের বিভিন্ন সংবাদ, অশালীন অনুষ্ঠান, বিজ্ঞাপনে নারীদের অশালীনভাবে উপস্থাপন বা সিনেমায় অশ্লীল ভাষা কিংবা সন্ত্রাসী কর্মকান্ড দেখে তরুণ সমাজের মধ্যে ব্যাপক নেতিবাচকতা সৃষ্টি হয়। যার ফলে উপশহরীয় অঞ্চলের মানুষের মধ্যে সচেতনতার বদলে অনৈতিক কার্যকলাপ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। অতএব এ কথা সত্যি যে, গণমাধ্যম শুধু সামাজিকভাবে ইতিবাচকই নয়, নেতিবাচক বিভিন্ন কার্যের জন্যও দায়ী।

৫.১: সামাজিক অসঙ্গতি বা অনৈতিক কার্যকলাপ বৃদ্ধিতে বিভিন্ন ধরনের গণমাধ্যমের সম্পৃক্ততা

অনেকেই মনে করেন যে, সমাজের সব ঘটনা বাছবিচার না মেনে, বিশ্লেষণহীনভাবে গণমাধ্যমে উপস্থাপন করা হলে এর সঙ্গে জড়িত অপরাধীকে সমাজ বিছিচন্ন করে আরো বেশি অপরাধ করতে বাধ্য করা হয়। কিন্তু যদি ঘটনার সঠিক কার্যকারণ উল্লেখ করে সংবাদ প্রচার করা হয় তাহলে এ বির্তক থাকে না। এক্ষেত্রে সব গণমাধ্যমে সামাজিক দায়িত্ববোধের সঠিক লালন করা হয় কি না, এ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বিশেষ করে, সামাজিক ক্ষমতা অর্জনের শক্তিশালী ও নিরাপদ একটি মাধ্যম হচ্ছে গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠা করা। আর এ কারণে অনেক কালো টাকার মালিক, সামাজিক দুর্বৃত্ত ও লুটেরা বণিক শ্রেণী তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতার ভিত্তি শক্তিশালী করতে নানাভাবে গণমাধ্যমের মালিকানায় প্রবেশ করেছে প্রভাবশালীরূপে। অন্যদিকে নারী নির্যাতনের ঘটনাগুলোতে যেভাবে নারীকে উপস্থাপন করা হয়, তার ফলে অধিকাংশ সময় ঘটনার শিকার হতভাগিনী নারীটির সমাজবিচ্ছিন্নতা বৃদ্ধি পেলে তার অবস্থা করুণতর হয়ে ওঠে। তেমনি বেকারত্ব, হত্যা, খুন-জখম, কোন্দল, মারামারি, প্রভৃতি চিত্র সমাজে মানুষের মধ্যে হতাশা যেমন বৃদ্ধি করে তেমনি সামাজিক মানুষের আচরণকে পরিবর্তন করে ফেলে। যার ফলে সামাজিক অসঙ্গতি হ্রাসের বিপরীতে সামাজিক অসঙ্গতি বা অনৈতিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনাই তীব্র হয়। এ প্রেক্ষাপটে নিম্নে গবেষণা এলাকায় বিভিন্ন সামাজিক অসঙ্গতি বা অনৈতিক কার্যকলাপ বৃদ্ধিতে কোন ধরনের গণমাধ্যম কতটুকু দায়ী (?) এ প্রশ্নের ভিত্তিতে উত্তরদাতাদের মতামত বিশ্লেষণ করার প্রয়াস চালানো হয়েছে।

চিত্র-১.২: উত্তরদাতার শিক্ষার ভিত্তিতে সামাজিক অসঙ্গতি বা অনৈতিক কার্যকলাপ বৃদ্ধিতে বিভিন্ন ধরনের গণমাধ্যমের সম্পৃক্ততা (%)

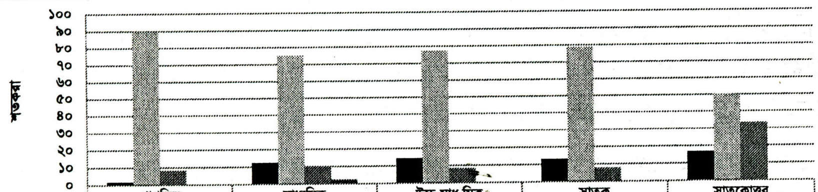

	প্রাথমিক	মাধ্যমিক	উচ্চ মাধ মিক	স্নাতক	স্নাতকোত্তর
সংবাদপত্র	১.৬৯	১২.৫	১৪.২৮	১৩.১৫	১৬.৬৬
টেলিভিশন	৮৯.৬৯	৭৫	৭৭.১৪	৭৮.৯১	৫০
রেডিও	৮.৪৮	১০.১৫	৮.৫৭	৭.৮৯	৩৩.৩৩
অন্যান্য	০	২.৩৪	০	০	০

উপর্যুক্ত চিত্রের মাধ্যমে লক্ষ করা যায় যে, মোট ৩১০ জন উত্তরদাতার মধ্যে ২৬৬ জন উক্ত বিষয়ে মতামত প্রদান করেছে। এক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিতের ৫৯ জন উত্তরদাতার মধ্যে ১ জন (১.৬৯%) মন্তব্য করে যে, বিভিন্ন ধরনের সামাজিক অসঙ্গতি বা অনৈতিক কার্যকলাপ বৃদ্ধিতে বিভিন্ন ধরনের গণমাধ্যমের মধ্যে সংবাদপত্রই সবচেয়ে বেশি নেতিবাচক ভূমিকা পালন করে, ৫৩ জন (৮৯.৮৩%) সামাজিক বিভিন্ন ধরনের অসঙ্গতি বৃদ্ধিতে টেলিভিশনকে বেশি দায়ী বলে মত প্রকাশ করে, ৫ জন (৮.৪৭%) মতামত প্রকাশ করে যে, এক্ষেত্রে রেডিও সবচেয়ে বেশি দায়ী। মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষিতদের ১২৮ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৯৬ জন (৭৫%) বিভিন্ন ধরনের সামাজিক অসঙ্গতি বা অনৈতিক কার্যকলাপ বৃদ্ধিতে বিভিন্ন ধরনের গণমাধ্যমের মধ্যে টেলিভিশনকেই সবচেয়ে বেশি দায়ী বলে মন্তব্য করে, ১৬ জন (১২.৫%) সামাজিক বিভিন্ন ধরনের অসঙ্গতি বৃদ্ধিতে সংবাদপত্র বেশি দায়ী বলে মত প্রকাশ করে, ১৩ জন (১০.১৫%) মতামত প্রকাশ করে যে, এক্ষেত্রে রেডিও সবচেয়ে বেশি দায়ী এবং ৩ জন (২.৩৪%) অন্যান্য বিভিন্ন গণমাধ্যমকে এক্ষেত্রে দায়ী বলে মন্তব্য করে। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষিতদের ৩৫ জন উত্তরদাতার মধ্যে ২৭ জন (৭৭.১৪%) বিভিন্ন ধরনের সামাজিক অসঙ্গতি বা অনৈতিক কার্যকলাপ বৃদ্ধিতে বিভিন্ন ধরনের গণমাধ্যমের মধ্যে টেলিভিশনকেই সবচেয়ে বেশি দায়ী বলে মন্তব্য করে, ৫ জন (১৪.২৮%) সামাজিক বিভিন্ন ধরনের অসঙ্গতি বৃদ্ধিতে সংবাদপত্র বেশি দায়ী বলে মত প্রকাশ করে, ৩ জন (৮.৫৭%) মতামত প্রকাশ করে যে, এক্ষেত্রে রেডিও সবচেয়ে বেশি দায়ী। স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষায় শিক্ষিতদের ৩৮ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৩০ জন (৭৯%) বিভিন্ন ধরনের সামাজিক অসঙ্গতি বা অনৈতিক কার্যকলাপ বৃদ্ধিতে বিভিন্ন ধরনের গণমাধ্যমের মধ্যে টেলিভিশনকেই সবচেয়ে বেশি দায়ী বলে মন্তব্য করে, ৫ জন (১৩.১৫%) সামাজিক বিভিন্ন ধরনের অসঙ্গতি বৃদ্ধিতে সংবাদপত্র বেশি দায়ী বলে মত প্রকাশ করে, ৩ জন (৭.৮৯%) মতামত প্রকাশ করে

যে, এক্ষেত্রে রেডিও সবচেয়ে বেশি দায়ী। স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষায় শিক্ষিতদের ৬ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৩ জন (৫০%) বিভিন্ন ধরনের সামাজিক অসঙ্গতি বা অনৈতিক কার্যকলাপ বৃদ্ধিতে বিভিন্ন ধরনের গণমাধ্যমের মধ্যে টেলিভিশনই সবচেয়ে বেশি দায়ী বলে মন্তব্য করে, ১ জন (১৬.৬৬%) সামাজিক বিভিন্ন ধরনের অসঙ্গতি বৃদ্ধিতে সংবাদপত্র বেশি দায়ী বলে মত প্রকাশ করে, ২ জন (৩৩.৩৩%) মতামত প্রকাশ করে যে, এক্ষেত্রে রেডিও সবচেয়ে বেশি দায়ী।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সমাজের অসঙ্গতি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের গণমাধ্যমের মধ্যে টেলিভিশনই বেশি দায়ী। কেননা বর্তমান প্রেক্ষাপটে টেলিভিশনের মাধ্যমে পাশ্চাত্যের নগ্ন সংস্কৃতি প্রাচ্যের দেশগুলোতে ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়ছে, যে কারণে সমাজে বিভিন্ন ধরনের অসঙ্গতিপূর্ণ কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সারণি- ১.৫: সামাজিক অসঙ্গতি বা অনৈতিক কার্যকলাপ বৃদ্ধিতে বিভিন্ন ধরনের গণমাধ্যমের সম্পৃক্ততার হার (উত্তরদাতার লৈঙ্গীক ভিত্তিতে)

ধরন	সামাজিক অসঙ্গতি বা অনৈতিক কার্যকলাপ বৃদ্ধিতে বিভিন্ন ধরনের গণমাধ্যমের সম্পৃক্ততা				মোট ও শতকরা হার
	সংবাদপত্র	টেলিভিশন	রেডিও	অন্যান্য	
পুরুষ	১৮ (৯.০৯)	১৫৭ (৭৯.২৯)	২০ (১০.১০)	৩ (১.৫২)	১৯৮ (৭৪.৪৪)*
নারী	৫ (৭.৩৫)	৫৪ (৭৯.৪১)	৯ (১৩.২৪)	০	৬৮ (২৫.৫৬)
মোট	২৩ (৮.৬৫)	২১১ (৭৯.৩২)	২৯ (১০.৯)	৩ (১.১৩)	২৬৬ (১০০)

উপর্যুক্ত সারণির মাধ্যমে লক্ষ করা যায় যে, মোট ৩১০ জন উত্তরদাতার মধ্যে ২৬৬ জন উক্ত বিষয়ে মতামত প্রদান করেছে। যেক্ষেত্রে ১৯৮ জন পুরুষের মধ্যে ১৫৭ জন (৭৯.২৯%) উত্তরদাতা সামাজিক অসঙ্গতি বৃদ্ধিতে টেলিভিশনকে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তারকারী গণমাধ্যম হিসেবে অভিহিত করে; এক্ষেত্রে ১৮ জন (৯.০৯%) সংবাদপত্র এবং ২০ জন (১০.১০%) রেডিওকে সামাজিক সামাজিক অসঙ্গতি বা অনৈতিক কার্যকলাপ বৃদ্ধিতে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তারকারী গণমাধ্যম বলে মন্তব্য করেছে। নারী উত্তরদাতার ৬৮ জনের মধ্যে ৫৪ জন (৭৯.৪১%) টেলিভিশনকে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তারকারী গণমাধ্যম হিসেবে অভিহিত করে; এক্ষেত্রে ৫ জন (৭.৩৫%) সংবাদপত্রকে এবং ৯ জন (১৩.২৪%) সামাজিক সামাজিক অসঙ্গতি বা অনৈতিক কার্যকলাপ বৃদ্ধিতে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তারকারী গণমাধ্যম বলে মন্তব্য করেছে। সুতরাং দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে বেশি সংখ্যকই টেলিভিশনকে সামাজিক অসঙ্গতি বা অনৈতিক কার্যকলাপ বৃদ্ধিতে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তারকারী গণমাধ্যম বলে স্বীকার করেছে। এ প্রেক্ষাপটে প্রতীয়মান হয় যে, উপশহরীয় সমাজে, যেসব সামাজিক অসঙ্গতি, অনৈতিক কার্যকলাপ ঘটে তার অন্যতম মূল প্রভাবক হিসেবে যেসব অনুষঙ্গ কাজ করে তার মধ্যে টেলিভিশন সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তারকারী গণমাধ্যম।

৬.০: প্রাপ্ত ফলাফল ও সুপারিশমালা

গবেষণার আলোকে দেখা যায় যে, সামাজিক অসঙ্গতি দূরীকরণ ও সচেতনতা সৃষ্টিতে, উপশহরীয় অঞ্চলে টেলিভিশন, সংবাদপত্র ও রেডিও ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে। যদিও এক্ষেত্রে রেডিও'র ব্যবহার দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের প্রভাব ইতিবাচক ফলাফল প্রদান করে। কেননা প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায় যে, ৮৫% উত্তরদাতাই সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টিতে বিভিন্ন ধরনের গণমাধ্যমের কার্যক্রমকে ইতিবাচকভাবে দেখছেন। একইভাবে সামাজিক সচেতনতা ও কুসংস্কার রোধে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গণমাধ্যম ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করছে। এক্ষেত্রে ইতিবাচকভাবে টেলিভেশন ৭০%, সংবাদপত্র ২০%, রেডিও ২% প্রভাব বিস্তারে সক্ষম। গবেষণা প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে লক্ষ্য করা যায় যে, সামাজিক বিভিন্ন অসঙ্গতি বৃদ্ধিতে গণমাধ্যম ইতিবাচকতার চেয়ে নেতিবাচক প্রভাব মাত্রাই বেশি। এক্ষেত্রে সন্ত্রাস বৃদ্ধিতে টেলিভিশন ৬৩%, দুর্নীতি বৃদ্ধিতে ৬০%, ইভটিজিং বৃদ্ধিতে ২১%, মাদকাসক্ততা বৃদ্ধিতে ৬৪% এবং নির্যাতন বৃদ্ধিতে ১০% দায়ী। তবে উল্লেখ্য যে, টেলিভিশন কিংবা সংবাদপত্র এ ক্ষেত্রে সচেতনতা সৃষ্টিতেও ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু পর্যবেক্ষণীয় তথ্য মতে, পরিবর্তনশীল উপশহরীয় সমাজে প্রতিক্রিয়াশীল তরুণরা স্যাটেলাইট টেলিভিশনের অবাধ ব্যবহারের প্রেক্ষিতে সামাজিক অসঙ্গতির দিকে বেশি ঝুঁকে পড়ছে এবং এরই ফলশ্রুতিতে সন্ত্রাস, দুর্নীতি, নির্যাতন, উগ্রতা, ইভটিজিং প্রভৃতি সামাজিক অসংগতি বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক্ষেত্রে টেলিভিশনের বিদেশী বিভিন্ন চ্যানেল, সংবাদপত্রের বিভিন্ন বিজ্ঞাপণ, রেডিওর উগ্রতাপূর্ণ সংবাদ মানুষের মানসিকতাকে নেতিবাচক দিকে প্রভাবিত করে। এক্ষেত্রে উপশহরীয় এলাকায় গণমাধ্যমকে আরও ইতিবাচক করার জন্য যেসব কাজ করা প্রয়োজন; সে সম্পর্কে কতিপয় সুপারিশ নিম্নে উপস্থাপন করছি-

১. কমিউনিটি রেডিও, শিক্ষামূলক টিভি চ্যানেলের প্রসার ও জনগণের মালিকানা প্রতিষ্ঠা: কমিউনিটি রেডিও ও শিক্ষামূলক টিভি চ্যানেলের ব্যাপক প্রসার ঘটানো বা পাবলিক ব্রডকাস্ট চ্যানেলকে আরো উদার ও মুক্ত করা প্রয়োজন। কেননা কমিউনিটি রেডিও, শিক্ষামূলক টিভি চ্যানেলগুলো স্থানীয় পর্যায়ে মানুষের সমস্যা সমাধানে শিক্ষামূলক ও সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান প্রচার করতে পারে সহজেই। তবে সবচেয়ে বড় কথা হলো এসব গণমাধ্যমের ওপর জনগণের মালিকানা প্রতিষ্ঠা করতে হবে- কেবল উপস্থিতি বা অনুষ্ঠান নির্মাণই বড় কথা নয়।

২. তথ্যের অবাধ স্বাধীনতা এবং তথ্যকে সঠিকভাবে গণমাধ্যমে উপস্থাপন: গবেষণার প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের গণমাধ্যমের তথ্য প্রাপ্তি যেমন স্বাধীন নয়, তেমনি তথ্য উপস্থাপনের ক্ষেত্রেও রয়েছে সরকারি ও কর্পোরেট সীমাবদ্ধতা। যা সামাজিক মূল্যবোধকে সুচারুরূপে উপস্থাপন করে না কিংবা সামাজিক কাঠামোতে ইতিবাচক সাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে

প্রতিবন্ধক। এজন্য তথ্যের অবাধ স্বাধীনতা ও তথ্যের সঠিক উপস্থাপন করা অত্যন্ত জরুরী। এজন্য তথ্য অধিকার আইনের সঠিক বাস্তবায়ন জরুরী।

৩. জনগণের জনমতের প্রাধান্য: অনেক ক্ষেত্রেই স্পষ্ট যে, গণমাধ্যমে জনগণের মতামতের প্রাদান্য দেয়া হয় খুব কম। সাধারণ জনগণের মতামতের প্রাধান্য না থাকলে জনগণের মধ্যে হতাশা, ক্ষোভ তীব্র হয়। যাতে করে সামাজিক সমস্যা আরও বৃদ্ধি পায়। কাজেই গণমাধ্যমগুলো হতে হবে জনমত প্রতিফলনের প্রতীক।

৪. রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত গণমাধ্যম: বাংলাদেশের গণমাধ্যমগুলো বেশিরভাগই রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য ব্যবহৃত হয়। লক্ষণীয় যে, ২০১১ সালে কমিউনিটি রেডিও ব্যবস্থা চালু হলেও তা অনেক ক্ষেত্রে এলাকার এমপি কিংবা রাজনৈতিক প্রভাবশালী ব্যক্তিদের আনুকূল্য স্টেশনে পরিণত হয়েছে। এখানে জনগণের বাক্ স্বাধীনতার বিকাশ যেমন হচ্ছে না, তেমনি ওইসব প্রভাবশালীদের স্বার্থ রক্ষার্থে রেডিও'র শিক্ষামূলক কর্মকান্ড বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। যা গণমাধ্যমের অবাধ তথ্য প্রবাহে বাধার সৃষ্টি করে। এজন্য রেডিও, টেলিভিশনগুলোর স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করা জরুরী।

৫. সেন্সর ব্যবস্থার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ: মানুষের মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটায়, অনৈতিক কার্যকলাপকে উগড়ে দেয়, বিশৃঙ্খল ইস্যু তৈরি করে সমাজকে অস্থিতিশীল করে তোলে, গণমাধ্যমের এমনসব সংবাদ ও অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে সেন্সর ব্যবস্থার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। যাতে করে সমাজের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত হয়।

৬. সংবেদনশীলতা: সংবাদপত্রের অশালীন বিজ্ঞাপন, অরুচিপূর্ণ সংবাদ, টেলিভিশনের বিভিন্ন সংবাদ, অশালীন অনুষ্ঠান, বিজ্ঞাপনে নারীদের অশালীনভাবে উপস্থাপন বা সিনেমায় অশালীন ভাষা শুনে কিংবা সন্ত্রাসী কর্মকান্ড দেখে তরুণ সমাজের মধ্যে ব্যাপক নেতিবাচকতা সৃষ্টি হয়। যার ফলে মানুষের মধ্যে সচেতনতার বদলে অনৈতিক কার্যকলাপ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এজন্য গণমাধ্যমগুলোর সংবাদ, অনুষ্ঠান প্রচারের ক্ষেত্রে সংবেদনশীলতা একান্ত প্রয়োজন।

৭. দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহিতা: সামাজিক অসঙ্গতি দূরীকরণ ও সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টিতে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন গণমাধ্যমের দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহিতামূলক আচরণ। কেননা গণমাধ্যমই জাতীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতিকে মানুষের কাছে তুলে ধরে এবং মানুষ এর মাধ্যমে তার মূল্যবোধ গঠন করে। এক্ষেত্রে গণমাধ্যম যদি উগ্রতা, অসহিষ্ণুতা, অনৈতিক কার্যকলাপ, হিংসাত্মক সংবাদ, অনুষ্ঠান প্রচার করে তবে সমাজে মানুষের আচরণের মধ্যেও তারই

বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এজন্য গণমাধ্যমের প্রচারণার ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল ও জবাবদিহি আচরণ করা উচিত।

এছাড়াও, উপশহরীয় সমাজে স্যাটেলাইট টেলিশিনের অপসংস্কৃতি উগড়ে দেয় এমন চ্যানেলসমূহকে চিহ্নিত করে তা বন্ধের ব্যবস্থা করা; মিডিয়াকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার হতে বিরত রাখা; তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন করা; কর্পোরেট মিডিয়ার এলিট স্বার্থ থেকে মিডিয়াকে মুক্তি দানের মাধ্যমে গণমাধ্যমকে জনগণের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া তথা জনবান্ধব করে গড়ে তোলা সম্ভব। আর জনবান্ধব মিডিয়াই পারে সামাজিক অসঙ্গতি দূর করে, সামাজিক সচেতন মানুষ গড়ে তুলতে।

৭.০: উপসংহার

গণমাধ্যম সামাজিক মানুষের মূল্যবোধ, আচার-আচরণ, বিশ্বাসকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। এটা মানুষকে ইতিবাচকভাবে যেমন প্রভাবিত করে তেমনি নেতিবাচকভাবেও। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে উপর্যুক্ত আলোচনার মাধ্যমে দেখা যায় যে, গণমাধ্যম মানুষের মনস্তত্ত্বকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। কেননা মানুষ সর্বত্রই অনুকরণ প্রিয়। বিভিন্ন গণমাধ্যমে দেখে, শুনে কিংবা পড়ে মানুষ চরিত্র অনুসারে অনুকরণ করে থাকে। আবার একটি সমাজের রুচি, আচার-আচরণ প্রভৃতির পরিবর্তনও সাধিত হয় গণমাধ্যমের প্রভাবে। এজন্যই গণমাধ্যম যদি ইতিবাচকভাবে কোনো বিষয়বস্তু উপস্থাপন করে তবে সমাজে মানুষের প্রতিক্রিয়া হয় ইতিবাচক; আর নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করলে তার প্রতিক্রিয়া হয় নেতিবাচক। 'এজেন্ডা সেটিং' তত্ত্ব মতে গবেষকরা বলেন যে, "কোনো শহরের নিয়মিত খুন হলেও সে খবর যদি গণমাধ্যমে না আসে, তবে খুনের ঘটনা জনগণকে খুব বেশি আলোড়িত করে না। অথচ কোনো নির্দিষ্ট খুনের ঘটনা নিয়ে গণমাধ্যম কয়েকদিন প্রতিবেদন প্রকাশ করলে তা জনগণের আলোচনার বিষয়বস্তু তথা পাবলিক এজেন্ডায় পরিণত হয়"। অর্থাৎ গণমাধ্যমের ভূমিকার ওপরই সমাজে মানুষের সামাজিক সচেতনতাবোধ, নৈতিকতাবোধ-মূল্যবোধ গড়ে ওঠে। গণমাধ্যমের ইতিবাচক ব্যবহার ও মাধ্যমগুলোর অনুষ্ঠান প্রচারে ইতিবাচক ভূমিকাই পারে সামাজিক ইতিবাচক পরিবর্তন সাধন করতে। কাজেই সামাজিক অসঙ্গতি দূরীরণ ও সচেতনতাবোধ সৃষ্টি করার জন্য গণমাধ্যমে ভূমিকা ইতিবাচক হওয়া একান্তভাবেই প্রয়োজন।

তথ্যসূত্র

Almond, Gabriel A. and Powell, G. Bingham, Comparative Politics Today: A war Views, Little Brown and Company, New York, 1940.

Campbell and Martin, Media and Culture: An Introduction to Mass Communication, Bedford/St. Martin's, Boston, 2000.

Cooley, Charles, Social Organizations, Scribner's, New York, 1909.

Daswan. Richard E. & Prewit, Kenneth, Political Socialization, Little Brown (Fourth Printing), 1969.

DeFleur, Melvin L. and Frank R. Westie, "Verbal and Overt Acts", American Sociological Review 23, no 6, 1958, p. 673.

DeFleur, Melvin L. and Ball-Rokeach, Sandra S., 'Theories of Mass Communication', AvdZve ‡nv‡mb (Abyev`), MY‡hvMv‡hvM ZË¡vejx, evsjv GKv‡Wgx cÖKvkbv, XvKv, 1993.

Larsen, Otto N., "Social Effects of Mass Communication," in Handbook of Modern Sociology, Fairs, Robert E. L., (edited), Rand McNally, Chicago, 1954.

Rusk, David, Cities without Suburbs, ISBN 0-943875-73-0, Wikipedia, the free encyclopedia, dated 30 July, 2012.

Rockeach, Milton, The Nature of Human Values, Free Press, New York, 1973.

Wilson, J. and Wilson S., Mass Media/Mass Culture : An Introduction, New York, McGrow Hill,1998,p.13

আবুল মকসুদ, সৈয়দ (সম্পাদকীয় কলাম), "রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম", দৈনিক প্রথম আলো, ১৬ আগস্ট, ২০১১।

আহমেদ, মুসতাক (সম্পাদিত), গণমাধ্যমের রাজনৈতিক অর্থনীতি: নয়া তথ্যযুগে পুঁজিবাদ আর গণতন্ত্র, এ এইচ ডেভেলপমেন্ট পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা, ২০০৭, পৃ-১৭৪।

ফেরদৌস, রোবায়েত, (প্রবন্ধ), "গণমাধ্যমের রাজনৈতিক অর্থনীতি ও তৃণমূল মানুষের তথ্য-অধিকার", বিশ্ব মুক্তগণমাধ্যম দিবস-২০০৭ এর সাময়িকী পত্র, ম্যাস-লাইন মিডিয়া সেন্টার (এমএমসি), ঢাকা, ২০০৭।

যাকারিয়া, মুহাম্মদ (প্রবন্ধ), "ধর্ষণ ও গণমাধ্যমের 'এজেন্ডা সেটিং' তত্ত্ব", দৈনিক ইত্তেফাক, ৩১ জানুয়ারি, ২০১৩।

হোসেন, আফতাব (অনুবাদ), গণযোগাযোগ তত্ত্বাবলী, বাংলা একাডেমী প্রকাশনা, ঢাকা, ১৯৯৩।

দৈনিক প্রথম আলো, ০১ জানুয়ারি, ২০১৩।

ISSN 1605 - 7023

বাংলাদেশ লোক্-প্রশাসন পত্রিকা
পঞ্চদশ বর্ষ সংখ্যা
১৪২২ বঙ্গাব্দ/২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

পোশাক কারখানায় লিঙ্গীয় শ্রম বিভাজনঃ একটি নৃবৈজ্ঞানিক পর্যালোচনা

মোঃ ফজল হক*
মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসাইন**

Abstract: *'self' seeks to describe essential qualities that constitute a person's uniqueness or essential being. There have been various approaches to defining these qualities. The self can be considered that being which is the source of consciousness, the agent responsible for an individual's thoughts and actions, or the substantial nature of a person which endures and unifies consciousness over time. Gender, the social and cultural constrution of sex deseribe the essential qualities that constitute persons social and cultural role in a society. Masculinity and Feminity are the feature of gender in our society. In general Masculinity represents the social role of a man and Feminity represents the social role of a woman in our society. But these types of self are not static with regard to Masculinity to man and Feminity to woman. It is changeable or it appears in adversely. That means a woman may own the criteria of masculinity and a man may own the criteria of feminity. The object of the study is to justify or investigate the appearance of self in different context like division of labour among the garments workers. This article is intend to present the construction of self among the garments workers in Dhaka city and it may be a little endeavour to challenge the traditional concept of Masculinity and Feminity.*

ভূমিকা

পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নির্মিত লিঙ্গ বৈষম্যের গঁৎবাধা ধারণায় নারীর আদর্শ লক্ষণ ও পুরুষের আদর্শ লক্ষণ অনুসারে কৃত্রিমভাবে নির্মিত ও বাধ্যতামূলক পারস্পরিক বৈপরীত্যের ভিত্তিতে নারীত্ব ও পৌরুষের ধারণা নির্মাণ করা হয়। নারী ও পুরুষের জৈবিক বৈপরীত্যের স্বাভাবিক মাত্রা ছাড়িয়ে সামাজিক সাংস্কৃতিক লিঙ্গ ছক নারীত্ব ও পৌরুষের বাধ্যতামূলক বৈপরীত্যের বহুমাত্রিক ধারণা তৈরি করে এবং ক্রমশ এই ধারণার ভিত্তিতে নারীত্বকে পৌরুষের অধীন, অধঃস্তন, নির্ভরশীল ব্যক্তিত্বের ধারণা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। সামাজিকীকরণের মাধ্যমে কন্যাকে নারীত্বের ছকের এবং পুত্রকে পৌরুষের ছকের উপযুক্ত করে তোলার প্রক্রিয়া চলে- প্রবাদ, ধর্মীয় প্রথা, লোকগাথা, ঘুমপাড়ানি গান, ছড়া, পোশাক পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার, আইন, শিল্প সাহিত্য, শ্রমের ক্ষেত্রে, সিনেমা বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে। লিঙ্গীয়

---

* মুক্ত গবেষক
** গবেষণা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা- ১৩৪৩

সামাজিকীকরণ নিয়ে Ken Browne (1998) তার An Introduction to Sociology গ্রন্থে লিখেছেন- 'লিঙ্গীয় ভূমিকার সামাজিকীকরণ' সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার একটি উৎপাদ। যেখানে লিঙ্গীয় স্তর বিন্যাসের চিত্র প্রায় সকল সমাজেই দৃশ্যমান। যার সাধারণ রূপটি প্রকাশ পায় সমাজে নারীর চেয়ে পুরুষের অনেক বেশি কর্তৃত্বশীল অবস্থানের মধ্য দিয়ে। ব্যক্তি নিজের সম্পর্কে কীভাবে চিন্তা করে, অন্যেরা তাকে নিয়ে কি চিন্তা করে ও কীভাবে চিন্তা করে এবং ব্যক্তির কাছে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা এবং জীবনের সম্ভাবনাগুলো কতখানি উন্মুক্ত, এসব বিষয়ের উপর লিঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। সমাজে পুরুষকে একই সাথে সক্রিয়তা ও সৃষ্টিশীল ভূমিকার বৃহত্তর পরিসরে দেখা হয়। অন্য দিকে ঐতিহ্যগতভাবেই নারীর জন্য সমাজ প্রত্যাশিত ভূমিকাটি স্থিরীকৃত হয় 'গৃহবধূ' ও 'মাতা' রূপে গৃহ পরিসরে সীমাবদ্ধ এবং তাদের স্বামী ও সন্তানদের সেবা শুশ্রূষা ও দেখাশোনার জন্য। এভাবে নারী ও পুরুষ দুটি ভিন্ন জগতের বাসিন্দা। এ পার্থক্য নারী ও পুরুষের জৈবিক গঠনের কারণে নয়, বরং যে পন্থায় নারী ও পুরুষ সমাজে বড় হয়ে ওঠে তারই উৎপাদন হিসেবে সমাজে বিদ্যমান। নারী ও পুরুষের এই পৃথক জগৎ সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার দ্বারাই নির্মিত হয় বলে Browne উল্লেখ করেন। এক কথায় জীবনের সর্বস্তরে বীরত্ব, সাহস, বুদ্ধিমত্তা, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, স্বনির্ভরতার প্রতীকগুলোর সঙ্গে পৌরুষের এবং ভীরুতা, লজ্জা, আনুগত্য, আবেগ, গৃহিণীপনা, সৌন্দর্য, যৌনতা, কোমলতা, মৃদুতা, নম্রতা, আত্মত্যাগ, নির্ভরতার প্রতীকগুলোর সঙ্গে নারীত্বের যুগ্ম বৈপরীত্যের ধারণাকে মিলিয়ে দেয়া হয়। জৈবিক বৈপরীত্যের বাইরে নারীত্ব ও পৌরুষের যে সামাজিক ছক তা ভাংগতে শুরু করেছে নারীরা যখন গৃহী পরিসরের বাইরে এসে সামাজিক উৎপাদন মূলক কাজে জড়িয়ে পড়ল তখন থেকে। নায়লা কবির দেখান নারীরা উৎপাদনমুখী কাজে বিশেষ করে গার্মেন্টস শিল্পে কাজ করার কারণে Intra household relationship এর পরিবর্তন হচ্ছে। নারীদের গার্মেন্টস্ ফ্যাক্টরীতে কাজ করার কারণে তাদের গৃহস্থালিতে সম্পর্কের মাত্রায় পরিবর্তন এসেছে এবং গৃহস্থালির অর্থনৈতিক কাঠামোকে দান করছে নতুন মাত্রা। গার্মেন্টস শিল্পে কাজ করার কারণে নারীরা স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছে এবং পুরুষের প্রতি নির্ভরশীলতা থেকে মুক্তি পাচ্ছে। নারীরা ক্রমশ উৎপাদনমুখী কাজে যুক্ত হওয়ায় নারীত্ব ও পৌরুষের সামাজিক ছকের পরিবর্তন হচ্ছে। পৌরুষের যে সামাজিক ছক তার কিছু বৈশিষ্ট্য নারীরা অর্জন করছে (connell:1995)। তবে বিভিন্ন সংস্কৃতিতে নারীকে পরাধীন এবং 'প্রকৃতির' সমতুল্য প্রতীক হিসেবে গণ্য করা হয়, নারী ও পুরুষের বৈশিষ্ট্যকে যথাক্রমে 'প্রকৃতি' ও 'সংস্কৃতির' সমতুল্য হিসেবে মনে করা হয় (Ortner:1981)। বিষয়টি এ রকম নারী সন্তান জন্মদান করে, সন্তানকে স্তন্য দান করে। স্তন্যদানের কারণে, মনুষ্য সন্তান বেড়ে ওঠার অনেক সময় লাগার কারণে মা এবং শিশুর সম্পর্ক কেবলমাত্র জন্মদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। শিশুকে তদারকি করা, ভাষা শেখানো, খাবার দাবার যোগার করে খাওয়ানোর কাজ ইত্যাদি মাকে ঘরের কাছাকাছি থাকতে বাধ্য করে। এ কারণেই

নারী ঘর এবং গৃহী চক্রের সাথে সংশ্লিষ্ট। আর সে কারণেই পুরুষ সংস্কৃতি উৎপাদন করে, সে প্রযুক্তি ও প্রতীকের সাহায্যে নতুনতত্ত্ব উৎপাদন করে। অর্টনার বলেন নারীর মনোজগৎ হচ্ছে প্রকৃতির কাছাকাছি, পুরুষেরটি নয়, এটিকে এ দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখা হয়। অর্টনার মনে করেন নারীর মনোজগৎ আসলেই পুরুষ হতে ভিন্ন। তবে সেটি কোন জৈবিক কিংবা শরীরগত কারণে নয়, ভিন্ন সামাজিকীকরণের কারণে। প্রচলিত ধারণা নৃবিজ্ঞানীদের প্রত্যয়নের বাইরে গার্মেন্টস কর্মী নারী ও পুরুষ ভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে ভিন্ন সত্তা গ্রহণ করছে কিনা তা এ গবেষণার প্রধান অনুসন্ধিৎসু বিষয় ছিল। এ গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণ করে দেখতে পেয়েছি নারী ও পুরুষ সত্তার ধরন স্থান, সময় এবং তাদের কাজের উপর নির্ভরশীল। পোশাক শিল্পের উৎপাদনমূলক কাজে বিভিন্ন স্তরে লিঙ্গীয় শ্রম বিভাজনের প্রক্রিয়া চলমান। এখানে নারীর জন্য বিশেষ কিছু কাজ এবং পুরুষের জন্য বিশেষ কিছু কাজ নির্দিষ্ট করা থাকে। এ নির্দিষ্টকরণ চলে পুঁজিবাদী স্বার্থে উৎপাদন সর্বোচ্চকরণের জন্য। এ লিঙ্গীয় শ্রম বিভাজন কারখানার অভ্যন্তরে নারীর সত্তার যে চিত্র চিত্রিত করে তা প্রচলিত 'নারীত্বের' ধারণায়ণ এবং পুরুষতান্ত্রিক সমাজে 'নারীর' নির্মাণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। একই সাথে একজন গার্মেন্টস্ কর্মী নারী তার দৈনন্দিন জীবন ব্যবস্থায় স্থান ভেদে পুরুষের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় আবার নারীর ভূমিকায়ও রূপায়িত হয়। আবার পুরুষ ও তার প্রচলিত সত্তা ধরে রাখতে পারে না। নারী ও পুরুষের মধ্যকার সম্পর্কের ধরন যেমন, নারী পুরুষের উপর অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল, পুরুষ উপার্জনকারী এবং জীবিকার জোগানদাতা ইত্যাদি স্থানভেদে পরিবর্তিত হচ্ছে।

প্রচলিত সামাজিক সাংস্কৃতিক রীতিনীতি, ঐতিহ্য ও ব্যবস্থার ফলশ্রুতিতে একজন নারী ও একজন পুরুষ যে ভিন্ন ভিন্ন কাজ ও দায়-দায়িত্ব পালন করে বা সমাজ কর্তৃক তাদের উপর অর্পিত হয় তাকেই বলা হয় লিঙ্গীয় শ্রম বিভাগ বা বিভাজন। এই লিঙ্গীয় শ্রম বিভাগ অনুযায়ী সমাজে নানা ধরনের কাজকে 'নারীর কাজ' বা পুরুষের কাজ এভাবে আলাদা করে চিহ্নিত করা হয়। লিঙ্গীয় শ্রম বিভাগ প্রথমত সমাজে নারী-পুরুষের মধ্যে দায়িত্ব, ভূমিকা ও কাজের প্রচলিত বরাদ্দকে নির্দেশ করে। দ্বিতীয়ত লিঙ্গীয় শ্রম বিভাগ নারী ও পুরুষের মধ্যে যে ভিন্ন ভিন্ন কাজ, দায়-দায়িত্ব ও ভূমিকা পালন করে তার মধ্যে গুণগত ও পার্থক্যসূচক বৈশিষ্ট্য আরোপ করে। যেমন, পুরুষের বাইরের আয় উপার্জনমূলক কাজ হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ, মূল্যবান বা সম্মানজনক, এবং পুরুষ যে কাজটি করে তা করতে অধিক বুদ্ধি, কৌশল ও পেশী শক্তির দরকার হয়; আর নারীর ঘরের গৃহস্থালির কাজ হচ্ছে গুরুত্বহীন, মুল্যহীন ও অমর্যাদাকর, এটি করতে কম পেশি শক্তি, কম কৌশল ও বুদ্ধির দরকার হয়। সাধারণত আমাদের দেশে প্রচলিত সমাজে জেন্ডার ভিত্তিক শ্রম বিভাগের বিষয়টিকে যুক্তিগ্রাহ্য করা হয় এই বলে যে, নারীরা পুরুষের তুলনায় শারীরিকভাবে দুর্বল, তাই এ ধরনের শ্রম বিভাগ

প্রাকৃতিক ও অপরিবর্তনীয়। এখানে একটি যুক্তি সাধারণ সমাজে দাঁড় করানো হয় তা হল নারীরা শারীরিকভাবে দুর্বল কারণ তাদের শারীরিক বিভিন্ন ক্রিয়া তাদের দুর্বল করে রাখে। যেমন, প্রতিমাসে নারীর শরীর থেকে নির্দিষ্ট সময়ে রক্ত ক্ষরণ হয় এবং নারী সন্তান প্রসব করার কারণে তার অনেক বেশি শারীরিক ক্ষয় হয় যে কারণে নারীর শরীর খুব বেশি শক্তিশালী হয় না। আর এ কারণে নারীদের ঐ কম শক্তিযুক্ত কাজের সাথে যুক্ততা। কিন্তু নারী ও পুরুষের শারীরিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যেমন পার্থক্য রয়েছে তেমনি বৈশিষ্ট্যগত মিলও রয়েছে। আর এই মিলটাই বেশি। তাছাড়া শারীরিক দুর্বলতার বিষয়টি বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত নয়। বরং সামাজিক বৈষম্যের জন্যই নারীরা অপুষ্টির শিকার এবং পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা না পাওয়াতে নারীর শরীরের সকল অঙ্গের ভারসাম্যপূর্ণ বিকাশ সম্ভব হয় না বলেই অনেক নারীর শারীরিক দুর্বলতা প্রকাশ পায়। লিঙ্গীয় শ্রম বিভাজনকে 'নারীর কাজের মুল্যায়ন ও নারীর অধঃস্তনতা' এবং 'পুরুষের কাজের মূল্যায়ন ও পুরুষের শ্রেষ্ঠতার মিথ' এ দুইটি অংশে নিম্নে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এ গবেষণাটি সাভার উপজেলার আশুলিয়া এলাকার পাঁচটি গার্মেন্টস্ নিটিং ফ্যাক্টরী এবং দুইটি ওভেন সোয়েটার ফ্যাক্টরীতে কর্মরত শ্রমিক এবং কর্মকর্তাদের কাজের উপর চালানো হয়েছে। নিম্নে তাদের লিঙ্গীয় শ্রম বিভাজন তুলে ধরা হল-

গার্মেন্টস্ নিটিং ফ্যাক্টরিতে উৎপাদন প্রণালি এবং লিঙ্গীয় শ্রম বিভাজন:

এ গবেষণায় গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীর লিঙ্গীয় শ্রম বিভাজন বোঝার জন্য প্রথমেই গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে একটি পোষাক তৈরী হতে যে ধারাবাহিক পর্যায়গুলো পার হতে হয় তার ক্রম নিম্নে তুলে ধরছি। এখানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ভিত্তিতে গার্মেন্টস তৈরির ধারাবাহিক পর্যায় প্রবাহ চিত্র আকারে তুলে ধরা হল-

গার্মেন্টস তৈরির ধারাবাহিক পর্যায়

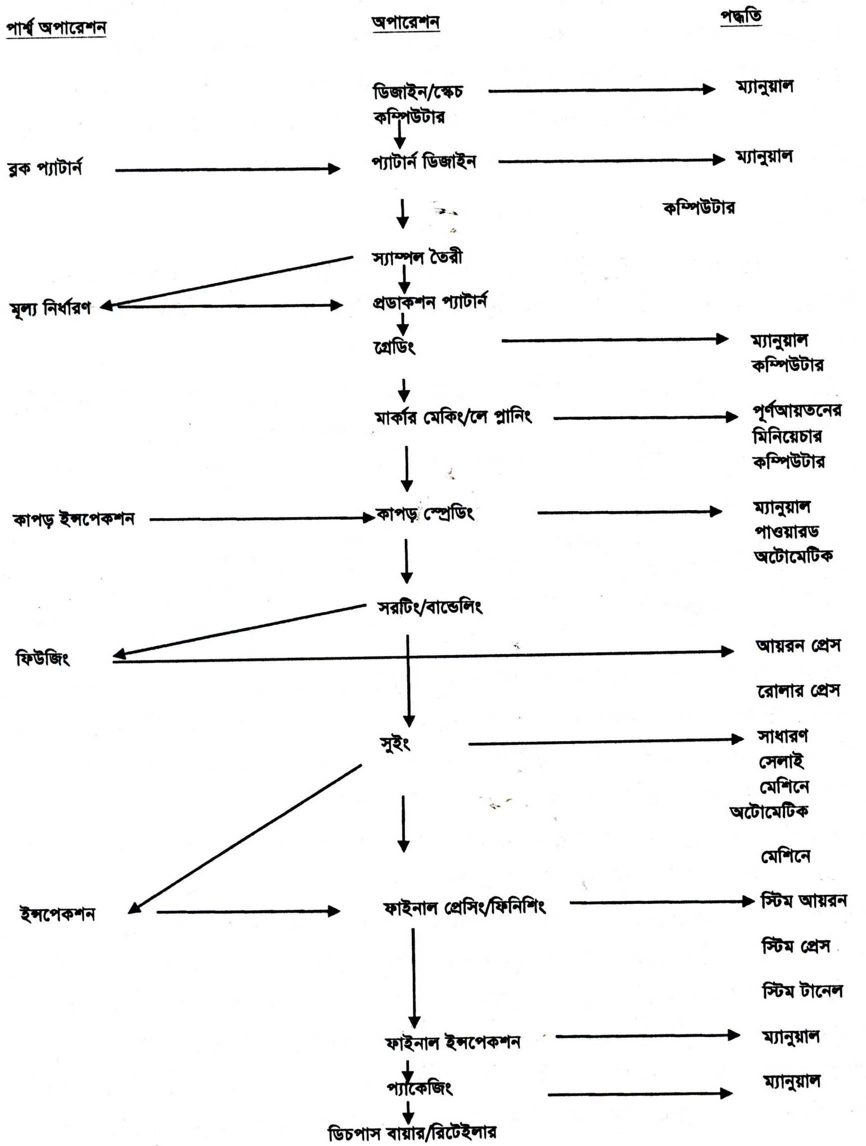

(সূত্রঃ মাঠ জরিপ)

এ গবেষণাটি পরিচালনা করতে গিয়ে ৫ টি গার্মেন্টস নিটিং ফ্যাক্টরি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। নিটিং ফ্যাক্টরীর মধ্যে ম্যাগপাই কম্পোজিট অ্যান্ড টেক্সটাইল লিমিটেড, কম-ফিট কম্পোজিট নিট লিমিটেড,মেট্রো নিটিং অ্যান্ড ডায়িং মিলস্, এ

আর জাপান লিমিটেড এবং ডেকো এক্সেসরিজ লিমিটেড এবং ওভেন ফ্যাক্টরীর মধ্যে নীটজোন ফ্যাশন লিমিটেড এবং ইয়াতা ডিজাইন সোয়েটার এর ধারাবাহিক উৎপাদন ধাপ বর্ণনা করে কোন ধাপে কতজন শ্রমিক কাজ করছে এবং এদের মধ্যে নারী কতজন এবং পুরুষ কতজন তার বিবরণ নিম্নে দেওয়া হল (এখানে প্রতিটি সেকশনের নাম গার্মেন্টস্ ফ্যাক্টরীর সর্বস্তরের কর্মীগণ ইংরেজিতে বলে থাকেন এ কারণে এ সেকশনগুলোর নামের ইংরেজি রূপ ব্যবহার করা হয়েছে)।

- **কাটিং সেকশন:**

কাটিং সেকশন হচ্ছে প্রায় প্রতিটি নিটিং ফ্যাক্টরীর প্রথম ধাপ। গবেষণাধীন ফ্যাক্টরিগুলোতে কাটিং সেকশনে নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যার লিঙ্গ ভিত্তিক বিবরণ নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	ফ্যাক্টরীর নাম	কর্মরত পুরুষ শ্রমিকের সংখ্যা (জন)	কর্মরত নারী শ্রমিকের সংখ্যা (জন)	মোট শ্রমিকের সংখ্যা (জন)
১	ম্যাগপাই কম্পোজিট অ্যান্ড টেক্সটাইল লিমিটেড	৩৪	০০	৩৪
২	কম-ফিট কম্পোজিট নিট লিমিটেড	৫৮	০৪	৬২
৩	মেট্রো নিটিং অ্যান্ড ডায়িং মিলস	২৬৬	০৪	২৭০
৪	এ আর জাপান লিমিটেড	২০	০০	২০
৫	ডেকো এক্সেসরিজ লিমিটেড	১৩৮	৬	১৪৪

(সূত্র: মাঠ জরিপ)

গবেষণাধীন ম্যাগপাই কম্পোজিট অ্যান্ড টেক্সটাইল লিমিটেড এ কাটিং সেকশনে মোট ৩৪জন শ্রমিক কাজ করেন। এ ৩৪জনের সবাই পুরুষ শ্রমিক। কম-ফিট কম্পোজিট নিট লিমিটেড এ মোট ৬২জন শ্রমিক কাজ করেন। এর মধ্যে ৫৮ জন পুরুষ শ্রমিক এবং ০৪ জন নারী শ্রমিক কাজ করেন। এ নারী শ্রমিকের কাজ হল কাটিং সেকশনের ঝুট (উচ্ছিষ্ট) কুড়ানো। পুরুষ শ্রমিকরা কাপড়ের নির্দেশিত নকশা অনুসারে কাপড় কেটে থাকেন। মেট্রো নিটিং অ্যান্ড ডায়িং সেকশনে এ মোট ২৭০ জন শ্রমিক কাজ করেন। এর মধ্যে ২৬৬ জন পুরুষ শ্রমিক কাপড় কাটার কাজ করেন এবং ০৪ জন নারী শ্রমিক কাটিং সেকশনে ঝুট কুড়ানোর কাজ করেন। এ আর জাপান লিমিটেড এ কাটিং সেকশনে এ মোট ২০ জন শ্রমিক কাজ করেন। এখানকার সবাই পুরুষ শ্রমিক। এখানে ০৩ জন ক্লিনার আছেন যারা এ কাটিং সেকশনের ঝুট কুড়ানোর কাজ করেন আবার একই সাথে পুরো ফ্যাক্টরি পরিষ্কার করার কাজও করেন। ডেকো এক্সেসরিজ লিমিটেড এ এই সেকশনে মোট ১৪৪ জন শ্রমিক কাজ করেন।এদের মধ্যে ১৩৮ জন পুরুষ কাজ করেন এবং ০৬ জন নারী শ্রমিক ঝুট কুড়ানোর কাজ করেন।

বান্ডেলিং সেকশন :

কাটিং সেকশনে নকশা এবং পরিমাপ অনুসারে কাপড় কাটার পর এর বিভিন্ন অংশ মিলিয়ে তা নির্দিষ্ট সংখ্যক টুকরা একত্রে বান্ডিল করা হয়। তার পর এ বান্ডিলকৃত

কাটা কাপড়গুলো সুইং সেকশনে আসে। গবেষণাধীন ফ্যাক্টরিগুলোতে বান্ডেলিং সেকশনে নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যার লিঙ্গ ভিত্তিক বিবরণ নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	ফ্যাক্টরীর নাম	কর্মরত পুরুষ শ্রমিকের সংখ্যা (জন)	কর্মরত নারী শ্রমিকের সংখ্যা (জন)	মোট শ্রমিকের সংখ্যা (জন)
১	ম্যাগপাই কম্পোজিট অ্যান্ড টেক্সটাইল লিমিটেড	০৮	০০	৮
২	কমফিট কম্পোজিট নিট লিমিটেড	০৪	০০	০৪
৩	মেট্রো নিটিং অ্যান্ড ডায়িং মিলস	০০	০৪	০৪
৪	এ আর জাপান লিমিটেড	০৬	০০	০৬
৫	ডেকো এক্সেসরিজ লিমিটেড	১০	০০	১০

(সূত্র: মাঠ জরিপ)

গবেষণাধীন ম্যাগপাই কম্পোজিট অ্যান্ড টেক্সটাইল লিমিটেড এ বান্ডেলিং সেকশনে মোট ০৮জন শ্রমিক কাজ করেন। এ ০৮জনের সবাই পুরুষ শ্রমিক। কমফিট কম্পোজিট নিট লিমিটেড এ এই সেকশনে মোট ০৪জন শ্রমিক কাজ করেন। এদের মধ্যে সবাই পুরুষ। মেট্রো নিটিং অ্যান্ড ডায়িং সেকশনে এ মোট ০৪জন শ্রমিক কাজ করেন। এদের মধ্যে সবাই নারী। এ আর জাপান লিমিটেড এ এই সেকশনে মোট ০৬জন শ্রমিক কাজ করেন। এখানকার সবাই পুরুষ শ্রমিক। ডেকো এক্সেসরিজ লিমিটেড এ এই সেকশনে মোট ১০জন শ্রমিক কাজ করেন। এদের মধ্যে সবাই পুরুষ।

সুইং সেকশন:

সুইং সেকশনে বান্ডেলকৃত নির্দিষ্ট সংখ্যক কাপড়ের টুকরাগুলো হিসেব করে গ্রহণ করা হয়। এখানে বিভিন্ন মেশিনের সাহায্যে কাটিং সেকশনে কাটা কাপড়ের টুকরাগুলো প্রয়োজনমাফিক সেলাই করে একটি পূর্ণাঙ্গ পোশাক তৈরি করা হয়। এখানে প্রতিটি মেশিনে একজন করে চালক থাকেন। তাদেরকে অপারেটর বলা হয়। অপারেটরের সাথে আবার একজন করে হেলপার থাকেন। গবেষণাধীন ফ্যাক্টরিগুলোতে সুইং সেকশনে নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যার লিঙ্গ ভিত্তিক বিবরণ নিম্নরূপ-

ক্রমিক নং	ফ্যাক্টরীর নাম	কর্মরত পুরুষ শ্রমিকের সংখ্যা (জন)	কর্মরত নারী শ্রমিকের সংখ্যা (জন)	মোট শ্রমিকের সংখ্যা (জন)
১	ম্যাগপাই কম্পোজিট অ্যান্ড টেক্সটাইল লিমিটেড	১৪৫	৩৩২	৪৭৭
২	কম-ফিট কম্পোজিট নিট লিমিটেড	৮৮	১৮০	২৬৮
৩	মেট্রো নিটিং অ্যান্ড ডায়িং মিলস	৬৮০	৯৬০	১৬৪০
৪	এ আর জাপান লিমিটেড	৭৫	৮০	১৫৫
৫	ডেকো এক্সেসরিজ লিমিটেড	২৮৭	৪৯৬	৭৮৩

(সূত্র: মাঠ জরিপ)

গবেষণাধীন ম্যাগপাই কম্পোজিট অ্যান্ড টেক্সটাইল লিমিটেড এ সুইং সেকশনে মোট ৪৭৭জন শ্রমিক কাজ করেন। এদের মধ্যে ১৪৫জন পুরুষ এবং ৩৩২জন নারী শ্রমিক

কাজ করেন। কম-ফিট কম্পোজিট নিট লিমিটেড এ মোট ২৬৮জন শ্রমিক কাজ করেন। এর মধ্যে ৮৮ জন পুরুষ শ্রমিক এবং ১৮০ জন নারী শ্রমিক কাজ করেন। মেট্রো নিটিং অ্যান্ড ডায়িং সেকশনে এ মোট ১৬৪০জন শ্রমিক কাজ করেন। এর মধ্যে ৬৮০ জন পুরুষ শ্রমিক এবং ৯৬০ জন নারী শ্রমিক কাজ করেন। এ আর জাপান লিমিটেড এ এই সেকশনে এ মোট ১৫৫জন শ্রমিক কাজ করেন। এখানে ৭৫জন পুরুষ এবং ৮০জন নারী শ্রমিক কাজ করেন। ডেকো এক্সেসরিজ লিমিটেড এ এই সেকশনে মোট ৭৮৩জন শ্রমিক কাজ করেন। এদের মধ্যে ২৮৭ জন পুরুষ কাজ করেন এবং ৪৯৬ জন নারী শ্রমিক কাজ করেন।

ফিনিশিং সেকশন:

কাপড় সুইং মেশিনে সেলাইয়ের পর তা আসে সুইং কোয়ালিটি চেকিংয়ে। চেকিং এর পর তা ফিনিশিং সেকশনে প্রেরণ করা হয়। এরপরে একে পাঠানো হয় আয়রন সেকশনে। আয়রন হওয়ার পর তা ফোল্ডিং সেকশনে চলে যায়। এখানে শ্রমিকরা কাপড় ফোল্ডিং করেন। এরপর ফোল্ডিংকৃত কাপড়গুলো পলিব্যাগে প্যাক করে তা কার্টুনজাত করা হয়। কার্টুনজাত কাপড়গুলো লোডারম্যান বয়ে নিয়ে স্টোরে জমা রাখেন। এখান থেকে তা বায়ার বা রিটেইলাদের কাছে ডেলিভারি দেওয়া হয়। এখানে গবেষণাধীন ফ্যাক্টরিতে ফিনিশিং সেকশনের বিভিন্ন অংশে কর্মরত শ্রমিকদের লিঙ্গ ভিত্তিক সংখ্যার বিবরণ নিম্নে পেশ করছি-

কোয়ালিটি চেকিং :

গবেষণাধীন ফ্যাক্টরিগুলোতে কোয়ালিটি চেকিং সেকশনে নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যার লিঙ্গ ভিত্তিক বিবরণ নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	ফ্যাক্টরীর নাম	কর্মরত পুরুষ শ্রমিকের সংখ্যা (জন)	কর্মরত নারী শ্রমিকের সংখ্যা (জন)	মোট শ্রমিকের সংখ্যা (জন)
১	ম্যাগপাই কম্পোজিট অ্যান্ড টেক্সটাইল লিমিটেড	৮১	১৫	৯৬
২	কমফিট কম্পোজিট নিট লিমিটেড	৬৫	২০	৮৫
৩	মেট্রো নিটিং অ্যান্ড ডায়িং মিলস	৮০	১০	৯০
৪	এ আর জাপান লিমিটেড	১৫	১০	২৫
৫	ডেকো এক্সেসরিজ লিমিটেড	৭৮	১২	৯০

(সূত্র: মাঠ জরিপ)

গবেষণাধীন ম্যাগপাই কম্পোজিট অ্যান্ড টেক্সটাইল লিমিটেড এ কোয়ালিটি চেকিং সেকশনে মোট ৯৬জন শ্রমিক কাজ করেন। এদের মধ্যে ৮১জন পুরুষ এবং ১৫জন নারী শ্রমিক কাজ করেন। কম-ফিট কম্পোজিট নিট লিমিটেড এ মোট ৮৫জন শ্রমিক কাজ করেন। এর মধ্যে ৬৫ জন পুরুষ শ্রমিক এবং ২০ জন নারী শ্রমিক কাজ করেন। মেট্রো নিটিং অ্যান্ড ডায়িং সেকশনে এ মোট ৯০জন শ্রমিক কাজ করেন। এর মধ্যে ৮০ জন পুরুষ শ্রমিক এবং ১০ জন নারী শ্রমিক কাজ করেন। এ আর জাপান

লিমিটেড এ এই সেকশনে এ মোট ২৫জন শ্রমিক কাজ করেন। এখানে ১৫জন পুরুষ এবং ১০জন নারী শ্রমিক কাজ করেন। ডেকো এক্সেসরিজ লিমিটেড এ এই সেকশনে মোট ৯০জন শ্রমিক কাজ করেন। এদের মধ্যে ৭৮ জন পুরুষ কাজ করেন এবং ১২ জন নারী শ্রমিক কাজ করেন।

আয়রন সেকশন:

গবেষণাধীন ফ্যাক্টরিগুলোতে আয়রন সেকশনে নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যার লিঙ্গ ভিত্তিক বিবরণ নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	ফ্যাক্টরীর নাম	কর্মরত পুরুষ শ্রমিকের সংখ্যা (জন)	কর্মরত নারী শ্রমিকের সংখ্যা (জন)	মোট শ্রমিকের সংখ্যা (জন)
১	ম্যাগপাই কম্পোজিট অ্যান্ড টেক্সটাইল লিমিটেড	৩৬	০০	৩৬
২	কমফিট কম্পোজিট নিট লিমিটেড	২৪	০০	২৪
৩	মেট্রো নিটিং অ্যান্ড ডায়িং মিলস	৯৭	০০	৯৭
৪	এ আর জাপান লিমিটেড	২০	০০	২০
৫	ডেকো এক্সেসরিজ লিমিটেড	৪৬	০০	৪৬

(সূত্র: মাঠ জরীপ)

গবেষণাধীন ম্যাগপাই কম্পোজিট এন্ড টেক্সটাইল লিমিটেড এ আয়রন সেকশনে মোট ৩৬জন শ্রমিক কাজ করেন। এদের সবাই পুরুষ। কমফিট কম্পোজিট নিট লিমিটেড এ মোট ২৪জন শ্রমিক কাজ করেন। এদের মধ্যে সবাই পুরুষ। মেট্রো নিটিং অ্যান্ড ডায়িং সেকশনে এ মোট ৯৭জন শ্রমিক কাজ করেন। এদের সবাই পুরুষ শ্রমিক। এ আর জাপান লিমিটেড এ এই সেকশনে এ মোট ২০জন শ্রমিক কাজ করেন। এখানে ২০জনের সবাই পুরুষ শ্রমিক। ডেকো এক্সেসরিজ লিমিটেড এ এই সেকশনে মোট ৪৬জন শ্রমিক কাজ করেন। এদের মধ্যে সবাই পুরুষ।

কোয়ালিটি কন্ট্রোলার:

গবেষণাধীন ফ্যাক্টরিগুলোতে কোয়ালিটি কন্ট্রোলার সেকশনে নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যার লিঙ্গ ভিত্তিক বিবরণ নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	ফ্যাক্টরীর নাম	কর্মরত পুরুষ শ্রমিকের সংখ্যা (জন)	কর্মরত নারী শ্রমিকের সংখ্যা (জন)	মোট শ্রমিকের সংখ্যা (জন)
১	ম্যাগপাই কম্পোজিট এন্ড টেক্সটাইল লিমিটেড	০৩	০০	০৩
২	কম-ফিট কম্পোজিট নিট লিমিটেড	০২	০০	০২
৩	মেট্রো নিটিং অ্যান্ড ডায়িং মিলস	১০	০০	১০
৪	এ আর জাপান লিমিটেড	০২	০০	০২
৫	ডেকো এক্সেসরিজ লিমিটেড	০৯	০০	০৯

(সূত্র: মাঠ জরিপ)

গবেষণাধীন ম্যাগপাই কম্পোজিট অ্যান্ড টেক্সটাইল লিমিটেড এ কোয়ালিটি কন্ট্রোলার সেকশনে মোট ০৩জন শ্রমিক কাজ করেন। এদের সবাই পুরুষ। কম-ফিট

কম্পোজিট নিট লিমিটেড এ মোট ০২জন শ্রমিক কাজ করেন। এদের মধ্যে সবাই পুরুষ। মেট্রো নিটিং অ্যান্ড ডায়িং সেকশনে এ মোট ১০জন শ্রমিক কাজ করেন। এদের সবাই পুরুষ শ্রমিক। এ আর জাপান লিমিটেড এ এই সেকশনে এ মোট ০২জন শ্রমিক কাজ করেন। এখানে ২০জনের সবাই পুরুষ শ্রমিক। ডেকো এক্সেসরিজ লিমিটেড এ এই সেকশনে মোট ০৯জন শ্রমিক কাজ করেন। এদের মধ্যে সবাই পুরুষ।

ফোল্ডিং সেকশন:

গবেষণাধীন ফ্যাক্টরিগুলোতে ফোল্ডিং সেকশনে নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যার লিঙ্গ ভিত্তিক বিবরণ নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	ফ্যাক্টরীর নাম	কর্মরত পুরুষ শ্রমিকের সংখ্যা (জন)	কর্মরত নারী শ্রমিকের সংখ্যা (জন)	মোট শ্রমিকের সংখ্যা (জন)
১	ম্যাগপাই কম্পোজিট অ্যান্ড টেক্সটাইল লিমিটেড	০৯	৩১	৪০
২	কমফিট কম্পোজিট নিট লিমিটেড	০০	২৯	২৯
৩	মেট্রো নিটিং অ্যান্ড ডায়িং মিলস	০৬	২৬	৩২
৪	এ আর জাপান লিমিটেড	০০	০৪	০৪
৫	ডেকো এক্সেসরিজ লিমিটেড	০০	৩০	৩০

(সূত্র: মাঠ জরিপ)

গবেষণাধীন ম্যাগপাই কম্পোজিট অ্যান্ড টেক্সটাইল লিমিটেড এ ফোল্ডিং সেকশনে মোট ৪০জন শ্রমিক কাজ করেন। এদের মধ্যে ০৯জন পুরুষ এবং ৩১জন নারী শ্রমিক কাজ করেন। কমফিট কম্পোজিট নিট লিমিটেড এ মোট ২৯জন শ্রমিক কাজ করেন। এদের মধ্যে সবাই নারী শ্রমিক। মেট্রো নিটিং অ্যান্ড ডায়িং সেকশনে এ মোট ৩২জন শ্রমিক কাজ করেন। এর মধ্যে ০৬ জন পুরুষ শ্রমিক এবং ২৬ জন নারী শ্রমিক কাজ করেন। এ আর জাপান লিমিটেড এ এই সেকশনে এ মোট ০৪জন শ্রমিক কাজ করেন। এখানে সবাই নারী শ্রমিক কাজ করেন। ডেকো এক্সেসরিজ লিমিটেড এ এই সেকশনে মোট ৩০জন শ্রমিক কাজ করেন। এখানকার সবাই নারী শ্রমিক।

প্যাকিং সেকশন:

গবেষণাধীন ফ্যাক্টরিগুলোতে ফোল্ডিং সেকশনে নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যার লিঙ্গ ভিত্তিক বিবরণ নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	ফ্যাক্টরীর নাম	কর্মরত পুরুষ শ্রমিকের সংখ্যা (জন)	কর্মরত নারী শ্রমিকের সংখ্যা (জন)	মোট শ্রমিকের সংখ্যা (জন)
১	ম্যাগপাই কম্পোজিট অ্যান্ড টেক্সটাইল লিমিটেড	২৩	০০	২৩
২	কম-ফিট কম্পোজিট নিট লিমিটেড	১৮	০০	১৮
৩	মেট্রো নিটিং অ্যান্ড ডায়িং মিলস	২৭	০০	২৭
৪	এ আর জাপান লিমিটেড	০৮	০০	০৮
৫	ডেকো এক্সেসরিজ লিমিটেড	২০	০০	২০

(সূত্র: মাঠ জরিপ)

গবেষণাধীন ম্যাগপাই কম্পোজিট অ্যান্ড টেক্সটাইল লিমিটেড এ প্যাকিং সেকশনে মোট ২৩জন শ্রমিক কাজ করেন। কম-ফিট কম্পোজিট নিট লিমিটেড এ মোট ১৮জন শ্রমিক কাজ করেন। মেট্রো নিটিং অ্যান্ড ডায়িং সেকশনে এ মোট ২৭জন শ্রমিক কাজ করেন। এ আর জাপান লিমিটেড এ এই সেকশনে এ মোট ০৮জন শ্রমিক কাজ করেন। ডেকো এক্সেসরিজ লিমিটেড এ এই সেকশনে মোট ২০জন শ্রমিক কাজ করেন। উল্লিখিত পাঁচটি ফ্যাক্টরীর প্যাকিং সেকশনে যারা কাজ করছেন সারণিতে দেখতে পাচ্ছি তারা সবাই পুরুষ শ্রমিক।

লোডিং সেকশন:

এ সেকশনে নিয়োজিত শ্রমিকরা কার্টুনজাত কাপড় স্টোরে নিয়ে জমা করেন। এবং বিভিন্ন মালপত্র নীচ থেকে উপরে বিভিন্ন তলায় সরবরাহ করে থাকেন। এক্ষেত্রে নিটিং সেকশনে সদ্য প্রস্তুত রোলিং থান কাপড় উপরের বিভিন্ন তলায় সরবরাহ করে থাকেন এ লোডিং শ্রমিকরা। গবেষণাধীন ফ্যাক্টরিগুলোতে লোডিং সেকশনে নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যার লিঙ্গ ভিত্তিক বিবরণ নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	ফ্যাক্টরীর নাম	কর্মরত পুরুষ শ্রমিকের সংখ্যা (জন)	কর্মরত নারী শ্রমিকের সংখ্যা (জন)	মোট শ্রমিকের সংখ্যা (জন)
১	ম্যাগপাই কম্পোজিট অ্যান্ড টেক্সটাইল লিমিটেড	০৮	০০	০৮
২	কম-ফিট কম্পোজিট নিট লিমিটেড	০৬	০০	০৬
৩	মেট্রো নিটিং অ্যান্ড ডায়িং মিলস	১৩	০০	১৩
৪	এ আর জাপান লিমিটেড	০৭	০০	০৭
৫	ডেকো এক্সেসরিজ লিমিটেড	১০	০০	১০

(সূত্র: মাঠ জরিপ)

গবেষণাধীন ম্যাগপাই কম্পোজিট অ্যান্ড টেক্সটাইল লিমিটেড এ লোডিং সেকশনে মোট ০৮জন শ্রমিক কাজ করেন। কম-ফিট কম্পোজিট নিট লিমিটেড এ মোট ০৬জন শ্রমিক কাজ করেন। মেট্রো নিটিং অ্যান্ড ডায়িং সেকশনে এ মোট ১৩জন শ্রমিক কাজ করেন। এ আর জাপান লিমিটেড এ এই সেকশনে এ মোট ০৭জন শ্রমিক কাজ করেন। ডেকো এক্সেসরিজ লিমিটেড এ এই সেকশনে মোট ১০জন শ্রমিক কাজ করেন। এখানেও প্যাকিং সেকশনের মত শ্রমিকদের সবাই পুরুষ।

ঝাড়ুদার (ক্লিনার):

গবেষণাধীন ফ্যাক্টরিগুলোতে ঝাড়ুদার (ক্লিনার) সেকশনে নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যার লিঙ্গ ভিত্তিক বিবরণ নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	ফ্যাক্টরীর নাম	কর্মরত পুরুষ শ্রমিকের সংখ্যা (জন)	কর্মরত নারী শ্রমিকের সংখ্যা (জন)	মোট শ্রমিকের সংখ্যা (জন)
১	ম্যাগপাই কম্পোজিট অ্যান্ড টেক্সটাইল লিমিটেড	০০	১০	১০
২	কম-ফিট কম্পোজিট নিট জলিমিটেড	০০	০৬	০৬
৩	মেট্রো নিটিং অ্যান্ড ডায়িং মিলস	০০	১৬	১৬
৪	এ আর জাপান লিমিটেড	০০	০৪	০৪
৫	ডেকো এক্সেসরিজ লিমিটেড	০০	১২	১২

(সূত্র: মাঠ জরিপ)

গবেষণাধীন ম্যাগপাই কম্পোজিট অ্যান্ড টেক্সটাইল লিমিটেড এ ঝাড়ুদার সেকশনে মোট ১০জন শ্রমিক কাজ করেন। কম-ফিট কম্পোজিট নিট লিমিটেড এ মোট ০৬জন শ্রমিক কাজ করেন। মেট্রো নিটিং অ্যান্ড ডায়িং সেকশনে মোট ১৬জন শ্রমিক কাজ করেন।এ আর জাপান লিমিটেড এ এই সেকশনে এ মোট ০৪জন শ্রমিক কাজ করেন। ডেকো এক্সেসরিজ লিমিটেড এ এই সেকশনে মোট ১২জন শ্রমিক কাজ করেন। উল্লিখিত পাঁচটি ফ্যাক্টরিতে দেখতে পেয়েছি ঝাড়ুদার সেকশনে সবাই নারী শ্রমিক।

ডে-কেয়ার সেন্টার:

ডে-কেয়ার সেন্টারে নারী শ্রমিকদের সন্তানদের কর্মঘন্টা সময়ে লালন পালন করার ব্যবস্থা করা হয়। তবে কোন ফ্যাক্টরিতে ডে-কেয়ার সেন্টার আছে আবার কোন কোনটিতে নেই। গবেষণাধীন ফ্যাক্টরিগুলোতে ডে-কেয়ার সেন্টারে নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যার লিঙ্গ ভিত্তিক বিবরণ নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	ফ্যাক্টরীর নাম	কর্মরত পুরুষ শ্রমিকের সংখ্যা (জন)	কর্মরত নারী শ্রমিকের সংখ্যা (জন)	মোট শ্রমিকের সংখ্যা (জন)
১	ম্যাগপাই কম্পোজিট অ্যান্ড টেক্সটাইল লিমিটেড	০০	০১	০১
২	কম-ফিট কম্পোজিট নিট লিমিটেড	০০	০০	০০
৩	মেট্রো নিটিং অ্যান্ড ডায়িং মিলস	০০	০২	০২
৪	এ আর জাপান লিমিটেড	০০	০০	০০
৫	ডেকো এক্সেসরিজ লিমিটেড	০০	০২	০২

(সূত্র: মাঠ জরিপ)

গবেষণাধীন ফ্যাক্টরী ম্যাগপাই কম্পোজিট অ্যান্ড টেক্সটাইল লিমিটেড এ ডে- কেয়ার সেন্টারে একজন নারী শ্রমিক কাজ করেন তবে তিনি একই সাথে ঝাড়ুদার এবং নার্সিং উভয় কাজই করেন যখন পরিষ্কার করার কাজের চাপ কম থাকে তখন তিনি এ সেন্টারে এসে শিশুদের দেখাশোনা করেন। কম ফিট কম্পোজিট নিট লিমিটেড এ কোন ডে-কেয়ার সেন্টার নেই। মেট্রো নিটিং অ্যান্ড ডায়িং মিলস্ এ ০২জন নারী শ্রমিক কাজ করেন। এ আর জাপান লিমিটেড এ কোন ডে-কেয়ার সেন্টার নেই। এবং ডেকো এক্সেসরিজ এ ০২জন নারী ডে-কেয়ার সেন্টারে কাজ করেন। গবেষণাধীন ফ্যাক্টরিগুলোতে ডে-কেয়ার সেন্টারে কোন পুরুষ শ্রমিকদের কাজ করতে দেখি নি।

মর্যাদাগত স্তরায়ণ:

মর্যাদাগত স্তরায়ণ বলতে এখানে গার্মেন্টস্ সেক্টরে কর্মরত মজুরি শ্রমিকবাদে বাকি যারা নির্দিষ্ট বেতন ভুক্ত কিংবা যারা কিনা ফ্যাক্টরীর স্টাফ তাদের মধ্যকার স্তরায়নকে বোঝানো হয়েছে। এ মর্যাদাগত স্তরায়নের মধ্যে যাদেরকে অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে তাদের স্তরায়ন ভিত্তিক পদবি হল- সুপারভাইজার, লাইন ইনচার্জ, ফ্লোর ইনচার্জ এবং

প্রডাকশন ম্যানেজার। এখন গবেষণাধীন ফ্যাক্টরিগুলোতে এ মর্যাদা ভিত্তিক স্তরায়নগুলোতে নিয়োজিত নারী ও পুরুষ কর্মচারী- কর্মকর্তার সংখ্যার লিঙ্গ ভিত্তিক বিবরণ নিম্নে দেওয়া হল:

সুপারভাইজার

প্রত্যেকটি ফ্যাক্টরিতে বিভিন্ন সেকশনে কাজ তদারকি করার জন্য একাধিক সুপারভাইজার থাকেন। গবেষণাধীন ফ্যাক্টরিগুলোতে সুপারভাইজার পদে নিয়োজিত কর্মকর্তা কর্মচারী সংখ্যার লিঙ্গ ভিত্তিক বিবরণ নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	ফ্যাক্টরীর নাম	কর্মরত পুরুষ কর্মকর্তার সংখ্যা (জন)	কর্মরত নারী কর্মকর্তার সংখ্যা (জন)	মোট কর্মকর্তার সংখ্যা (জন)
১	ম্যাগপাই কম্পোজিট অ্যান্ড টেক্সটাইল লিমিটেড	১৫	০২	১৭
২	কম-ফিট কম্পোজিট নিট লিমিটেড	১৯	০০	১৯
৩	মেট্রো নিটিং অ্যান্ড ডায়িং মিলস	২২	০২	২৪
৪	এ আর জাপান লিমিটেড	১০	০০	১০
৫	ডেকো এক্সেসরিজ লিমিটেড	২২	০০	২২

(সূত্র: মাঠ জরীপ)

ম্যাগপাই কম্পোজিট অ্যান্ড টেক্সটাইল লিমিটেড এ বিভিন্ন সেকশনে মোট ১৭জন সুপারভাইজার কাজ করেন। এদের মধ্যে ১৫জন এবং ০২জন নারী সুপারভাইজার কাজ করেন। কম-ফিট কম্পোজিট নিট লিমিটেড এ মোট ১৯জন সুপারভাইজার তদারকি করেন। এদের সবাই পুরুষ। মেট্রো নিটিং অ্যান্ড ডায়িং মিলস্ এ মোট ২৪জন সুপারভাইজার দায়িত্বরত আছেন। এদের মধ্যে ২২ জন পুরুষ এবং ০২জন নারী। এ আর জাপান লিমিটেড এ মোট ১০জন সুপারভাইজার কাজ করেন। এদের সবাই পুরুষ। এবং ডেকো এক্সসরিজ লিমিটেড এ ২২জন সুপারভাইজার কাজ করেন। এদের সবাই পুরুষ।

লাইন ইনচার্জ/ লাইনচিফ:

গার্মেন্টস্ ফ্যাক্টরিগুলোতে লাইন ইনচার্জ মূলত সুইং সেকশনে কাজ করে থাকেন। সুইং সেকশনের প্রতিটি সুইং লাইনে একজন করে ইনচার্জ থাকার নিয়ম কিন্তু ফ্যাক্টরীর অবস্থা অনুসারে এর সংখ্যার তারতম্য হয়। কোন ফ্যাক্টরিতে আবার প্রতিটি ফ্লোরে একজন লাইন ইনচার্জ থাকেন। গবেষণাধীন ফ্যাক্টরিগুলোতে লাইন ইনচার্জ পদে নিয়োজিত কর্মকর্তা কর্মচারী সংখ্যার লিঙ্গ ভিত্তিক বিবরণ নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	ফ্যাক্টরীর নাম	কর্মরত পুরুষ কর্মকর্তার সংখ্যা (জন)	কর্মরত নারী কর্মকর্তার সংখ্যা (জন)	মোট কর্মকর্তার সংখ্যা (জন)
১	ম্যাগপাই কম্পোজিট অ্যান্ড টেক্সটাইল লিমিটেড	০৩	০০	০৩
২	কম-ফিট কম্পোজিট নিট লিমিটেড	০৪	০০	০৪
৩	মেট্রো নিটিং অ্যান্ড ডায়িং মিলস	১০	০০	১০
৪	এ আর জাপান লিমিটেড	০১	০০	০১
৫	ডেকো এক্সেসরিজ লিমিটেড	০৭	০১	০৮

(সূত্র: মাঠ জরীপ)

গবেষিত ম্যাগপাই কম্পোজিট অ্যান্ড টেক্সটাইল লিমিটেড এ মোট ০৩ জন লাইন ইনচার্জ আছেন। এদের সবাই পুরুষ। কম-ফিট কম্পোজিট নিট লিমিটেড এ ০৪ জন লাইন ইনচার্জ আছেন যাদের সবাই পুরুষ। মেট্রো নিটিং অ্যান্ড ডায়িং মিলস্ এ ১০জন লাইন ইনচার্জ কাজ করছেন। এদের সবাই পুরুষ। এ আর জাপান লিমিটেড এ ০১জন পুরুষ লাইন ইনচার্জ কাজ করেন। এবং ডেকো এক্সেসরিজ লিমিটেড এ মোট ০৮জন লাইন ইনচার্জ কাজ করছেন। এদের মধ্যে ০৭জন পুরুষ এবং ০১ নারী।

ফ্লোর ইনচার্জ:

গবেষণাধীন ফ্যাক্টরিগুলোতে ফ্লোর ইনচার্জ পদে নিয়োজিত কর্মকর্তা কর্মচারী সংখ্যার লিঙ্গ ভিত্তিক বিবরণ নিম্নরূপ:

ক্রমিকনং	ফ্যাক্টরীর নাম	কর্মরত পুরুষ কর্মকর্তার সংখ্যা (জন)	কর্মরত নারী কর্মকর্তার সংখ্যা (জন)	মোট কর্মকর্তার সংখ্যা (জন)
১	ম্যাগপাই কম্পোজিট অ্যান্ড টেক্সটাইল লিমিটেড	০৪	০০	০৪
২	কম-ফিট কম্পোজিট নিট লিমিটেড	০২	০০	০২
৩	মেট্রো নিটিং অ্যান্ড ডায়িং মিলস	০৫	০০	০৫
৪	এ আর জাপান লিমিটেড	০১	০০	০১
৫	ডেকো এক্সেসরিজ লিমিটেড	০৫	০০	০৫

(সূত্র: মাঠ জরিপ)

গবেষিত ম্যাগপাই কম্পোজিট অ্যান্ড টেক্সটাইল লিমিটেড এ মোট ০৪ জন ফ্লোর ইনচার্জ আছেন। এদের সবাই পুরুষ। কম-ফিট কম্পোজিট নিট লিমিটেড এ ০২ জন ফ্লোর ইনচার্জ আছেন যাদের সবাই পুরুষ। মেট্রো নিটিং অ্যান্ড ডায়িং মিলস্ এ ০৫জন ফ্লোর ইনচার্জ কাজ করছেন। এদের সবাই পুরুষ। এ আর জাপন লিমিটেড এ ০১জন পুরুষ ফ্লোর ইনচার্জ এবং ডেকো এক্সেসরিজ লিমিটেড এ মোট ০৫জন ফ্লোর ইনচার্জ কাজ করছেন। এদের মধ্যে ০৫জনই পুরুষ। গবেষিত এ ফ্যাক্টরিগুলোতে কোন নারী ফ্লোর ইনচার্জ পাই নি।

প্রোডাকশন ম্যানেজার (পি.এম):

গবেষণাধীন ফ্যাক্টরিগুলোতেপ্রোডাকশন ম্যানেজার পদে নিয়োজিত কর্মকর্তা কর্মচারী সংখ্যার লিঙ্গ ভিত্তিক বিবরণ নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	ফ্যাক্টরীর নাম	কর্মরত পুরুষ কর্মকর্তার সংখ্যা (জন)	কর্মরত নারী কর্মকর্তার সংখ্যা (জন)	মোট কর্মকর্তার সংখ্যা (জন)
১	ম্যাগপাই কম্পোজিট অ্যান্ড টেক্সটাইল লিমিটেড	০১	০০	০১
২	কম-ফিট কম্পোজিট নিট লিমিটেড	০১	০০	০১
৩	মেট্রো নিটিং অ্যান্ড ডায়িং মিলস	০৪	০০	০৪
৪	এ আর জাপান লিমিটেড	০১	০০	০১
৫	ডেকো এক্সেসরিজ লিমিটেড	০৩	০০	০৩

(সূত্র: মাঠ জরিপ)

গবেষিত ম্যাগপাই কম্পোজিট অ্যান্ড টেক্সটাইল লিমিটেড ০১ জন পি.এম আছেন যিনি একজন পুরুষ। কম-ফিট কম্পোজিট নিট লিমিটেড এ ০১ জন পি.এম আছেন তিনিও পুরুষ। মেট্রো নিটিং অ্যান্ড ডায়িং মিলস্ এ ০৪জন পি.এম কাজ করছেন। এদের সবাই পুরুষ। এ আর জাপন লিমিটেড এ ০১ জন পুরুষ পি.এম এবং ডেকো এক্সেসরিজ লিমিটেড এ মোট ০৩ জন পি.এম কাজ করছেন। এদের মধ্যে ০৩ জনই পুরুষ। গবেষিত এ ফ্যাক্টরিগুলোতে কোন নারী পি.এম পাই নি।

ওভেন সোয়েটার ফ্যাক্টরিতে উৎপাদন প্রনালী এবং লিঙ্গীয় শ্রম বিভাজনঃ

গবেষিত ফ্যাক্টরীর মধ্যে ০২টি ওভেন সোয়েটার ফ্যাক্টরি ছিল। ফ্যাক্টরি দুইটি হল নিটজোন ফ্যাশন লিমিটেড এবং ইয়াতা ডিজাইন সোয়েটার। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সোয়েটার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় একটি ফ্যাক্টর মধ্যে যে যে ধাপের মধ্য দিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ পোশাকতৈরি হয় তা নিম্নে দেওয়া হল-

সোয়েটার উৎপাদনের বিভিন্ন ধাপ

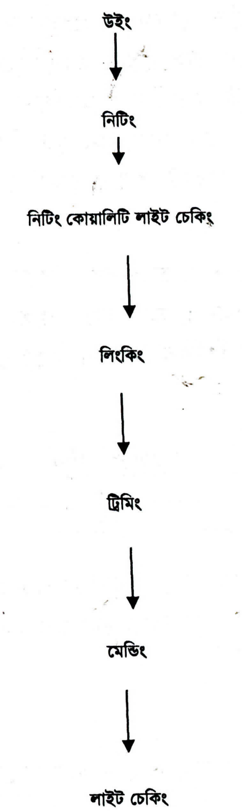

(সূত্রঃ মাঠ জরিপ)

সুতার মিল থেকে সুতা সংগ্রহ করে বিভিন্ন সোয়েটার ফ্যাক্টরিতে তা ঝুট মুক্ত করার জ্য বাতাসে ওড়ানো হয়। এরপরে সুতাটি পরিষ্কার হলে তা বোবিনে (সুতা গোছানোর ধারক) ভরে নিটিং সেকশনে প্রেরণ করা হয়। নিটিং সেকশনে নিটিং মেশিন দ্বারা সোয়েটারের বিভিন্ন অংশ গাথা/ তৈরি করা হয়। এ নিটিং মেশিনগুলো হস্ত চালিত। এ তেরীকৃত অংশগুলোতে কোন প্রকার অবাঞ্ছিত ছিদ্র আছে কিনা তা লাইট চেকিং এর সাহায্যে চেক করা হয়। এ অংশে উত্তীর্ণ সোয়েটারের তৈরীকৃত বিভিন্ন অংশ লিংকিং সেকশনে প্রেরণ করা হয়। এ সেকশনে বিভিন্ন অংশ লিংকিং মেশিনের সাহায্যে সেলাই করে জোড়া লাগিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ পোষাকে রূপ দেওয়া হয়। লিংকিং মেশিনে বিভিন্ন অংশ জোড়া লাগানোর পর তা ট্রিমিং সেকশন প্রেরণ করা হয়। ট্রিমিং সেকশনে লিংকিং এর পর যদি কোন বাড়তি সুতা কিংবা কাপড়ের বাড়তি অংশ বাড়ানো থাকে তাহলে তা কেটে ফেলা হয় এবং বাড়তি সুতা সুইয়ের সাহায্যে ভেতরের দিকে এমনভাবে গেঁথে দেওয়া হয় এবং গিঁট দেওয়া হয় যেন তা গাঁথুনির সাথে মিলে থাকে এবং সুতা বেরিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। ট্রিমিং সেকশনের কাজ শেষ হওয়ার পর তা মেন্ডিং সেকশনে প্রেরণ করা হয়। মেন্ডিং সেকশনে বিভিন্ন অংশের জোড়া লাগানো অংশে যদি কোন অনাকাঙ্ক্ষিত ছিদ্র কিংবা কাপড়ের মধ্যে ফুটা দেখা দেয় তাহলে তা সুই সুতা দিয়ে মেরামত করা হয়। এ মেরামত করার পর বোঝার কোন উপায় নেই যে, এখানে কোন খুত কিংবা ছিদ্র ছিল। মেন্ডিং সেকশন থেকে চুড়ান্ত পর্যায়ের যাচাই বাছাই করার জন্য লাইট চেকিংয়ে প্রেরণ করা হয়। লাইট

চেকিংয়ে উত্তীর্ণ সোয়েটার ওয়াশ করার পর শুকিয়ে কার্টুনজাত করে রিটেইলারদের কাছে বা বায়ারদের কাছে সরবরাহ করা হয়। এখন গবেষণাধীন ফ্যাক্টরিতে বিভিন্ন অংশে কর্মরত শ্রমিকদের লিঙ্গ ভিত্তিক বিবরণ নিম্নে পেশ করছি-

উইন্ডিং সেকশন:

ক্রমিকনং	ফ্যাক্টরীর নাম	কর্মরত পুরুষ শ্রমিক	কর্মরত নারী শ্রমিক	মোট কর্মরত শ্রমিক
০১	নিটজোন ফ্যাশন লিমিটেড	০০	০২	০২
০২	ইয়াতা ডিজাইন সোয়েটার	০০	০১	০১

(সূত্র: মাঠ জরিপ)

নিটজোন ফ্যাশন লিমিটেড এ উইন্ডিং সেকশনে ০২ জন নারী এবং ইয়াতা ডিজাইন সোয়েটার লিমিটেড এ ০১ জন নারী কাজ করছেন। এ সেকশনে কোন পুরুষ শ্রমিক কাজ করেন না।

নিটিং সেকশন:

ক্রমিকনং	ফ্যাক্টরীর নাম	কর্মরত পুরুষ শ্রমিক	কর্মরত নারী শ্রমিক	মোট কর্মরতশ্রমিক
০১	নিটজোন ফ্যাশন লিমিটেড	২৪১	০০	২৪১
০২	ইয়াতা ডিজাইন সোয়েটার	৭০	০০	৭০

(সূত্র: মাঠ জরিপ)

নিটজোন ফ্যাশন লিমিটেড এ নিটিং সেকশনে ২৪১ জন পুরুষ এবং ইয়াতা ডিজাইন সোয়েটার লিমিটেড এ ৭০ জন পুরুষ কাজ করছেন। এ সেকশনে কোন নারী শ্রমিক কাজ করেন না।

নিটিং কোয়ালিটি লাইট চেকিং :

ক্রমিকনং	ফ্যাক্টরীর নাম	কর্মরত পুরুষ শ্রমিক	কর্মরত নারী শ্রমিক	মোট কর্মরতশ্রমিক
০১	নিটজোন ফ্যাশন লিমিটেড	০২	০৬	০৮
০২	ইয়াতা ডিজাইন সোয়েটার	০১	০০	০১

(সূত্র: মাঠ জরিপ)

নিটজোন ফ্যাশন লিমিটেড এ নিটিং কোয়ালিটি সেকশনে মোট ০৮জন শ্রমিক কাজ করেন। এর মধ্যে ০২ জন পুরুষ এবং ০৬ জন নারী শ্রমিক। ইয়াতা ডিজাইন সোয়েটার লিমিটেড এ ০১ জন পুরুষ কাজ করছেন।

লিংকিং:

ক্রমিকনং	ফ্যাক্টরীর নাম	কর্মরত পুরুষ শ্রমিক	কর্মরত নারী শ্রমিক	মোট কর্মরতশ্রমিক
০১	নিটজোন ফ্যাশন লিমিটেড	৫৮	২২	৮০
০২	ইয়াতা ডিজাইন সোয়েটার	১৫	১৩	২৮

(সূত্র: মাঠ জরিপ)

নিটজোন ফ্যাশন লিমিটেড এ লিংকিং সেকশনে মোট ৮০জন শ্রমিক কাজ করেন। এর মধ্যে ৫৮ জন পুরুষ এবং ২২ জন নারী শ্রমিক। ইয়াতা ডিজাইন সোয়েটার লিমিটেড এ মোট ২৮ জন শ্রমিক কাজ করছেন। এর মধ্যে ১৫জন পুরুষ এবং ১৩জন নারী।

ট্রিমিং:

ক্রমিকনং	ফ্যাক্টরীর নাম	কর্মরত পুরুষ শ্রমিক	কর্মরত নারী শ্রমিক	মোট কর্মরত শ্রমিক
০১	নিটজোন ফ্যাশন লিমিটেড	০০	৩২	৩২
০২	ইয়াতা ডিজাইন সোয়েটার	০০	০৮	০৮

(সূত্র: মাঠ জরিপ)

নিটজোন ফ্যাশন লিমিটেড এ ট্রিমিং সেকশনে মোট ৩২জন শ্রমিক কাজ করছেন। এদের সবাই নারী। ইয়াতা ডিজাইন সোয়েটারে এ সেকশনে মোট ০৮ জন শ্রমিক কাজ করেন। এদেরও সবাই নারী।

মেন্ডিং:

ক্রমিকনং	ফ্যাক্টরীর নাম	কর্মরত পুরুষ শ্রমিক	কর্মরত নারী শ্রমিক	মোট কর্মরত শ্রমিক
০১	নিটজোন ফ্যাশন লিমিটেড	০০	১৮	১৮
০২	ইয়াতা ডিজাইন সোয়েটার	০০	০৩	০৩

(সূত্র: মাঠ জরিপ)

নিটজোন ফ্যাশন লিমিটেড এ মেন্ডিং সেকশনে মোট ১৮জন শ্রমিক কাজ করছেন। এদের সবাই নারী। ইয়াতা ডিজাইন সোয়েটারে এ সেকশনে মোট ০৩ জন শ্রমিক কাজ করেন। এদেরও সবাই নারী।

চূড়ান্ত লাইট চেকিং:

ক্রমিকনং	ফ্যাক্টরীর নাম	কর্মরত পুরুষ শ্রমিক	কর্মরত নারী শ্রমিক	মোট কর্মরত শ্রমিক
০১	নিটজোন ফ্যাশন লিমিটেড	০৩	০০	০৩
০২	ইয়াতা ডিজাইন সোয়েটার	০২	০০	০২

(সূত্র: মাঠ জরিপ)

চূড়ান্ত লাইট চেকিং সেকশনে নিটজোন ফ্যাশন লিমিটেড এ ০৩ জন শ্রমিক কাজ করেন। এদের সবাই পুরুষ। ইয়াতা ডিজাইন সোয়েটার লিমিটেড এ এই সেকশনে মোট ০২ জন শ্রমিক কাজ করেন। এদেরও সবাই পুরুষ।

ওভেন সোয়েটার ফ্যাক্টরীতে মর্যাদাগত স্তরায়ন:

গবেষণাধীন নীটজোন ফ্যাশন লিমিটেড এ মোট ০৬ জন সুপারভাইজার পাওয়া গেছে যাদের ০৪ জন পুরুষ এবং ০২ জন নারী, এ নারী সুপারভাইজার পাওয়া যায় ট্রিমিং এবং মেন্ডিং সেকশনে। ০১ জন ইনচার্জ, ০১ জন পি.এম, ০১ জন জি.এম পাওয়া গেছে যাদের সবাই পুরুষ। ইয়াতা ডিজাইন সোয়েটারে এ মোট ০৩ জন সুপারভাইজার পাওয়া গেছে যাদের সবাই পুরুষ এছাড়াও ০১ জন ইনচার্জ, ০১ জন পি.এম, ০১ জন জি.এম পাওয়া গেছে যাদের সবাই পুরুষ।

নারীর কাজের মুল্যায়ন, নারীর অধ:স্তনতা এবং পুরুষের শ্রেষ্ঠতার মিথ:

উপরে বিভিন্ন গার্মেন্টস্ শিল্পের কিছু কিছু ধাপে নারী ও পুরুষ শ্রমিকের সংখ্যায় ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। যেমন, ডিজাইন/স্কেচ, প্যাটার্ন ডিজাইন, স্যাম্পল মেকিং, মূল্য নির্ধারণ, প্রোডাকশন প্যাটার্ন, স্প্রেডিং/ লে প্লানিং, কাটিং, মার্কিং প্রভৃতি ধাপে পুরুষরা কাজ করছে। কিন্তু সুইং সেকশনে নারী ও পুরুষ উভয়েই কাজ করছে, এখানে পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা বেশি। নারীরা সুইং সেকশনে বেশি কাজ করার কারণ সম্পর্কে একজন তথ্যদাতা গার্মেন্টস কর্মী বলেন, 'নারীরা সুইং সেকশনে কাজ করতে বেশি পছন্দ করে কারণ এখানে বেতন বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। এখান থেকে বেশি পদন্নোতি হয়ে থাকে।' কিন্তু সুইং সেকশন থেকে পদন্নোতি পাওয়ার পর সুপারভাইজার কিংবা লাইন ইনচার্জ হয়েছে এমন নারী শ্রমিকের সংখ্যা খুবই নগণ্য। গবেষণাধীন ফ্যাক্টরিগুলোর মধ্যে ম্যাগপাই টেক্সটাইলের কোয়ালিটি ইনস্পেকশন সেকশনে একজন নারী ও সুইং সেকশনে একজন নারী সুপারভাইজার, মেট্রো নিটিং অ্যান্ড ডাইয়িং মিলস্ এ ফিনিশিং সেকশনে একজন এবং সুইং সেকশনে একজন নারী সুপারভাইজার, নীটজোন ফ্যাশন লিমিটেডএ দুইজন নারী সুপারভাইজার পাওয়া যায়। ডেকো গ্রুপ লিমিটেড এ একজন নারী লাইন ইনচার্জ পেয়েছিলাম। তবে তিনি এ ফ্যাক্টরী প্রতিষ্ঠাকালীন সময় ২০০৩ সাল থেকে লাইন ইনচার্জ হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন। এছাড়া আর কোন উর্ধ্বতন পদে কোন নারী শ্রমিকদের সম্পৃক্ততা পাই নি। তবে সুইং এ কাজটি তুলনামূলকভাবে সহজ হওয়ায় এবং নারীরা সেলাই কাজে পারদর্শী হওয়ার কারণে গার্মেন্টস্ ফ্যাক্টরী কর্তৃপক্ষ নারীদের সুইং সেকশনে বেশি নিয়োগ দেন এবং নারীরাও এ কাজ গুরুত্বের সাথে

করে থাকেন। সুইংয়ে কাপড় তৈরী হয়ে গেলে তা পাঠানো হয় গুণাগুণ যাচাই করার জন্য। গুণাগুণ যাচাইয়েও নারীর সংখ্যার তুলনায় পুরুষরা সংখ্যায় কাজ করছে বেশি। তৈরি পোশাকের গুণাগুণ যাচাইয়ের পর তা ফিনিশিংয়ে পাঠানো হয়। ফিনিশিংয়ের প্রথম ধাপে তৈরিকৃত পোশাক সমূহ একটি মেশিনে ধোলাই করা হয়। তবে এ মেশিনের চালকের স্থানে আছেন পুরুষরা। ধোলাই করার পর তা আবার মেশিনের সাহায্যে শুকিয়ে আয়রন করার জন্য আয়রন সেকশনে পাঠানো হয়। গবেষণাধীন নীটিং গার্মেন্টস্ কারখানাগুলোর আয়রন সেকশনে সবগুলোতেই পুরুষরা কাজ করেন। আয়রন সেকশনে আয়রন চেপে কাপড় মসৃণ করতে শারীরিক শক্তি তুলনামূলকভাবে অন্য সেকশনের কাজের চেয়ে বেশি লাগে। এখানে সারাদিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাজ করতে হয়। আর এ কারণে পুরুষদেরই এ কাজের উপযুক্ত মনে করা হয়। কিন্তু নারীরাও আয়রন মেশিন চালাতে পারে তবে এতে করে সারাদিনের প্রোডাকশনের পরিমাণ কমে যাবে। তাই অধিক পরিমাণে উৎপাদন পাওয়ার তাগিদে এবং কাজে তুলনামূলকভাবে গতিশীলতা আনতে গার্মেন্টস কর্তৃপক্ষ তাদের স্বার্থের কারণে আয়রন সেকশনে পুরুষদের নিয়োগ দিয়ে থাকেন। কাপড় আয়রন সেকশনে মসৃণ করার পর তা আবার ফোল্ডিং সেকশনে প্রেরণ করা হয়। এখানে কিছু কিছু ফ্যাক্টরিতে সব শ্রমিকরাই নারী তবে কিছু কিছু ফ্যাক্টরিতে পুরুষরাও কাজ করছেন তবে সংখ্যায় তারা খুবই নগণ্য। মনে করা হয় নারীরা সব সময় গৃহস্থালির কাজের সাথে জড়িত থাকে। আর তারা ঘর গোছাতেও পটু। এক্ষেত্রে ঘর গোছানোয় কাপড় চোপড় ভাজ করা তাদের কাজের একটি অংশ। কাপড় চোপড় ভাজ করার কাজ নারীরা পুরুষের চাইতে বেশি এবং অনেক দক্ষভাবে করতে পারে। এতে শারীরিক শক্তিও কম দরকার হয়। উৎপাদন বাড়ানোর তাগিদে গার্মেন্টস্ কর্তৃপক্ষ তাই এ কাজে নারীদের নিয়োগ দেন বেশি। প্যাকিং সেকশনে পুরুষরা কাজ করছে। কোন ফ্যাক্টরিতে এ সেকশনে নিয়োজিত নারী শ্রমিক পাওয়া যায় নি। প্যাকিং সেকশনে পুরুষরা সারাদিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাজ করে। এতে যেমন শক্তির দরকার হয় তেমনি দরকার হয় দক্ষতারও। এক্ষেত্রে পুরুষদেরকে বেশি পারদর্শী মনে করা হয়। এ কারণে এ পর্যায়ে শ্রমিকরা সবাই পুরুষ। প্যাকিং এর পর এগুলো কার্টুনজাত করে স্টোরে রাখা হয়। স্টোর থেকে বায়ার বা রিটেইলারদের কাছে হস্তান্তর করা হয়। মাল কার্টুনজাত করে পুরুষ শ্রমিকদের দ্বারা বহন করে স্টোরে নিয়ে যাওয়া হয়। কার্টুনগুলো অনেক বড় এবং ভারী হওয়ায় বহন করতে অনেক পেশি শক্তির দরকার পড়ে যা একমাত্র পুরুষদের দ্বারাই সম্ভব বলে মনে করা হয়। আর এ কারণে পুরুষ শ্রমিকদেরকেই এগুলো বহন করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। এছাড়াও ডে-কেয়ার সেন্টারে শিশুদের লালন পালন ও দেখাশোনা করার জন্য প্রত্যেক ফ্যাক্টরিতে নারীদের দায়িত্ব দেয়া হয়।

এছাড়াও গার্মেন্টস্ শ্রমিকদের মধ্যে যে উচ্চ-ক্রমিকপদমর্যাদা যেমন- হেলপার, অপারেটর, সুপারভাইজার, লাইন চিফ বা লাইন ইনচার্জ, ফ্লোর ইনচার্জ, প্রোডাকশন ম্যানেজার এগুলোর মধ্যে হেলপার পর্যায়ে নারী ও পুরুষ উভয়েই সমান সুযোগ পায়। অপারেটর পর্যায়েও নারী ও পুরুষ শ্রমিক কাজ করে। তবে এখানে নারীর সংখ্যাই বেশি। এ অপারেটর পর্যায় থেকে পদোন্নতি পেয়ে শ্রমিকদের মধ্য থেকেই অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার ভিত্তিতে উপরের স্তর গুলোতে কাজ করার সুযোগ পায়। এ অপারেটর হল সুইং মেশিনের অপারেটর। তবে গবেষণাধীন ফ্যাক্টরিগুলোতে খুব কম সংখ্যক নারীই পদোন্নতি পেয়ে সুপারভাইজার কিংবা তারও উচ্চতম পর্যায়ে নিয়োগ পেয়েছেন। যে দু' একজন পেয়েছেন তাদেরও পদোন্নতির জন্য কর্মস্থল (ফ্যাক্টরী) পরিবর্তন করতে হয়েছে। পাঁচটি গার্মেন্টস্ এবং দুইটি সোয়েটার ফ্যাক্টরীতে মোট ছয়জন নারী সুপারভাইজার পাওয়া গেছে। আর বাকিরা সবাই পুরুষ।

গার্মেন্টস্ শ্রমিক রওশনের মতে,

"সুপারভাইজার হইতে হইলে অনেক ক্ষমতার দরকার হয়, অনেক কঠিন হওয়া লাগে, শ্রমিক গো গালিগালাজ করা শিখতে হয়, তা না অইলে মালের প্রোডাকশন কইমা যাইবো না। আর একজন সুপারভাইজার তো ফ্যাক্টরীর একজন স্টাফ। ফ্যাক্টরীর স্বার্থই তো তার স্বার্থ। এইহানে সুপারভাইজার পুরুষ হওয়ার সুবিধা অইল পুরুষরা অনেক বেশি কঠিন মেজাজের অয়, তারা ওয়ার্কার গো গালিগালাজ কইরা ঠিকই টার্গেটমত কাম আদায়কইরা নেয়। কিন্তু একজন মহিলা সুপারভাইজার এইসব পারব না। আর মহিলা গো কথা কেডাই বা শুনে, তাগো কর্মীরা পাত্তাই দেয় না। যে জায়গায় যারে দরকার তারে হেই জায়গায়ই দেওন উচিত।"

একজন লাইন চিফ কয়েকজন সুপারভাইজার কে নিয়ন্ত্রণে রাখেন। এতে করে তাকে আরও কঠোর হতে হয় কারণ পুরো লাইনের দায়িত্ব ও প্রোডাকশনের টার্গেট তাকে পূরণ করতে হয়। গবেষণাধীন ফ্যাক্টরিগুলোর মাত্র একটিতে একজন নারী লাইন চিফ পাওয়া গেছে। আর বাকীগুলোতে পুরুষদের দায়িত্ব পালন করতে দেখা গেছে। গবেষণাধীন ডেকো গ্রুপ অব কোম্পানি লিমিটেড এ একজন নারী লাইন চিফ পাওয়া গিয়েছিল। তিনি ফ্যাক্টরিটি প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকেই লাইন চিফ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ফ্যাক্টরিটি প্রতিষ্ঠার প্রায় নয় বছর হয়ে যাওয়ার পরও তার আর পদোন্নতি হয় নি। তবে তিনি অনেক কঠোর মন মানসিকতার। তাকে দেখলে শ্রমিকরা অনেকে ভয়ে থাকে। তিনি এখন পর্যন্ত টার্গেট এর কম পরিমাণ মাল জমা দেন নি। এ নারী লাইন চিফের নাম হচ্ছে জোবাইদা বেগম। তার সম্পর্কে ঐ একই ফ্যাক্টরিতে কর্মরত আঞ্জুয়ারা বেগম নামে একজন নারী সুইং মেশিনের অপারেটর বলেন,

"উনি তো খুব ড্যানজারাস মহিলা, পুরাই ব্যাটা মানুষ গো নাগাল ব্যবহার, কেউ টার্গেট মত কাম জমা দিবার না পারলে তারে বকাঝকা তো করেই আরও মহিলা ওর্য়াকারগো গায়ে হাত পর্যন্ত তোলে।"

এখানে নারী লাইন চিফ পুরুষের মত আচরণ করলে তাকে কর্মী সমাজ মেনে নিতে চায় না, কেন নারী ও রকম ড্যানজারাস হবে? কেনইবা সে পুরুষের মত হবে? নারীকে মনে করা হয় কোমল, ধৈর্যশীল, সহনশীল, সে কাউকে বকাঝকা করতে পারার ক্ষমতা রাখে না। কিন্তু পুঁজিবাদের স্বার্থে নারী পুরুষের আচরণ করলে সংশ্লিষ্ট পুঁজিবাদী সংগঠন তাকে বৈধতা দেয়। আবার কখনও কখনও নারীকে তারাই অবদমিত করে এবং নারীত্বের গুণাবলি ধারণ করার কথা বলে, যেমন- বেতন ভাতা বৃদ্ধির দাবিতে নারীরা আন্দোলন করলে এসব প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকেই বলা হয় নারী নারী হয়েই থাকো আন্দোলন তোমাদের মানায় না।

নিটজোন ফ্যাশন লিমিটেড ও ইয়াতা ডিজাইন সোয়েটার ফ্যাক্টরীর নিটিং সেকশনে সবাই পুরুষ। উল্লেখ যে, নিটিং সেকশনে মেশিনের সাহায্যে সোয়েটারের বিভিন্ন অংশ গাথা হয়। এ মেশিনের দুইটি হাতল থাকে। এ হাতল দুইটি দুই হাত দিয়ে ধরে ডানে বামে চালনা করা হয়। এত প্রচুর পরিমাণে পেশি শক্তির প্রয়োজন হয়। সোয়েটার ফ্যাক্টরিতে মজুরি কাজের ধরন এবং উৎপাদনের পরিমাণের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় যে যত বেশি উৎপাদিত পণ্য জমা দিতে পারে সে তত বেশি মজুরি পায়। কিন্তু এ নিটিং অংশে পেশি শক্তি বেশি দরকার হওয়ায় এবং সারাদিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাজ করতে হয় হয় বিধায় পুরুষরাই এ সেকশনে কাজ করে। কিন্তু নারীদের জন্য এ কাজ অনুপযোগী মনে করা হয়। এ বিষয়ে নিটজোন ফ্যাশনে কর্মরত খয়রাত আলী নামে একজন তথ্যদাতা বলেন,

"আমাদের ফ্যাক্টরিতে নিটিং সেকশনে সবাই পুরুষ। কারণ এই কাজ পুরুষরাই করার উপযুক্ত বেশি। মেয়েরা এ কাজে উপযুক্ত না। মেয়েরা অনেক দুর্বল। ওগো গায়ে যে শক্তি আছে সেইটা দিয়া এই কাজ করা সম্ভব হয় না। হইলেও প্রোডাকশন বেশি অইব না। তারা বেতনও কম তুলবার পারব। প্রোডাকশন কম অইলে ফ্যাক্টরীর মালিকের লস অইব না?মেয়ে গো জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত কাজ অইল লিংকিং, ট্রিমিং, মেন্ডিং এর কাজ। এইহানে সুই সুতার কারবার। আর এইহানে শক্তিরও দরকার কম হয়। মেয়ে মানুষতো সুই সুতার কাজ কারবার ভালো পারে। এইজায়গায় আবার পুরুষগো বুদ্ধি ফেল।"

লিংকিং, ট্রিমিং, মেন্ডিংএ বসে এবং কম পরিশ্রম ও শারীরিক শক্তি ব্যয়ে কাজ করতে পারা যায়। তবে লিংকিং সেকশনে নারী ও পুরুষ উভয়েই কাজ করছেন। এ সেকশনে সর্বোচ্চ বেতন তুলেছেন একজন নারী। তার বেতনের পরিমাণ ছিল ৩৫,০০০ টাকা।নিটিং সেকশনে তৈরীকৃত সোয়েটারের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ভূলত্রুটি আছে কিনা যাচাই বাছাই করা হয়। এ গবেষণাধীন ফ্যাক্টরিতে এ যাচাই বাছাই অংশে শুধুমাত্র পুরুষরাই কাজ করছেন। সোয়েটারের বিভিন্ন অংশে গাঁথুনিতে ভুল হয়েছে কিনা, কিংবা কোথাও যদি অনাকাঙ্ক্ষিত ফুটো ধরা পড়ে তাহলে সুই সুতা দিয়ে নারীরা ঐ যাচাই বাছাই করার জায়গায় বসেই মেরামত করেন।

লিংকিং এর পর ট্রিমিং অংশে যাচাই বাছাই করা হয় লিংকিংয়ের কাজের কোন ক্রুটি হয়েছে কিনা কিংবা কোন বাড়তি সুতা বেরিয়ে রয়েছে কিনা। থাকলে তা সুই সুতা দিয়ে নারী কর্মীরা মেরামত করেন। এরপরের ধাপ মেন্ডিং। মেন্ডিং অংশে বিভিন্ন সংযোগ স্থলে কোন ক্রুটি থাকলে কিংবা কোন অনাকাংখিত ফুটো থাকলে তা নারী শ্রমিকরা সুই সুতা দিয়ে মেরামত করেন। গবেষণাধীন ফ্যাক্টরিগুলোতে এ মেন্ডিং অংশের সবাই নারী শ্রমিক। এ কাজ নারীদের দ্বারা বেশি সম্ভব। এ বিষয়ে ইয়াতা ডিজাইন সোয়েটার ফ্যাক্টরীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক আইয়ূব আলী বলেন,

"ট্রিমিং, মেন্ডিং, উইন্ডিং, লিংকিং সেকশনে নারীর কাজের জন্য উপযুক্ত জায়গা। এসব জায়গায় বসে বসে কাজ করতে হয়, গায়ের শক্তি কম লাগে। আর এসব জায়গায় সুইসুতা দিয়ে হাতের কাজ করতে হয় এজন্যই মেয়ে মানুষ এসব কাজের উপযুক্ত।"এসব কারণেই মেয়েরা এই কাজ করে বেশি। আর মেয়েরা যেসব কাজ করে। তা তারা তাড়াতাড়িও করতে পারে।"

তিনি আরও বলেন,

"নিটিং সেকশনে কাজ করতে পেশি শক্তির প্রয়োজন অনেক বেশি। এখানে একজন সারাদিন কাজ করলে বাসায় গিয়ে সে আর অন্য কোন কাজ করতে পারে না। মেয়েরা এ সেকশনে কাজ না করার কারণ হল মেয়েদেরকে একই সাথে চাকরিও করতে হয় আবার বাসায় গিয়ে বাসার যাবতীয় কাজও করতে হয়। তারা যদি এ সেকশনে কাজ করতেন তাহলে বাসায় কাজ করতে পারতেন না। বাসা সামাল দিতেও পারতেন না।

এর পরে আবার চূড়ান্তভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয় লাইট চেকিং এর মাধ্যমে। এখানে চারজন ছেলে অনবরত কাজ করে যাচ্ছেন। এখানে লাইটের উপর তৈরীকৃত সোয়েটার রেখে অনেক সুক্ষ্মভাবে এর মধ্যে অনাকাঙ্ক্ষিত কোন ফুটা আছে কিনা কিংবা কোন গেজ এ ভুল গাঁথুনি হয়েছে কিনা তা ভালোভাবে পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পোশাকগুলো প্যাকিং এর জন্য প্রেরণ করা হয়। তবে প্যাকিং সেকশনে সব পুরুষ শ্রমিকরা কাজ করছে।

উপরের এ বিবরণ থেকে দেখতে পাই যে, শারীরিক শক্তি, দক্ষতা এবং উপর ভিত্তি করে ও দক্ষতা এবং বিচক্ষণতার উপর নির্ভর করে সোয়েটার ফ্যাক্টরিতে শ্রম বিভাজন করা হয়। তবে সব ক্ষেত্রে দক্ষতা এবং বিচক্ষণতাকে বিবেচনা করা হয় উৎপাদনের স্বার্থে। যে মানুষকে দিয়ে যে জায়গায় কাজ করালে স্বল্প সময়ে উৎপাদন সর্বোচ্চ হবে সেই মানুষকে সেই জায়গায় নিয়োগ দেয়া হয়। এক্ষেত্রে নারীরা গৃহস্থালির অভ্যন্তরীণ কাজ যেমন- ঘর গোছানো, সুই সুতা দিয়ে কাপড় চোপড়, বালিশের কভার, কাথা সেলাই, সন্তান লালন পালন প্রভৃতি ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন কাজ করার ফলে দক্ষ হয়ে উঠেছে। কোন মেয়ে সন্তান জন্ম নিলে তাকে নারীদের বিভিন্ন কাজের সাথে যেমন পরিচিতি ঘটিয়ে একজন পূর্ণ নারী হিসেবে গড়ে তোলার প্রক্রিয়া চলে, ফলে নারীর জন্য কিছু কাজ নির্ধারিত হয়ে যায়। আর স্বভাবতই সে এসব কাজে দক্ষতা প্রমাণ

করতে পারে। দক্ষ লোক দিয়ে কাজ করালে কাজ ভালো হয় এবং সময়ও কম লাগে। যেকারণেই নারীকে গার্মেন্টস্ ফ্যাক্টরীর বিভিন্ন কাজে যেমন গৃহস্থালির কাজের সাথে সদৃশ সেলাই, কাপড় চোপড় ভাজ করা, গার্মেন্টসের মেঝে ঝাড়ু দেওয়া, ময়লা পরিষ্কার করা, কাপড়ের ঝুট কুড়ানো, ডে কেয়ার সেন্টারে সন্তান লালন পালনের জন্য নারীকে নিয়োগ দেওয়া, সুই সুতা দিয়ে কাপড়ের ছিদ্র মেরামত করা প্রভৃতি কাজে সম্পৃক্ত করার প্রক্রিয়া চলে। গৃহস্থালির কাজের সদৃশ কাজের সাথে সম্পৃক্ত রেখে নারীর যে সত্তার নির্মাণ করা হয়, যেখানে শারীরিক শক্তি, শারীরিক গঠন, তার জৈবিক কাজ ইত্যাদিকে বেশি প্রধান্য দেয়া হয়। গৃহস্থালির বাইরেও ফ্যাক্টরীর গন্ডিতে তাদের এসব কাজের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়। তবে এখানে পুঁজিবাদের স্বার্থ অনেক বেশি ক্রিয়াশীল থাকে। যেখানে কম সময়ে অধিক উৎপাদন এবং অধিক মুনাফা অর্জনই থাকে মূল লক্ষ্য। এখানেও নারীর গৃহস্থালির অধ:স্তন অবস্থা ফুটে ওঠে। পক্ষান্তরে পুরুষ সংক্রান্ত যে শ্রেষ্ঠতার মিথ তা প্রতিষ্ঠিতই থেকে যায়।

উপরের এ বিবরণ থেকে দেখতে পাই যে,নারীর কাজের মুল্যায়ন ও অধ:স্তনতাকে পুঁজিবাদ বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আবার পুরুষের দায়-দায়িত্ব যেমন, পুরুষ দায়িত্ব পালনে অনেক বেশি পারদর্শী, পুরুষ শারীরিক দিক দিয়ে বলীয়ান এবং পুরুষ সব সময় বিভিন্ন কাজে নেতৃত্ব দেওয়ার কারণে তার কাজ গৃহস্থালির বাইরেই বেশি থাকে। পুরুষরা হয় অনেক বেশি ব্যবস্থাপনা গুণ সম্পন্ন। এসব মিথের উপর ভিত্তি করে পুরুষদেরকে এমন সব কাজ যেমন, সুপারভাইজার, লাইন ইনচার্জ, ফ্লোর ইনচার্জ, প্রোডাকশন ম্যানেজার প্রভৃতির দায় দায়িত্ব দেওয়া হয়। এসব দায় দায়িত্ব সম্পর্কিত মিথগুলো বাস্তবের ব্যবস্থাপনাকে দৃঢ় করে আর ব্যবস্থাপনা তখন মিথকেই পুনঃস্থাপন করে ফলতঃ লিঙ্গীয় শ্রম বিভাজন প্রায় 'প্রাকৃতিক' হয়ে দাঁড়ায়। যা পুরুষের শ্রেষ্ঠত্বকেই প্রকাশ করতে সহায়ক হয়।

উপসংহারঃ

পোশাক কারখানায় লিঙ্গীয় শ্রম বিভাজনে এটা স্পষ্ট যে পুঁজিবাদ তার নিজ প্রয়োজনে নারী ও পুরুষের শারীরিক সক্ষমতা অনুযায়ী শ্রমের বিন্যাস করছে। এ বিন্যাসের মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন নারী ও পুরুষের প্রচলিত সত্তা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছে অন্যদিকে গৃহ পরিসরের বাইরে নারীদের কাজের সুযোগ তৈরী হওয়ার দরুন নারীরা গৃহস্থালীর বাইরে এসে উৎপাদনমুখী কাজে নিয়োজিত হচ্ছে। ফলে নারীত্বের প্রচলিত বৈশিষ্ট্যের নির্মাণ প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যায়। বস্তুতঃ 'নারীত্ব' ও 'পৌরুষের' ধারণা একটি নির্মাণ মাত্র। শুধু যে পুরুষরাই পৌরুষকে ধারণ করবে তা চিরন্তন নয় একজন শ্রমজীবী নারী কিংবা একজন নারী পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী এবং ক্ষেত্র বিশেষে এ পৌরুষকে ধারণ করতে পারে। অপর পক্ষে নারীর যে সামাজিক গুণাবলি সেটাও একজন পুরুষ ক্ষেত্র বিশেষে ধারণ করে। এটাও চিরন্তন নারীর অধিকারী কোন বিষয় নয়।

সহায়ক তথ্যপঞ্জী

Boserup, Easter (1970), Women's Role in Economic Development, St. Martin Press : New York.

Brown, Radcliffe (1940) , `On Social structure in Structure and Function in Primitive Society" Cohen and West London Press : London.

Cornwall, Andrea and Nancy Lindisfrane (1996), "Dislocating Masculinity : Gender, Power and Anthropology" in Dislocating masculinities : Comparative ethnographies (eds.), USA: Routledge.

Durkheim, E (1968)," Rules of Sociological Method and Division of Labor in Society", The Free Press : New York.

Firestone, Shulamith (1970), "The Dialectic of Sex", Bantam Books : New York.

Islam, Farzana (2004),"Women, Employment and Family : Poor Informal Sector Women Workers in Dhaka city", University of Sussex.

Kabeer, Naila (1991), "Cultural Dopes or Rational Fools? Women and Labor Supply in Bangladesh Garments Industry", The European Journal of Development Research, 3(1) : pg (13-160).

Kabeer, Naila (1995), "Reversed Realities Gender Hierarchies in Development Thought", University Press Ltd. Dhaka.

Ortner, Sherry (1974), "Is Female to Male as Nature is to culture?" In Rosaldo and L. Lamphere (eds.) Women Culture and Society (pg: 67-88), Stanford University Press, Stanford.

Ortner, Sherry and Whitehead, Harriet (eds.) [1981], "Sexual Meaning : The Cultural construction of Gender and Sexuality", Cambridge University Press : Cambridge.

Standing, Hilary (Edited by Helal Ashrafy)," Dependency and Autonomy: women's employment and the family in Calcutta," London and New York.

Tong, Rosemarie (1989), "Feminist Thought: A Comprehensive Introduction", Westview Press: UK.

White, Sarah C. (1992) Arguing with the Crocodile: Gender and Class inBangladesh, Dhaka: University Press Limited.

Wollstonecraft, Marry (1975)[1792], "A vindication of the rights of woman with stricture on political and moral Subjects". England: Penguin Books.

ফ্রেডরিখ, এঙ্গেলস্ (১৮৯১).পরিবার ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো ।

রহমান, শাহীন (২০০৭) জেন্ডার প্রসঙ্গ, স্টেপস টুয়ার্ড ডেভলপমেন্ট : ঢাকা ।

হোসেন, সেলিনা (২০০৮) জেন্ডার বিশ্বকোষ ।

ISSN 1605 - 7023

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা
পঞ্চদশ বর্ষ সংখ্যা
১৪২২ বঙ্গাব্দ/২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে নারী নির্যাতন (১৯২০-১৯৭১)

রাকিবা সুলতানা রত্না*

Abstract: *Women repression and gender discrimination is current in all societies irrespective of developed and developing. Women are victim of repression and discrimination everywhere - family, society, state, workplace, political movement. In the last one century, the situation of women changed positively. Women have progressed in political, economic, social, family sectors and we have seen the renaissance of women. Women are taking part in different campaigns, movements, battles though, at the same time, are being repressed. They have both direct and indirect contribution in the political development of a country. But, that is not written in the pages of history with importance. Women fought fatal battle in demanding the rights of the unified India, social freedom and exploitation. They went to jail, sacrificed lives, and even fought in the disguise of men. After the partition of India, women of this country had a great partnership in independent Pakistan, State Language Movement, Communality Prevention Movement, Anti-Ayub Khan Movement, education and cultural movement, 6 points, 11 points and above all the liberation war of 1971. Women fought with arms in hand at the same time tortured in all these movements. But, due to patriarchal mentality, women have been neglected in the history. The heroism of women, the subject of their struggle, the story of unkind repression did not find much place in the compositions of the historians. It is our duty to uphold the contribution and history of repression of those women whose contribution has paved the path of today's women - the paper aims at telling the role of women, participation, the obstacle and torture they have undergone in the socio-economic condition of Bangladesh so as to enable new generation know their contribution.*

ভূমিকাঃ

প্রাচীনকাল থেকেই এদেশের নারী সমাজ উপেক্ষিত। ধর্ম ও সামাজিক রীতিনীতিতে নারী সমাজের জন্য সব সময়ই অধস্তনের ভূমিকা নির্ধারিত। কিন্তু এই অধস্তনরত অবস্থায়ই নারী সমাজ ঘরে বসে থাকেনি। তারা বিভিন্ন আন্দোলন অভ্যুত্থানে বীরত্বের সাথে অংশগ্রহণ করেছে। বিভিন্ন আন্দোলন অভ্যুত্থানে ভয়াবহ নির্যাতনের শিকারও হতে হয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ঐতিহাসিক পটভূমিকায় যে দীর্ঘ মুক্তি

* প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

সংগ্রামের ইতিহাস সেখানে নারীর ভূমিকা গৌণ করে দেখার অবকাশ নেই। এই ইতিহাসের আলোয় ভাস্বর নারী কখনো মাঠে পথে সংগ্রাম, কখনো আত্মস্বার্থত্যাগী, কখনো আত্মউৎসর্গকারী, কখনো নির্যাতিতা।

অবিভক্ত ভারতবর্ষের শোষিত মানুষের ন্যায্য অধিকার আদায়, সামাজিক অবরোধমুক্তি ও শোষণের বিরুদ্ধে জীবন বাজি রেখেছেন লড়েছেন নারীরা। তাঁরা জেলে গেছেন একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, তারা জেলে অমানবিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। অনেকে নির্যাতনের ফলে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। "রাষ্ট গঠনে, সমাজ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রক্ষমতায় দক্ষতা প্রদর্শণে, প্রশাসনিক কর্মকুশলতায়, শিক্ষা ক্ষেত্রে, পরিবারের দায়িত্ব পালনে, রাজনীতিতে, সংগঠনে, আন্দোলনে, মুক্তিযুদ্ধে নারীকে যে মূল্য দিতে হয়েছে তা ইতিহাসে, সাহিত্যে স্বীকৃতিতে অদৃশ্য রয়ে গেছে। বাংলার নারী নির্যাতিত, নিপীড়িত, বঞ্চিত ও শোষিত, যুগ যুগ ধরে এদেশের সমাজ কাঠামোর মধ্যে নারী শোষণ নির্যাতন ও বঞ্চনার শিকার হয়েছে"।[১]

শুধু বাংলাদেশের ক্ষেত্রেই নয়, দেশে দেশে ঘটে যাওয়া যুদ্ধেও নারীরাই সবচাইতে বেশি নিপীড়িত হয়েছেন। "দু'টি বিশ্ব যুদ্ধে জার্মানি, রাশিয়া, চীন ও আর্মেনিয়ার নারী নির্যাতনের রূপ ছিল ভয়াবহ। ঐ সময়ে বন্দি নারীদের ওপর জাপানিদের ভয়ঙ্কর যৌন নির্যাতন এবং ভিয়েতনামে নারীদের উপর আমেরিকানদের বর্বরতা সবাইকে শিহরিত করেছে"।[২]

আধুনিক ইতিহাস পাঠে ব্রিটিশ শাসনামলের বাংলার শেষ দিকে এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা-উত্তরকালে তেভাগা, নানকার, টংক প্রভৃতি সংগ্রামে নারী সমাজের অংশগ্রহণ ছিল স্বতস্ফূর্ত। অনেক অঞ্চলে নারী পুরুষ নির্বিশেষে পুরো গ্রামীণ জনপদ জেগে উঠেছিল যুগান্তরের শোষণ, অত্যাচার ও বঞ্চনার প্রতিবাদে। এই প্রতিবাদ করতে গিয়েই নারীরা নির্যাতিত হয়েছেন। আবার অনেক ক্ষেত্রেই নারীর উপরও কোন কারণ ছাড়া নির্যাতন চালানো হয়েছে। বর্তমান অধ্যায়ে বিভিন্ন আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণ ও নির্যাতনের কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরার প্রয়াস রাখা হবে। কিন্তু এটি সহজেই অনুধাবনযোগ্য যে, এই গুটি কয়েক দৃষ্টান্তের বাইরে বহু অজানা তথ্য রয়েছে যে বিষয়ে গভীর ও সময় সাপেক্ষ গবেষণা আবশ্যক।

তাত্ত্বিক কাঠামোঃ

❖ নির্যাতন এর সংজ্ঞা

বর্তমান গবেষণায় ১৯৭১ এর নারী নির্যাতন বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে। তাই নির্যাতন এর সংজ্ঞা এবং তাত্ত্বিক ধারণা জানা আবশ্যক। নির্যাতনে দুটি পক্ষ থাকে; একটি নির্যাতন করে অপরজন নির্যাতিত হয়। নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে পুরুষ নির্যাতন করে এবং নারী নির্যাতনের শিকার হয়। নারী নির্যাতন বলতে নারীদের উপর দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় যে কোন ধরনের নির্যাতনকে বোঝানো

হয়। নারীদের যে কোন অধিকার খর্ব করা, হরণ করা এবং নারীর ইচছার বিরুদ্ধে তার উপর কোন বিষয় চাপিয়ে দেওয়া বা নারীকে কোন কিছু করতে বাধ্য করার নাম নারী নির্যাতন। বাংলাদেশে নারী নির্যাতন গৃহের অভ্যন্তর হতে শুরু করে গৃহের বাইরে সর্বত্রই দেখা যায়। নারী নির্যাতন বলতে মানুষ হিসেবে নারীকে যথার্থ মূল্যায়ন না করাও বোঝানো হয়। নারীকে হেয় করে দেখা, অবহেলা করা, কুদৃষ্টি, শরীর নিয়ে কটূক্তি ইত্যাদি যা মানুষ হিসেবে নারীর অধিকার থেকে বঞ্চিত করাকে বোঝানো হয়।

Beijing Platform for Action- এ নারী নির্যাতনের সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে এভাবে-

"The Term violence against women means any act of gender based violence that results in or is likely to result in physical, sexual or physiological harm or suffering to woman including threats of such acts coercion or arbithary deprivation of liberty whether occurring in public or private life."[৩]

সুতরাং বলা যায়, নারী নির্যাতন বলতে এমন যে কোন কাজ বা আচরণকে বোঝায় যা নারীর বিরুদ্ধে সংঘটিত করা হয় এবং যা নারীর শারীরিক ও মনস্তাত্ত্বিক ক্ষতি সাধন করে। এছাড়াও কোন ক্ষতি সাধনের হুমকি অথবা ব্যক্তিগত জীবনে নারীর স্বাধীনতা হরণকেও বোঝানো হয়। দৈহিক নির্যাতনের অন্তর্গত বিষয় হচ্ছেঃ

- পরিবারের অভ্যন্তরে শারীরিক বা যৌন অথবা মনস্তাত্ত্বিক নির্যাতন, যেমন- প্রহার, কণ্যাশিশুর ওপর যৌন নিগ্রহ, যৌতুক সংক্রান্ত নির্যাতন এবং অন্যান্য প্রথাগত যন্ত্রনাদায়ক রীতি, স্বামী ব্যতিত অন্য কোন ব্যক্তি দ্বারা নির্যাতন এবং নারীকে কোন কাজে অন্যায়ভাবে ব্যবহার করানো।
- সমাজের মধ্যে নারীর প্রতি শারীরিক, যৌন অথবা মনস্তাত্ত্বিক নির্যাতন যেমন- ধর্ষণ, যৌন নিগ্রহ, যৌন হয়রানি এবং কর্মক্ষেত্রে বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভীতি প্রদর্শন, নারী অপহরণ এবং জোরপূর্বক পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করানো।
- নারীর প্রতি সহিংস আচরণ বা নারী নির্যাতন বলতে সশস্ত্র সংঘাতের সময় হত্যা, পরিকল্পিত ধর্ষণ, যৌন-দাসত্ব এবং জোরপূর্বক গর্ভধারনও বোঝায়। যা ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি সৈন্য কর্তৃক বাংলার নারীদের প্রতি সংগঠিত হয়েছে।

এক গবেষনায় নারী নির্যাতনকে নিম্নোক্তভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

"Violence against women is not just an assault against an individual but against women's personhood, mental or physical integrity or even freedom of movement on account of their gender. It is clearly based on

the unequal power relation's between men and woman underlying which is the patriarchal social structure that is constructed, reinforced and perpetuated by socio-political institutions put in place by men and which thereby, ensure that men, by virtue of their gender have power and control over women and children. Therefore, violence against women in well defined as any act of gender based violence that results or is likely to result in physical, sexual, psychological harm or suffering to women including threats of such acts. coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether, occurring in public or private life".[০৪]

কাউন্সিল অব ইউরোপ (১৯৮৬) এর মতে, নির্যাতন মানে এমন কোন আচরণ যা কোন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশে অন্তরায় সৃষ্টি করে তার শারীরিক ও মনস্তাত্ত্বিক অখন্ডতা, ন্যায়পরায়নতা, স্বাধীনতা তথা জীবনের উপর আঘাত হানে কিংবা অনিষ্ট সাধন করে।

প্যাসিফিক এশিয়ান উইমেন ফোরাম (PAWF) নারী নির্যাতন বিষয়ক আলোচনা সহিংসতাকে সেভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন তা হল, 'কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ওপর অন্য কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর হুমকি বা বল প্রয়োগের মাধ্যমে ইচ্ছানুসারে কাজ করানো'।[০৫]

প্যান আমেরিকান খসড়া চুক্তিতে বলা হয়েছে নারীর প্রতি সহিংসতা হলো এমন কোন আচরণ যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শারীরিক, জৈবিক ও মানসিক সামর্থ হ্রাস করতে অথবা আত্নসম্মান যন্ত্রনার উদ্রেক করে। প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, হুমকি প্রদান, বল প্রয়োগ কিংবা অন্য কোন উপায়ে কোন নারীকে আতঙ্কিত করতে, শাস্তি দিতে, অপমানিত করতে তার শারীরিক ও মানসিক সামর্থ হ্রাস করতে অথবা আত্নসম্মানবোধ ও শরীরের উপর আত্ননিয়ন্ত্রনাধিকার প্রতিষ্ঠা এবং মানবিক মর্যাদা উপেক্ষা করে ছক বাধা নিয়মে জীবন পরিচালিত করতে বাধ্য করে। নারীর প্রতি সহিংসতা বিলোপ সংক্রান্ত জাতিসংঘ ঘোষনায় (১৯৯৩) সহিংসতাকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, দৈহিক, জৈবিক মনস্তাত্ত্বিকভাবে নারীর ক্ষতি সাধন করে কিংবা করতে পারে এবং নারীকে এর অবাধ স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করে এমন কোন আচরণ, ভীতি প্রদর্শন, কিংবা বল প্রয়োগের ঘটনা তা ব্যক্তি জীবন অথবা মনজীবন যাকেই প্রভাবিত করুক না কেন তাই নারীর প্রতি সহিংসতা। উক্ত ঘোষণায় নারীর প্রতি সহিংসতাকে নিম্নলিখিত ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে:

- পরিবার ও কমিউনিটিতে নারীর প্রতি যে সকল ক্ষেত্রে সহিংসতার ঘটনা ঘটে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে শারীরিক ও মানসিকভাবে আঘাত করা, নারী ও কণ্যা শিশুর প্রতি অশ্রাব্য ভাষার প্রয়োগ। যৌতুক সংক্রান্ত নির্যাতন, বৈবাহিক জীবনে ধর্ষণ, জননেন্দ্রিয় ছেদন সহ অন্যান্য ক্ষতিকারক প্রথাগত ঐতিহাসিক বিষয়সমূহ।

- স্বামী বা স্ত্রী ব্যতিত পরিবারের অন্য কোন সদস্য কর্তৃক নির্যাতিত।
- শোষণ ও বৈষম্য সংক্রান্ত নির্যাতন।
- কর্মস্থলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ সর্বত্র যৌন পীড়ন ও ভীতি প্রদর্শন।
- নারী পাচার।
- বলপূর্বক পতিতবৃত্তিতে নিয়োগ।
- রাষ্ট্র-সৃষ্ট সন্ত্রাস।[৩৬]

১৯৮০ সালের দন্ডবিধি আইন নির্যাতনের সংজ্ঞায়িত করেছে অপরাধপ্রবণ শক্তি হিসেবে যা ইচ্ছাকৃতভাবে অপরকে ক্ষতি করায় উদ্দেশ্য ব্যবহৃত হয়। সুতরাং নারীর প্রতি সহিংসতাকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়। পারিবারিক বা সামাজিক জীবনে যে কোন ধরনের শারীরিক মানসিক বা যৌন নির্যাতন বা নির্যাতনের হুমকি, কেবলমাত্র নারী বলেই যার সম্মুখীন হতে হয় এবং যার ফলে ব্যহত হয় সুস্থ স্বাধীন ও স্বাভাবিক জীবন যাত্রা।

❖ নারী নির্যাতনের ধরণ

নারী নির্যাতনের ধরণ বহুমাতৃক। বাংলাদেশের পারিবারিক ও সামাজিক ব্যবস্থায় ধর্মীয় অপব্যাখ্যা, সামাজিক কুসংস্কার, রীতিনীতি, বিধিবিধান ও বৈষম্যের বেড়াজালে নারীকে সবসময় রাখা হয়েছে পিছনের সারিতে। নারীর মেধা ও শ্রম শক্তিকে শুধু পারিবারিক কাজ ও পুরুষের সেবার কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। ব্যক্তিগত বিকাশ, সমাজ ও দেশ গঠনে নারীকে ব্যবহার করা হয়নি। উপরোক্ত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন ও বৈষম্যের মাধ্যমে নারীর বর্তমান সম্ভাবনাকেও ধ্বংস করা হয়েছে। উন্নত ও উন্নয়নশীল সামাজিক-সাংস্কৃতিক পার্থক্যভেদে নারী নির্যাতনের ধরনের পার্থক্য থাকলেও প্রতিটি সমাজেই এক্ষেত্রে কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। এদিক বিবেচনায় বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের ধরন উন্নয়নশীল সমাজসহ উন্নত সমাজের চিত্রও কিছুটা তুলে ধরতে সক্ষম হবে। বাংলাদেশের নারী নির্যাতনের আরেকটি চিত্র দেখা যায় ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে। নিম্নে ১৯৭১-এ বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের বিভিন্ন ধরন আলোচনা করা হল।

❖ শারীরিক নির্যাতন

নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে সহজ ও বহুল প্রচলিত রূপটি হচ্ছে শারীরিক নির্যাতন। শারীরিক নির্যাতন হল এমন ধরনের নির্যাতন, যা নারীর শরীর কে আক্রমণ করে এবং এমন কোন আক্রমন যা নারীর শরীরের জন্য ক্ষতিকর। যার ফলে ছোট বা বড় ধরনের ক্ষত, এমনকি যার ফলে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে।

"১৯৭১ সালে নারী বিভিন্ন ভাবে শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়। সৈন্যরা নারীর নগ্নদেহে বেত দ্বারা আঘাত করতো। শুধু বেতের আঘাতই নয়, লাথি, কিল, চর, মাথা থেকে টেনে গোছা শুদ্ধ চুল উপড়ে তুলত, মাটিতে ফেলে পা চেপে রাখত। বেয়নেটের খোঁচায় দেহের বিভিন্ন অংশ ক্ষত-বিক্ষত করত। এছাড়াও হাজার পাওয়ারের ইলেকট্রিক বাল্ব চোখের ওপরে ধরা, প্রতিটি আঙ্গুলের মাথায় সুচ ঢুকিয়ে দেওয়াসহ অসহনীয় অত্যাচার করা হত নারীদের ওপর"।[০৭]

১৯৭১ এ শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছিল পুরুষরাও। "তারা পুরুষদের নির্মম ভাবে চাবুক দিয়ে পিটিয়ে ক্ষত-বিক্ষত করে সিগারেটের আগুন লাগিয়ে দিত, পরে হাত-পা বেঁধে ওয়াগানের মধ্যে দু'চার দিন আবদ্ধ করে রাখত। এরপরও যদি প্রাণ না যেত তাহলে ফেলে দিত নদীতে। এছাড়াও পানিতে দাড় করিয়েও গুলি করা হত। এমনকি ইঞ্জিনের বয়লারে জ্যান্ত মানুষকে ঢুকিয়ে দিত"।[০৮]

❖ শ্লীলতাহানি

মুক্তিযুদ্ধে অনেক নারীর শ্লীলতাহানি করা হয়েছে। তাই আলোচনার ব্যাপকতা বুঝতে শ্লীলতাহানি কি সেটা জানা আবশ্যক। শ্লীল কথাটির আভিধানিক অর্থ- বিনয়, ভদ্র, শিষ্ট, রুচিসম্মত। কিন্তু শ্লীলতাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে সমাজের প্রভাবশালী গোষ্ঠী নারী নির্যাতন করে।

"মুক্তিযুদ্ধে বাংলার অসংখ্য নারীর শ্লীলতাহানি করা হয়েছে। বগুড়া শহরে এক কিশোরী এস.এস.সি পরীক্ষা দেওয়ার জন্য এলে পাক-সৈন্যরা রাস্তা থেকে তাকে তুলে তাদের শিবিরে নিয়ে যায়। তার শ্লীলতাহানির পর পরদিন তাকে মুমুর্ষ অবস্থায় ফেরত দেয়"।[০৯]

নওগাঁ মহকুমার আতাইকুলা গ্রামে বর্বর পাকসেনারা আকস্মিক ভাবে প্রবেশ করে ব্যাপক হত্যাকান্ডের পর ৫০ জন গৃহবধু কে এক স্থানে বন্দি করে রেখে তাদের অধিকাংশের উপর শ্লীলতাহানি করে। অতঃপর গ্রামটি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়।[১০]

পাকসেনারা রাজশাহীর বাঁশবাড়িয়া গ্রামে দেড়'শ মা-বোনকে ঘর থেকে টেনে বের করে প্রকাশ্যে লাঞ্ছিত করে। এদের মধ্যে দশজন ঘটনাস্থলেই মারা যায়।[১১]

দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও নানাভাবে নানা জায়গায় শ্লীলতাহানি করা হয়। নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে শ্লীলতাহানি বিষয়টি বেশ প্রচলিত। শ্লীলতাহানি বলতে সমাজকে অভদ্রতা, অশোভন, কুরুচি থেকে রক্ষার কথা বলা হলেও এর অন্তরালে মূল লক্ষ হচ্ছে নারীদের গৃহবন্দি করে নির্যাতন করা।

❖ নারী পাচার

মুক্তিযুদ্ধকালে অসংখ্য নারীদেরকে দেশের অভ্যন্তরে পাচার করা হয়েছে। আবার দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও অনেক নারী পরিবার ও সমাজ কর্তৃক অপমানিত হয়ে পাশ্ববর্তী

দেশ ভারত ও পাকিস্তানে পাড়ি জমায়। গবেষণার বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের স্বার্থে এখানে নারী পাচার সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

"নারী পাচার নারী নির্যাতনের অন্যতম একটি ধরন। এদেশে প্রতি মাসে চারশত কিশোরী পাচারের শিকার হচেছ যাদের বাকি জীবন কাটে যৌনকর্মী হিসেবে। এদেশের কিশোরীরা জীবনের শুরু থেকেই নানা বৈষম্যের শিকার হয়। এ ছাড়াও অপ্রাপ্ত বয়সে বিয়ে, সন্তান ধারণ, মাতৃত্বজনিত কারণে অধিক মৃত্যুহার অথবা পুষ্টিহীনতা ইত্যাদি ঘটে থাকে। পাচারকৃত নারীদেরকে সাধারণত যৌনকর্মী হিসেবে ব্যবহার করা হয়। দরিদ্র নারীদের শহরে চাকরী প্রদান, বিদেশে কাজের প্রলোভন, অতিরিক্ত আয়ের সুযোগের কথা বলে পাচার করা হয়। দেশে শক্তিশালী নেটওয়ার্কের মাধ্যমে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সীমান্ত এলাকা দিয়ে নারী পাচার অধিকহারে হয়ে থাকে"।[১২]

"দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সুন্দরী নারীদের পাচার করা হত ঢাকা ও অন্যান্য স্থানে সেনা অফিসারদের মনোরঞ্জনের জন্য। যেমন ঃ 'রংপুর থেকে ৩০০/৪০০ জন সুন্দরী মহিলাকে ঢাকা ও অন্যান্য স্থানে খানসেনা অফিসারদের মনোরঞ্জনের জন্য পাচার করে দেওয়া হয়েছিল। যাদের খোঁজ পরে আর পাওয়া যায়নি"।[১৩]

"৩০ মার্চ ১৯৭১ মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসের কর্মচারী হারেছ উদ্দিন পাক হানাদের হাতে গ্রেফতার হয়ে দীর্ঘ ১৪ দিন যশোর ক্যান্টনমেন্টে পাক বাহিনীর জল্লাদের দ্বারা অমানুষিকভাবে নির্যাতিত হন এবং তার কাছ থেকে তৎকালীন ক্যান্টনমেন্টে অবস্থানরত সামরিক বাহিনীর বাঙালি কর্মচারীদের পরিবারের একটি বন্দি শিবিরের সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি জানান, ৫৫ নং ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারির ফ্যামিলি কোয়ার্টারে ১২ থেকে ৫০ বছর বয়সের ২৯৫ জন নারীকে আটকে রেখে প্রতি রাতে তাদের উপর পাশবিক অত্যাচার চালাত। প্রতিদিন বিকালে একজন সুবেদার এসে এসব মেয়েরা কে কোথায় যাবে তার একটি তালিকা প্রস্তুত করত। অতঃপর সন্ধ্যা হলে উক্ত তালিকা মোতাবেক নির্ধারিত মেয়েটিকে নির্ধারিত স্থানে পাচার করা হত"।[১৪]

"তিনি আরও বলেন বন্দি শিবিরে মহিলাদেরকে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করে রাখা হত। প্রথম ভাগে যুবতী, দ্বিতীয় ভাগে মধ্য বয়সী, এবং তৃতীয় ভাগে কয়েক জন সন্তানের মাতা। স্কুল কলেজের সুন্দরী মেয়েদের প্লেনে করে ঢাকায় পাচার করা হত"।[১৫]

❖ প্রত্যখ্যাত রাষ্ট্র পাকিস্তান কর্তৃক নির্যাতন

নারী নির্যাতনে আরো একটি বিষয় সূক্ষ্মভাবে লক্ষ করলে দেখা যায় রাষ্ট্র কীভাবে নারী নির্যাতনে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। রাষ্ট্রীয় নীতিমালা, রাষ্ট্রীয় আইন, রাষ্ট্রের প্রশাসনযন্ত্র ও সবকিছুই নিয়ন্ত্রন করছে পুরুষ। এমনকি আইন পরিষদে নারীর সংখ্যা

এত কম যে, রাষ্ট্রের প্রতিটি বিষয়ে একক আধিপত্য পুরুষদের। দেশের অর্ধেক মানুষ নারী হলেও নীতি প্রণয়ন করে পুরুষরা। তাই নির্যাতিত হতে হয় নারীদের।

১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানে গণহত্যা ও নারী নির্যাতন ছিল একধরনের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস। বাঙালী জাতিসত্তা ধ্বংস করতে সশস্ত্র অভিযান (অপারেশন সার্চলাইট) পরিচালনা করে পশ্চিম পাকিস্তান। "২৫শে মার্চের মধ্য রাত থেকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী শুরু করে তাদের সু-পরিকল্পিত বাঙালি জাতিসত্তা ধ্বংসের সশস্ত্র আগ্রাসী পর্ব। ইয়াহিয়ার নির্দেশে নয়মাসের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ত্রিশ লক্ষ বাঙালিকে হত্যা করা হয় এবং চার লক্ষ নারী ধর্ষিত হয়। এই বিপুল সংখ্যক নারীদেরকে গর্ভবতী করার জন্য ইসলামাবাদের নির্দেশ ছিল। এর পিছনে মৌলিক যুক্তিটি ছিল যে এর মাধ্যমে বাঙালি জাতির অখন্ড জাতিসত্তা বিনষ্ট হবে। যা কিনা বাঙালির গর্ব"।[১৬]

❖ সংগঠন কর্তৃক নির্যাতন

সামাজিক সংগঠন দ্বারা নারী নির্যাতিত হয়ে থাকে। বিভিন্ন মৌলবাদি রাজনৈতিক দল তাদের কায়েমি স্বার্থ আদায়ের জন্য নারী সমাজের ওপর নির্যাতন চালায়। ধর্মীয় সংগঠনের অহেতুক নিয়ন্ত্রন আরোপ রাজনীতি, প্রশাসন অর্থনীতিসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। মাথায় ঘোমটা দেওয়া, রাস্তায় মহিলা পুলিশের বিরোধিতা প্রভৃতি তুচ্ছ থেকে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মৌলবাদী রাজনৈতিক সংগঠন কর্তৃক নারীরা নির্যাতিত হয়।

"পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক ১৯৭১ সালের নারী নির্যাতন, সংগঠন কর্তৃক নির্যাতনের একটি অন্যতম উদাহরণ। যারা মুক্তিযুদ্ধ কালে নয় মাস বাংলার নারী, পুরুষ, শিশু ও বৃদ্ধা সকল ধর্ম, পেশা ও শ্রেণির মানুষের উপর নির্যাতন চালায়। ধর্ম ভিত্তিক সংগঠন রাজাকার, আলবদর, আলশামস পাকিস্তানি সৈন্যদের সহায়তা করে। তারা বিভিন্ন গ্রামে অগ্নিসংযোগ, লুট এবং নারী নির্যাতন চালায়।

খুলনা জেলার বাগেরহাট থানায় পাকসেনাদের চেয়ে রাজাকাররাই বেশি অত্যাচার চালায়। খুলনার রাধাবল্লভ গ্রাম থেকে মেয়েদের ধরে নিয়ে এসে সারারাত পাশবিক অত্যাচার চালিয়ে দিনের বেলা গুলি করে হত্যা করে রাস্তায় ফেলে রেখে যেত। রাজাকাররা গ্রাম থেকে গ্রামান্তর ব্যাপকভাবে মেয়েদেরকে ধরে এনে পাকসেনাদের হাতে তুলে দিত"।[১৭]

❖ বিভিন্ন আন্দোলনে নারী নির্যাতন

বিভিন্ন আন্দোলনে নারী নির্যাতনের দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হলোঃ

অসহযোগ আন্দোলনে নারী নির্যাতন

"১৯২০ সালের অসহযোগ আন্দোলনে নারী সমাজের উল্লেখযোগ্য প্রতিনিধিত্ব ছিল। এ সময় মেয়েরা বৃটিশ পণ্য বর্জনের লক্ষ্যে চরকা দিয়ে সুতা কাটা শুরু করে। তারা

পুরুষ সমাজকে অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধ করেন। নিজেরা অংশগ্রহণ করেন এবং নির্যাতনের শিকার হন। তারা নিজ নিজ সন্তানের মাঝে দেশপ্রেমের বীজ বপন করেন। ১৯২০ এর দশকে নারীরা মূলত সশস্ত্র সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৯২১ সালে চট্টগ্রামে অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনার জন্য অর্থ সংগ্রহে নিয়োজিত ছিলেন নেলী সেন গুপ্তা। এই আন্দোলনের সাথে যুক্ত হবার কারণে তাকে কারাবরণ করতে হয়। এছাড়াও ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের স্ত্রী বাসন্তী দেবী অসহযোগ আন্দোলনের সময় বাংলাদেশের নারী বাহিনীর নেতৃত্ব দিতে গিয়ে বন্দি হন। তিনিই প্রথম নারী যিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে নারী সমাজের প্রকাশ্য আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।"[১৮] পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতার ও কারাবরণ এর ফলে তাদের জেল হাজতে অমানবিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। বৃটিশ উপনিবেশবাদ বিরোধী যে সকল আন্দোলন প্রতিরোধ গড়ে ওঠে সে সকল ক্ষেত্রে নারী সমাজের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। ১৯২০ সালের অসহযোগ আন্দোলন থেকে শুরু করে আইন অমান্যকারী আন্দোলন, লবন সত্যাগ্রহ আন্দোলন, এবং স্বশস্ত্র বিপ্লবী কর্মকান্ডে নারী অংশগ্রহণ করেছে এবং নির্যাতিত হয়েছে। নিম্নে ব্রিটিশ উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলনে নারী নির্যাতন এর কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হল।

❖ ব্রিটিশ বিরোধিতা ও আইন অমান্য আন্দোলনে নারী নির্যাতন

"নারীদের রাজনৈতিক আন্দোলনে সম্পৃক্ততার সঙ্গে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন ও আইন অমান্য আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র রয়েছে। ১৯২১ সালের ১৭ই নভেম্বর 'প্রিন্স অব ওয়েলস' ভারতে এলে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস হরতাল আহ্বান করে। কংগ্রেসের এই হরতাল কর্মসূচি বানচাল করার জন্য ইংরেজ সরকার সকল স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সভা বেআইনি ঘোষণা করে। কংগ্রেস এই নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে আইন অমান্য কর্মসূচি গ্রহণ করে। এই কর্মসূচি ঘোষণাকালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস কারাবন্দি হলে তার পরদিনই তার সহধর্মিনী বাসন্তী দেবী, উর্মিলা দেবী, সুনীতি দেবীসহ আরও ২১ জনকে গ্রেফতার করা হয়। বলার অপেক্ষা রাখে না এই সকল নারীর উপর কারারুদ্ধ অবস্থায় কঠিন নির্যাতন করা হয়েছে।"[১৯]

"দেশের সব অঞ্চলের নারীরা সাহস ও দৃঢ়তার সাথে আন্দোলনে অংশ নেন। রাজপথে পিকেটিং, খদ্দর ফেরি করা ছাড়াও ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে অনেক নারী পুলিশী নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। বহু নারী শিশু সন্তান কোলে মিছিলে যোগ দেন। লীলা রায়ের নেতৃত্বে নারীরা লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবে দেশপ্রেম উজ্জীবিত বরিশালের বিশিষ্ট নারী মনোরমা বসু জমিদার পত্নী থেকে নারী আন্দোলনের অন্যতম নেত্রীতে পরিণত হয়েছিলেন। ১৯৩০ সালে তিনি কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলনের জন্য কারাবরণ করেন। ১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলন গ্রেপ্তারকৃত প্রথম নারী হচ্ছেন ইন্দুমতি জৈন্য। তিনি

নিজ নামে বেআইনী ইশতেহার ছাপিয়ে পুলিশ কর্মচারীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন। তারা যেন নারী নির্যাতন বন্ধ করে। এ ইশতেহারই তার কারাবরণের কারণ। ইন্দুমতি জৈন্য এর প্রচারিত নারী নির্যাতন বন্ধের ইশতেহার প্রশাণ করে যে কারারুদ্ধ অবস্থায় নারী নির্যাতন এর ধরণ কত ভয়াবহ ছিল। যে কারণে তিনি নিজ নামে বাধ্য হয়ে বেআইনী ইশতেহার ছাপিয়েছিলেন।"[২০] সেই নির্যাতন হয়তবা কেবল শারীরিক আঘাতে সীমাবদ্ধ ছিল না। নির্যাতনের প্রকৃত ধরণ সমাজের ভয়ে, মানসম্মানের ভয়ে নির্যাতিতা নারীরা প্রকাশ করার সাহস পাননি।

❖ লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে নারী নির্যাতন

"১৯৩০ সালে লবণ সত্যাগ্রহে সিলেটের নারী সমাজকে উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে জোবেদা খাতুন চৌধুরানী কংগ্রেসের উদ্যোগে "শ্রীহট্ট মহিলা সংঘ নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছিলেন এ সংগঠনের সভা প্রধান। লবণ আইন অমান্য করার জন্য ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার অপরাধে ৬০ জন হিন্দু নারীর সাথে তাঁকেও গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু কোন মুসলিম নারী গ্রেফতার করার নির্দেশ না থাকায় তাকে কারাভোগ করতে হয় নি। ১৯৩১ সালে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে ব্রাক্ষণবাড়িয়ায় অন্যতম নেত্রী হেমপ্রভা মজুমদার ১৪৪ ধারা ভঙ্গের অপরাধে গ্রেফতার হন এবং তাঁকে এক বৎসরের স্বশ্রম কারাদন্ড দেয়া হয়। একই বছর ২৬ জানুয়ারি স্বাধীনতা দিবস পালন কর্মসূচিতে নারী সত্যাগ্রহীরা পুলিশের সাথে লড়াই করেন। তাঁরা জাতীয় পতাকা উড়িয়ে কারাবরণ করেন। এ পতাকা উত্তোলনের কথা ছিল নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর। কিন্তু ২৩ জানুয়ারী তিনি পুলিশের হাতে বন্দি হন। ফলে তার কাজ সত্যাগ্রহীরা অসম সাহসের সাথে সম্পন্ন করেন।"[২১]

"সত্যাগ্রহীদের ওপর পুলিশী বর্বরতার প্রতিবাদে ফয়জুন্নেসা স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী লাবণ্যলতা চন্দ পদত্যাগ করেন। ১৯৩২ সালে লাবণ্যলতা চন্দ ও তার সহকর্মী যমুনা ঘোষকে গ্রেফতার করা হয়।

১৯৩২ সালে কলকাতা ডায়োসেশন কলেজের ছাত্রী জ্যোতিকনা দত্ত তাঁর বাক্সে রিভলবার রাখার দায়ে অভিযুক্ত হয়।"[২২]

সারণি-০১: বিভিন্ন আন্দোলনে নারী নির্যাতন

আন্দোলনের নাম	নির্যাতিতদের নাম	নির্যাতনে প্রকার
অসহযোগ আন্দোলন	চিত্তরঞ্জন দাশের স্ত্রী বাসন্তী দেবী, নীলা সেন গুপ্ত	নেতৃত্ব দিতে গিয়ে পুলিশ কর্তৃক বন্দি
আইন অমান্য আন্দোলন	অনেক নারী নির্যাতিত হন। উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন বাসন্তী দেবী, উর্মিলা দেবী, সুমতীসহ আরোও ২১ জন নারী।	১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে পুলিশী নির্যাতনের শিকার হন।
	মনোরমা বসু ইন্দুমতি সেন	বেআইনি ইশতেহার ছাপিয়ে পুলিশ কর্মচারীদের নারী নির্যাতন বন্ধের আহ্বান জানানোর কারণে কারাবরণ করেন।
লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন	জোবেদা খাতুন ও ৫০ জন হিন্দু নারী ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নেত্রী হেম প্রভা	পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতার ও এক বৎসরের স্বশ্রম কারাদন্ড কারাভোগ করেন।
	লাবণ্যলতা চন্দ্র, যমুনা ঘোষ	পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতার
	জ্যোতিকনা দত্ত	পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতার ও চার বৎসর কারাদন্ড।

উৎস: মালেকা বেগম, বাংলার নারী আন্দোলন, ঢাকা, ইউপিএল, ১৯৮৯, ড. নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্ত মুক্তিমঞ্চে নারী, ঢাকা, প্রিপট্রাস্ট, ১৯৯৯, পৃ. ২৭।

❖ সশস্ত্র বিপ্লবী কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ, আত্মত্যাগ ও আত্মাহুতি

"শুধু সভা-সমিতি বা আন্দোলনের সমর্থক হিসেবে নয়, বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে বহু নারী বিপ্লবী কর্মকান্ডে ও সরাসরি সম্পৃক্ত হয়েছিলেন। এ সকল আন্দোলনে নারীরা যেমন সশস্ত্র সংগ্রাম করেছে, তেমনি নির্যাতিত হয়েছে আবার আত্মাহুতি দিয়েছেন। তারই এক জ্বলন্ত উদাহরণ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার (১৯১১-১৯৩২) চট্টগ্রামের সূর্যসেনের বিপ্লবী দলে অংশগ্রহণ করেন প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ও কল্পনা দত্ত। নারী মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসে দুর্জয় সংকল্প ও দৃপ্ত প্রত্যয়ী অভিযাত্রী এক আত্মনিবেদিত বিপ্লবী অগ্নিকন্যা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। তিনি মাতৃভূমির শৃঙ্খল মুক্তির সংগ্রামের ইতিহাসে প্রথম শহীদ কন্যা হিসেবে অমর হয়ে আছেন। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সংগঠিত সশস্ত্র বিদ্রোহে তার অবদান অনেক। প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, দেশপ্রেমের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সূর্যসেনের বিপ্লবী দলের অন্তর্ভুক্ত হন এবং সংগ্রামী কর্মকান্ডে আত্মনিয়োগ করেন।"[২৩] দেশের কাছে, দেশের স্বাধীনতার কাছে তিনি নিজেকে সর্ম্পণ করেছেন। নিজের স্বার্থ তাই তার কাছে তুচ্ছ হয়ে গেছে। অর্থাৎ দেশের জন্য বাংলার নারী সমাজ কেবল নির্যাতিত হয়েই অবদান রাখেননি, দেশকে জীবনের চেয়ে বেশী ভালবেসে নিজের জীবন স্বেচ্ছায় উৎসর্গও করেছেন।[২৪]

"এটা সত্য যে, বিপ্লবী গোপনীয়তার প্রয়োজনে নারীদের নিরাপত্তাজনিত বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের ঝুঁকি ও সমস্যা আন্দোলনের চরম পরিণতিতে নির্মম অত্যাচার, চরম শাস্তি, ফাসি বা দেশান্তর ইত্যাদি কষ্ট মেয়েরা কতটুকু সহ্য করতে পারবে এসব বিবেচনায় রেখে বিপ্লবী দলে মেয়েদের যোগ দেয়ার বিষয়ে উৎসাহ দেয়া হতো না। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিশ শতকের ত্রিশের দশক বাংলার মেয়েদের জীবন বাজী রেখে লড়াই করা, জেল খাটা, ফাঁসির আসামী হওয়া, আত্মাহুতি দেওয়া এসব ঘটনাও

ইতিহাস প্রমাণ করে যে বিপ্লবী কাজের ঝুঁকি নিতে মেয়েরা দ্বিধা করেনি এবং তাদের তীব্র আকাঙ্খা ও উদ্যোগের ফলে বিপ্লবী দলগুলোতে মেয়েদের সদস্য করতে সম্মত হয়েছিল।"[২৫]

সশস্ত্র বিপ্লবী কর্মকান্ডের উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হিসেবে আরো যে ঘটনাগুলো আছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে "১৯৩১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর যুগান্ত দলের কিশোরী সদস্য কুমিল্লার দু'জন স্কুল ছাত্রী শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী স্টিভেনকে গুলি করে হত্যার পর গ্রেফতার হন। বয়স কম থাকায় তাদের ফাঁসি না হয়ে যাবজ্জীবন কারদন্ড হয়। অর্থাৎ ব্রিটিশদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে নারী সমাজ সক্রিয় ভূমিকা পালণ করে এবং স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পিছপা হয়নি।

আবার দেখা যায় ১৯৩৩ সালে কল্পনা দত্ত চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলায় অভিযুক্ত হয়ে ইংরেজ সরকারের হাতে বন্দি হন। প্রীতিলতা, কল্পনা দত্ত ছাড়াও আরো অনেকে বিপ্লবী কাজের সহায়ক শক্তি ছিলেন। ননীবালা দেবী, দুবাড়ি বালা দেবী, চারুশীলা, বিপ্লবীদের সহায়তা করতে গিয়ে জেল খেটেছেন, নির্যাতিতা হয়েছেন। ১৯৩২ সালে গভর্ণর স্ট্যানলি জ্যাকসনকে হত্যা করার চেষ্টা ব্যর্থ হলে বীনা দাসের ৯ বৎসর সশ্রম কারাদন্ড হয়। ১৯৩৪ সালে গভর্ণর এন্ডারসনকে হত্যার পরিকল্পনায় সাহায্যের জন্য উজ্জলা মজুমদারের ১৪ বছরের সশ্রম কারাদন্ড হয়। ১৯৩৭ সালে চট্টগ্রামের বিপ্লবী সূর্যসেনকে আশ্রয়দানের অপরাধে সাবিত্রী দেবীকে চার বছর সশ্রম কারাদন্ড দেয়া হয়। ১৯৩২ সালে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলার জন্য অর্থ সাহায্য তোলার কাজ করতে গিয়ে ইন্দুমতি সিংহ কারাদন্ড ভোগ করেন"।[২৬] "১৯৩২ সালে ব্রিটিশ ভারতে স্বাধীন ভারতের তিন রঙা পতাকা উত্তোলন করেন মাতঙ্গিনী হাজরা। আর এই অপরাধে তাকে কারাভোগ করতে হয়। পতাকা উত্তোলন একটি স্পর্শকাতর বিষয়। কারণ এ পতাকার সাথে একটি দেশ ও জাতির পরিচিতি রয়েছে। নিজ দেশের স্বার্থে ও পরিচিতি রক্ষা করতে গিয়ে মাতঙ্গিনা হাজরা গ্রেফতার হল।

কারা মুক্তির পর ১৯৪২ সালে তমলুক থানা ও আদালতের সামনে একটি শোভাযাত্রা পরিচালনার সময় পুলিশের গুলিতে তিনি নিহত হন।"[২৭]

উল্লিখিত বহুমুখী রাজনৈতিক কর্মকান্ডে নারীর গভীর দেশ প্রেম, প্রবল আত্মীক তাড়না, সমাজ সচেতনতা, সাহস, নির্যাতন, ত্যাগও তিতিক্ষা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান। বিশ শতকের প্রথমার্ধে তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থা সংস্কারে নারী শিক্ষা ইত্যাদির নিরিখে ঐ সকল কর্মকান্ডে নারীসত্তার যে শক্তিশালী অবস্থান প্রমাণিত হয় তা একুশ শতকের মঞ্চপটে থেকে ফিরে দেখা শুধু নয়, উপলব্ধিও মূল্যায়নের দাবিদার। সুতরাং উপরোক্ত আলোচনার যে বিষয়টি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠে তা হলো স্বদেশী আন্দোলন তথা ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের পটভূমিকার সীমিত সুযোগ, প্রতিকূল পরিবেশ, বাঁধা, সামাজিক পশ্চাদপদতা সত্ত্বেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী দেশকে

পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে এবং দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জনে যথেষ্ট অবদান রেখেছেন। বাংলার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট স্বাধীনতা সংগ্রামে নারী সশস্ত্র অংশগ্রহণ করেছে আবার হয়েছে নির্যাতিত। তৎকালীন নারী সমাজের এই অবদান পরবর্তীতে নারী মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে।

সারণি-০২: বিভিন্ন সালে সশস্ত্র বিপ্লবী কর্মকান্ডে নারী নির্যাতন ব্রিটিশ শাসনামল (১৯৩২-২০০৭)

সাল	নির্যাতিতা নারী	নির্যাতনের প্রকার
১৯৩২	বীনা দাশ	গভর্ণর স্টানলি জ্যাকসনকে হত্যা করার চেষ্টা ব্যর্থ হলে ৯ বছর সশ্রম কারাদন্ড
১৯৩২	ইন্দুমতি সিংহ	কারাদন্ড ভোগ করেন
১৯৩২	মাতাঙ্গিনী হাজরা	কারাভোগ ও পরবর্তীতে পুলিশের গুলিতে নিহত হন।
১৯৩৩	কল্পনা দত্ত	অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলায় অভিযুক্ত হয়ে ইংরেজ সরকারের হাতে বন্দি হন।
১৯৩৪	উজ্জ্বলা মজুমদার	১৪ বছর কারাদন্ড।
১৯৩৭	শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী	ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেনকে গুলি করে হত্যার পর পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতার।
১৯৩৭	সাবিত্রি দেবী	চার বছর সশ্রম কারাদন্ড।

উৎস: ড. নিবেদিতা দাশ পুরকাস্থ মুক্তিমঞ্চে নারী, ঢাকা, প্রিপ ট্রাস্ট, ১৯৯৯ গ্রন্থের সহায়তায় সারণিটি তৈরি করা হয়েছে।

বিশ শতকের চল্লিশের দশকে যে সকল উল্লেখযোগ্য বিপ্লবে নারী নির্যাতন

প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগে কৃষকশ্রেণী ও সরকারের মধ্যে উৎপাদনের ভাগাভাগি নিয়ে বিরোধ হয়েছে। এই সকল বিরোধে পুরুষের পাশাপাশি নারী সমাজও আন্দোলনে যোগ দেয় এবং বহু নারীকে নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। যেমন তেভাগা, টংক, নানাকার আন্দোলনে নারীদের উপর অমানবিক নির্যাতন করা হয়েছে।

- **তেভাগা আন্দোলনে নারী নির্যাতন**

১৯৪৬-১৯৪৭ সালে গ্রাম বাংলার শোষিত, পশ্চাৎপদ দারিদ্র পীড়িত কৃষক সমাজের তেভাগা সংগ্রাম সারা দেশকে কাঁপিয়ে তোলে।[২৮]

"তেভাগা সংগ্রাম ছিল জোতদারদের সাথে উৎপাদিত শস্য অর্ধেক ভাগাভাগির বদলে নিজের জন্য দু-তৃতীয়াংশ রাখার সংগ্রাম। অবিভক্ত বাংলার ১৪টি জেলায় (দিনাজপুর, হুগলী, হাওড়া, মালদাহ, বীরভূম, বগুড়া, সিলেট) লক্ষ লক্ষ কৃষকদের রক্তস্নাত এই সংগ্রাম ব্রিটিশ অধিকৃত ভারতের বৃহত্তম গণ আন্দোলনগুলোর মধ্যে অন্যতম। শুধু ফসলের জন্য নয়, জমিদার, জোতদারদের বিভিন্ন নির্যাতন এরূপ মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছে যে, ভাগচাষির জমির শস্যের পাশাপাশি কৃষকের বউ বেটিও ছিল জমিদারদের সম্পত্তি। পৃথিবীর ইতিহাসে সকল ক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হয় যে, জমিদার, ভূস্বামী, মহাজন শ্রেণীর কাছে নির্ভরশীল দরিদ্র শ্রেণীর নারী পুরুষের কাছে নিপিড়িত হয়েছে। ফলে এই সব নির্যাতনের বিরুদ্ধে জেগে উঠেছিল নারী সমাজ। যেমন:

রাজবংশী মেয়ে ভান্ডানী পুলিশের এক জমাদারের হাত থেকে বন্দুক ছিনিয়ে নেয়। প্রায় তিনশ নারী নিয়ে জয়মনি তার বাহিনী তৈরি করেন। এভাবে রাজবংশী মহিলা দীপেশ্বরী, রাসমনি হাজং, শঙ্খমনি, সরলাদি প্রমুখ নারীগণ বীরত্বের ইতিহাস তেভাগা আন্দোলন আজও ভাস্বর।"[২৯]

● নানকার আন্দোলনে নারী নির্যাতন

"তেভাগা আন্দোলনের অনুরূপ আর একটি আন্দোলন হল নানকার আন্দোলন। এই আন্দোলনে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল ও নারী বিভিন্নভাবে নির্যাতিত ও নিপিড়িত হয়েছে। নিম্নে নানকার আন্দোলনে নারী নির্যাতনের কিছু উদাহরণ দেয়া হলো। জমিজমা বরাদ্দ নিয়ে কাজের লোক রাখা ব্যবস্থটাই ছিল "নানকার ব্যবস্থা"।

সারাদিন বেগার খাটতে হতো এর বিনিময়ে প্রজাদের সামান্য বসতবাড়ি দেয়া হত। সারাদিন খাটলেও তাদের কোন খাবার বা মজুরি দেয়া হতো না"।[৩০]

"যখন তখন তাদের ডেকে এনে কাজ করানো হতো। তাছাড়া মারপিট, জুতাপেটাসহ অমানুষিক অত্যাচারের অন্ত ছিলনা। লোহার শিক পুড়িয়ে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে ছেঁকা বা দাগ দেওয়া হত"।[৩১]

একইভাবে তারা মেয়েদেরকেও জোর করে ভোগ করত। অধিকার খাটাতো যথেচ্ছাভাবে। "১৯২২-২৩ সালে ১৯৩১-৩২, এবং ১৯৩৮-৩৯ সালেও নানকার প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই হয়েছিল। জমিদারের অত্যাচার ও নির্যাতন মেয়েরাও বিক্ষুব্ধ হয়েছিল।

বেগার খাটতে রাজি না হলে কৃষক কর্মী ও নেতাদের ওপর প্রতিশোধ নিতে মিথ্যা মামলা দিত। আসামি খোজার নামে বাড়ি বাড়ি তল্লাশি, অত্যাচার চালাতো। সরকার ও জমিদার মিলিতভাবে অকথ্য নির্যাতন চালাত।"৩২ তৎকালীন নারী সমাজ এই ক্রীতদাস প্রথার সংস্কারকৃত এই নানকার প্রথা ও নির্যাতন এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় ও তারাও নির্যাতিত হয়।

"সে সময়কার পুলিশের নির্যাতনের উদাহরণ হিসেবে ১৯৪৯ সালের ১৮ই আগস্ট লাউতা বাহাদুরপুরে পুলিশি নির্যাতনের কথা বলা যায়। পুলিশ সেদিন গুলি ছুড়ে হত্যা করে ও গ্রেফতার করেই ক্ষান্ত হয়নি, ধরা পড়া লোকজনের উপর অকথ্য অত্যাচার চালায়। এসময় মহিলা কৃষককর্মী অর্পণা পাল ধরাপড়ার সময় ছিলেন অন্ত:সত্ত্বা। পুলিশের নির্মম অত্যাচারে ঘটনাস্থলেই তার গর্ভপাত হয়। মৃতপ্রায় অবস্থায় তাকে ধানক্ষেতের উপর দিয়ে পথ ধরে টেনে প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় নৌকায় তোলা হয়। পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ বাধাবার অভিযোগে পুরুষ মহিলা মিলে প্রায় ৭০ জনকে কারাগারে আটক করা হয়। এর মধ্যে তিনজন মহিলা কৃষককর্মী। অপর্ণা পাল, সুষমা দে, অসিতা পালের বিরুদ্ধে এ ঘটনায় নেতৃত্ব দেয়ার অভিযোগে ছয় মাসের কারাদন্ড ও অর্থদন্ড করা হয়।"[৩৩]

দেখা যাচ্ছে যে, নানকার প্রথার সকল উৎপীড়ন নারীকে ভোগ করতে হয়েছে। ফলে সকল অন্যায় মুখ বুজে সয়ে যাওয়ার চাইতে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেছে বাংলার কৃষক নারী ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে যেমন শিক্ষিত সচেতন নারীদের অবদান ছিল তেমনি সমাজের নিরক্ষর, অনগ্রসর এই কৃষক নারী সমাজের প্রতিবাদী ভূমিকা এবং তারা প্রতিবাদ করতে গিয়ে তারা যে নির্যাতন সহ্য করেছেন তা ইতিহাসে ঠাই করে নেয়ার দাবীদার।

তেভাগা ও নানকার আন্দোলনের পাশাপাশি আর একটি উল্লেখযোগ্য আন্দোলন হলো টংক প্রথা বিরোধী আন্দোলন। এ আন্দোলনেও নারীদের নির্যাতিত হতে হয়েছে।

- **টংক প্রথা বিরোধী আন্দোলনে নারী নির্যাতন**

"ময়মনসিংহের উত্তরে গারো পাহাড়ের পাদদেশে ১৯৩৭ সাল থেকে শুরু করে সুদীর্ঘ ১২ বৎসর টংক প্রথার বিরুদ্ধে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম গড়ে উঠেছিল। টংক প্রথা হচ্ছে কৃষকদের উপর এক প্রকার জঘন্য ও বর্বরতম সামন্তবাদী শোষন। জমিতে ধান হোক বা না হোক টংক কৃষকদের জমির মালিককে খাজনা দিতেই হতো। ময়মনসিংহ জেলার উত্তরে কালমাকান্দা, দুর্গাপুর, হালুয়াঘাট, নালিতাবাড়ি, শ্রবর্দী থানায় এই প্রথা চালু ছিল।"[৩৪]

"এই টংক আন্দোলনেও নারী সমাজ এর অংশগ্রহণ ছিল এবং তারা বিভিন্নভাবে নির্যাতিতও হয়েছেন। যেমন: এক তরুণীকে পুলিশের হাত থেকে রক্ষা করতে গিয়ে ২৫ জন সশস্ত্র পুলিশকে প্রতিরোধ করে রাশমনি হাজং টংক এলাকায় প্রথম শহীদ হন"।[৩৫]

"টংক এলাকায় জমিতে চাষ করার জন্য যে কৃষকের অনুমতি মিলত তাকে তার পরিবারের সকল সদস্যসহ জোতদার, মহাজন এবং জমিদার প্রত্যেকের কাজ বিনা পারিশ্রমিকে করতে হতো। জমিদার, মহাজন, জোতদার, স্বেচ্ছাচার করে যেমন গরীব চাষীর ফসল কেড়ে নিত তেমনি ঘরের বউ-ঝিকেও কেড়ে নিত। ভোগ করত, নির্যাতন করত, খাজনা বাকি থাকলে খাজনা বাকি রেখে কৃষক মারা গেলে সেই চাষীর বউ-ছেলে মেয়েদের কাছারিতে এনে অকথ্য শারীরিক নির্যাতন করা হতো। জমিদার তার সন্তান ও অন্যান্য প্রভাবশালী মহল গ্রামের মেয়েদের অত্যাচার করতে দ্বিধা করতনা। এমনকি চাষী প্রজার বিয়ে শাদির বিষয়েও খবরদারি করত। বিয়ের রাতে প্রজার নব বধূকে ভোগ করার রীতিও চালু ছিল। বিচারের উর্ধ্বে ছিল নারীর প্রতি এসব অত্যাচার, অবিচার।"[৩৬]

এই সকল ভয়াবহ অত্যাচারে যা নারীর অস্তিত্ব, সম্ভ্রম এর প্রতি আঘাত করে সেই অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে গিয়েও নারী আবার নির্যাতিত হয়েছে।

• নাচোল আন্দোলনে নারী নির্যাতন

তেভাগা, নানকার ও টংক আন্দোলনের পাশাপাশি চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোল এলাকায় কৃষক বিদ্রোহ ও (১৯৪৮-৪৯ পাকিস্তানি আমলে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। নাচোল আন্দোলনে অংশগ্রহণ এবং পুলিশের বর্বরতার কাছে পরাজয় স্বীকার না করে কিংবদন্তিতে পরিণত হন ইলা মিত্র। তার উপর পুলিশের অবর্ণনীয় নিষ্ঠুর অত্যাচার জনমনে সরকারের বিপক্ষে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।[৩৭]

ইলা মিত্র যে বর্বর অত্যাচার সহ্য করেছিল তা পরবর্তীতে জবানবন্দী আকারে তিনি আদালতে দিয়েছিলেন। তার জবানবন্দীর দ্বারাই প্রমাণিত হয়েছে যে পুলিশ কর্তৃক বন্দী হয়ে নারী কে কি নির্মম নির্যাতনের শিকার হতে হয়। অনেক নারী ইতিহাসে পুলিশ কর্তৃক নির্যাতনের শিকার হয়েছে। লোক লজ্জা বা সমাজের ভয়ে তারা তা প্রকাশ করার সাহস পাননি। নির্যাতক যখন পুরুষ হন তখন নির্যাতন কত ভয়াবহ হতে পারে তা জানা যায় ইলা মিত্রের জবানবন্দীতে। "১৯50 সালের জানুয়ারি ৫ তারিখ নাচোল থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা তিনজন কন্সটেবলসহ গরুর গাড়িতে করে নাচোলের কেন্দুয়া ঘেচুয়া গ্রামে টহল ও সালামী আদায়ের জন্য যায়। পুলিশ কৃষক সুরেন বর্মনের বাসায় তেভাগা আন্দোলনের নেতাদের খুজতে যায়। না পেয়ে সুরেন বর্মনকে মারধর করে। দুজন কৃষককে নির্যতন করে। পুলিশী নির্যাতনে ক্ষিপ্ত হয়ে গ্রামবাসী হাতের কাছে পুলিশ পেয়ে ৩ জন পুলিশ ও দারোগা মেরে ফেলে।"[৩৮] "এই ঘটনার প্রেক্ষিতে ৭ জানুয়ারি ইলামিত্র-কে রংপুর স্টেশনে সমবেত সাঁওতালদের মধ্যে থেকে পুলিশ গ্রেফতার করে প্রচন্ড মারধর করে ও নাচোল থানায় নিয়ে যায়। এর পর থেকেই তার উপর অমানবিক নির্যাতন চালাতে থাকে।"[৩৯]

নাচোল থানায় তাঁর ওপর পাশবিক অত্যাচার চালানো হয়। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে নেয়া হয় এবং পুলিশের তৈরি স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে সই না করার কারণে তার উপর আবারও নেমে আসে ভয়াবহ নির্যাতন। এ পর্যায়ে তাকে উলঙ্গ করা হয়। ভয়াবহ যৌন নির্যাতন ও ধর্ষণ করা হয়। এর পর রাজশাহী জেলে স্থানান্তর করা হয় এবং সেখানেও তার উপর নতুন কায়দায় অত্যাচার, মারপিট করা হয়।[৪০] ইলা মিত্রের উপর যে পাশবিক নির্যাতন করা হয় তা যে কাউকে শিহরিত করে। ইলা মিত্রের নির্যাতনের বর্ণনা যা তিনি আদালতে জবানবন্দিতে দিয়েছিলেন তা পরিশিষ্টে সংযোজন করা হয়েছে।

ব্রিটিশ শাসনামলের পরে আসে পাকিস্তান শাসনামল। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭০-৭১ পর্যন্ত পাকিস্তান আমলে সকল আন্দোলন অভ্যুত্থানে নারীর অংশগ্রহণ ছিল। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয় ঠিকই কিন্তু নারী নির্যাতন, নির্যাতনের জায়গায়ই থেকে যায়। সে মুসলমান নারী হোক আর হিন্দু নারীই হোক নির্যাতন বন্ধ হয়নি এবং পাকিস্তান সরকারের এ বিষয়ে কোন

পদক্ষেপই পরিলক্ষিত হয়নি। নিম্নে পাকিস্তান আমলে বিভিন্ন আন্দোলন অভ্যুত্থানে নারী নির্যাতন এর বর্ণনা আলোচনা করা হল।

• ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনে নারী নির্যাতন

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন ছিল মুক্তিযুদ্ধের ভিত্তিস্বরূপ। এই বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনেও নারীরা অংশগ্রহণ করেছে এবং নির্যাতিত হয়েছেন। পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বাংলার পরিবর্তে উর্দূকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করতে চাইলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙালি ছাত্র-ছাত্রী প্রতিবাদ জানায়। "১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে পূর্বাভাস ব্যতিরেকে রাষ্ট্রীয় কাজে উর্দূর ব্যবহার শুরু হয়। যদিও পাকিস্তানের কেবল ৩.২৭ ভাগ লোকের মাতৃভাষা ছিল উর্দূ।

১৯৪৮ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি সিলেট মহিলা মুসলিম লীগের সভানেত্রী জোবেদা খাতুন চৌধুরানীর নেতৃত্বে একদল নারী বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানিয়ে আব্দুর রবের কাছে একটি চিঠি দেন। এ বছর সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকা, রাজশাহী ও সিলেট কারাগারে রাজনৈতিক বন্দিদের মধ্যে অনেক নারীকেও বন্দি করা হয়। রাজবন্দিদের মুক্তির দাবিতে নারীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। এ বিক্ষোভ মিছিলে পুলিশী হামলা হয়। নারীদের পুলিশ মারধোর করে। এতে রয়েছে নারী নেত্রী নিবেদিতা, সুদেবী মুখোপাধ্যায়, নীনাসেন গুপ্ত, উমা রায়, কল্যানী চক্রবর্তী, নিরুপমা গুপ্ত প্রমুখ নারীগণ পুলিশ নির্যাতন আইনে গ্রেফতার হন। এ ঘটনার প্রতিবাদে নারী রাজবন্দিরা সবাই অনশন শুরু করেন। এ সময় নাদেরা বেগমকে গ্রেফতারও জেলের নিয়ম ভঙ্গের অজুহাতে অকথ্য নির্যাতন করা হয়।"[৪১]

"১৯৪৮ সালের ১৫ই মার্চ পুলিশি হামলার শিকার হন নারীরা। ১৯৪৯ সালের ১২ই মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৭ জন ছাত্র-ছাত্রীর বিরুদ্ধে আন্দোলন করার অপরাধে "শাস্তিমূলক ব্যবস্থা" নেয়া হয়। যার মধ্যে ছিলেন নাদেরা বেগম, লুলু বিলকিস বানু প্রমুখ।"[৪২]

"১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারিতে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের কর্মতৎপরতাকে চারদিকে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য ১২ ও ১৩ই ফেব্রুয়ারি পতাকা দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এ সময় ৫০০ পোস্টার লেখার দায়িত্ব দেয়া হয় নাদিরা বেগম ও ডা. সাফিয়াকে। ২১শে ফেব্রুয়ারি ডা. সাফিয়া, সুফিয়া ইব্রাহিম রওশন আরা বাচ্চু, শামসুন্নাহারসহ আরো কয়েকজন এর উপর পুলিশ লাঠি চার্জ করে। এ সময় সুফিয়া ইব্রাহিম ও রওশন আরা বাচ্চু আহত হন।

১৯৫২ সালে ২১শে ফেব্রুয়ারিতে আরও অনেক ছাত্রীকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের মধ্যে ফরিদা বারি. কামরুন্নাহার লাইলি, ফিরোজা বেগম, জহরত আরা, মেডিকেল কলেজের দুজন ছাত্রীসহ আরো অনেকে ছিল।"[৪৩]

"এসময় পুলিশি নির্যাতন ছাড়াও ভাষা আন্দোলনে সম্পৃক্ততার কারণে বেশ কিছু

নারীকে জীবনে বড় ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। যেমন, ইলা বকশী, বেনুধর, কামরুন্নাহার লাইলী, ফরিদা বারী, ফিরোজা বেগমের কারাবরণ, ছালেহা বেগমের স্কুল থেকে বিতাড়ন পূর্বক শিক্ষাজীবনের সমাপ্তি। নারায়ণগঞ্জের মর্গান হাইস্কুলের শিক্ষায়িত্রী মমতাজ বেগমের রাজনৈতিক কার্যক্রমে যুক্ত না হবার মুচলেকার স্বাক্ষরে অস্বীকৃতির কারণে কারাগার থেকে মুক্তি লাভের প্রস্তাবে ব্যর্থতার জন্য স্বামী কর্তৃক তালাকপ্রাপ্ত হওয়া ইত্যাদি। যদিও এসব কোনো ক্ষতিই তাদেরকে আন্দোলনে সম্পৃক্ত হওয়া থেকে বিরত রাখতে পারেনি।"[৪৪]

সারণি-০৩: ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণের কারণে নির্যাতনের শিকার নারীগণ

আন্দোলন	সময়কাল	উদ্দেশ্য	অংশগ্রহণকারী নারীগণ
ভাষা আন্দোলন	১৯৪৮-১৯৫২	বাঙালির নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতির অধিকার প্রতিষ্ঠা	নাদেরা চৌধুরী, লিখি খান, ডা. সাফিয়া, সুফিয়া ইব্রাহিম, রওশন আরা বাচ্চু, শামসুন্নাহার, ইলা বকশী, বেণুকর, কামরুন্নাহার লাইলী, ফরিদা বারী, ফিরোজা বেগম, ছালেহা বেগম, মমতাজ বেগম প্রমুখ।

উৎস: তুষার আব্দুল্লাহ (সম্পা) বায়ান্নর ভাষাকন্যা, ঢাকা, নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা,১৯৯৭

গাজীউল হক ও এম আর আখথার মুকুল (সম্পা) বাহান্নর ভাষা আন্দোলন, ঢাকা হাক্কানী পাবলিশার্স, ১৩৯১।

সারণি-০৪: উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থানে নারীদের উপর আক্রমণ

সাল	নির্যাতিতাগণ	নির্যাতনের ধরণ
১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান	আন্দোলনে অংশগ্রহণরত ছাত্রীদের উপর	ব্যাপক লাঠি চার্জ, কাঁদানে গ্যাস ও গরম পানি নিক্ষেপ, রোকেয়া হলের ভিতরে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে ও কয়েকজন ছাত্রীকে লাঞ্ছিত করে। ছাত্রীদের উপর বেপরোয়াভাবে লাঠি চার্জ করে।

উৎস: আসমা পারভীন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নারীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ, ঢাকা, বিশ্ব সাহিত্য ভবন, ২০১১।

● উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থানে নারী নির্যাতন

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানেও নারী সমাজের উপরেও নির্যাতন চালানো হয়। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান ছিল পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা পরবর্তীকালে সংঘটিত সর্ববৃহৎ আন্দোলন। ১৯৬৯ সালের জানুয়ারিতে সংগ্রামী ছাত্র সমাজ ১১ দফার দাবিতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে সারা দেশব্যাপী প্রচারপত্র বিলি করে। এ আন্দোলনে ও পুরুষের পাশাপাশি নারীর অংশগ্রহণ ছিল এবং নারীকে বিভিন্ন রকম নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে।

"১৯৬৯ সালের ১৭ই জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বদলীয় ছাত্ররা কলাভবনের বটতলা থেকে সমাবেশ শেষে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল বের করলে পুলিশ ছাত্র-ছাত্রীদের উপর ব্যাপকভাবে লাঠিচার্জ কাঁদানে গ্যাস ও গরম পানি নিক্ষেপ করে।

ছাত্রদের ১১ দফা দাবির ভিত্তিতে ডাকসু ভিপি তোফায়েল আহমেদের নেতৃত্বে ছাত্ররা সভা শেষে পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে মিছিল বের করলে পুলিশ অতর্কিত বেপরোয়া লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে বহু ছাত্র-ছাত্রীকে আহত ও গ্রেফতার করে। রোকেয়া হলের ভেতরে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে ও কয়েকজন ছাত্রীকে লাঞ্ছিত করে। ১৯৬৯ সালের ১৯ জানুয়ারি মিছিলে পুলিশ ছাত্রীদের উপর ব্যাপক লাঠি চার্জ করে।"[৪৫]

- ১৯৭১ এ নারী নির্যাতনের ধর১৯৭১ এ পাকিস্তানি সৈনিকরা বাঙালী নারীদের উপর যে নির্যাতন চালিয়েছে তা ভয়াবহতা অনেক। ডাঃ এম.এ হাসান তার যুদ্ধ ও নারী গ্রন্থে নারী নির্যাতন এর ধরণকে কয়েকটি ভাগে বিশ্লেষণ করেছেন যা তুলে ধরা হলঃ

সারণি:০৫: ১৯৭১ এ নারী নির্যাতনের ধর

১৯৭১	স্থান	নারী নির্যাতনের ধরন
স্পট রেপ	বিভিন্ন শহর, সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান, আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী, হিন্দু সম্প্রদায়, স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়।	মেয়েদেরকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া। মেয়েদেরকে তাদের বাড়িতে নির্যাতন করা। পুরুষ সদস্যকে হত্যা করে নারী সদস্যকে ধর্ষণ।
স্পট গণধর্ষণ।	মুক্তিযোদ্ধাদের উপস্থিতি যেখানে আঁচ পেয়েছে সেখানেই হামলা চালিয়েছে।	পুরুষদের বন্দি করে, অনেক নারীদের একত্রিত করে গণধর্ষণ। গণধর্ষণে ৮-১০০ জন সৈনিকের অংশগ্রহণ।
সেনাঘাটি ও ক্যাম্পে বন্দি নারীদের ধর্ষণ	বাড়ি ঘর, যাত্রী ছাউনি, রেলস্টেশন, জাহাজ ঘাট, রেল, বাস প্রভৃতি যানবাহন।	মেয়েদেরকে অপহরণ করে ক্যাম্পে তুলে নিয়ে গিয়ে নির্যাতন।
যৌনদাসী	সারাদেশে বিভিন্ন স্থান থেকে অপহরণ	শহর গ্রামের তরুণী নারীদের বন্দি করে নিজেদের ক্যাম্পে ও বাঙ্কারে যৌন দাসীতে পরিণত করা।

উৎস: ডা. এম.এ. হাসান, যুদ্ধ ও নারী, ঢাকা, ওয়ার ক্রাইম এ- ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং কমিটি, ২০০২, গ্রন্থটির সহায়তায় সরণিটি তৈরি করা হয়েছে।

- **স্পট রেপ (Spot Rape)**

"পঁচিশ ও ছাব্বিশে মার্চের গণহত্যার পরপরই পাকিস্তান সৈনিকরা বিভিন্ন শহর, সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান, স্কুল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়সহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী তাদের সমর্থক বুদ্ধিজীবি ও বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়িগুলোতে ব্যাপক ভাবে আক্রমণ করে। এ পর্যায়ে তারা কাউকে হত্যা করেছে বা বেঁধে নিয়ে গিয়েছে। পাকিস্তানি সৈনিকরা পরিবারের পুরুষ সদস্যদের হত্যা করে নিজ ভিটে বাড়িতেই নারী সদস্যদের ধর্ষণ করেছে। অধিকাংশ সময় একজন নারীকে একাধিক সৈন্য পরপর ধর্ষণ করেছে। নির্যাতন করার পর কাউকে কাউকে সাথে করে

নিয়ে গেছে। এ ধরনের স্পট রেপ প্রক্রিয়া শুরু হয় এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহের শেষ দিক থেকে। এই ধর্ষণ প্রক্রিয়া বিজয় লাভ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এ সমস্ত স্পট রেপের অধিকাংশ ঘটনাগুলো সংঘটিত হয়েছে স্বামীর অবর্তমানে কিংবা স্বামীকে হত্যা করার পর। এসব ধর্ষণের ক্ষেত্রে মহিলাদের সংখ্যা প্রতি বাড়িতে দু'তিন জনের মত ছিল।"[৪৬]

• স্পট গণধর্ষণ (Gang Rape & Mass Rape)

"যেখানে পাকিস্তানি সৈনিকেরা প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছে কিংবা মুক্তিযোদ্ধাদের উপস্থিতি আঁচ করেছে বা মুক্তিযোদ্ধাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। সেসব স্থানের জনসাধারণ পাকিস্তানি সৈনিকদের ভয়ঙ্কর রোষানলে পতিত হয়েছেন। ঘটনার বাস্তবতা যাই হোক, সন্দেহের উদ্রেক হলেই তারা এক একটা এলাকা ঘেরাও করেছে। শক্ত সমর্থ পুরুষদের বন্দি করেছে এবং তাদের সম্মুখেই এক একটা ভিটায় অথবা এক একটা ঘরে অনেক গুলো নারীকে জড়ো করে গণধর্ষণ করেছে। নাটোরের ছাতনী গ্রামে গণহত্যা চালানোর পর পাকিস্তানি সৈনিকেরা এরকম ভয়ঙ্কর গণধর্ষণ চালায়। গ্রামের পুরুষদের ধরে নিয়ে একে একে জবাই করে হত্যা করেছিল। গণহত্যা শেষ করে সদ্য বিধবা ও সন্তানহারা অসহায় মহিলাদের ওপর তারা চালায় ভয়ঙ্কর গণধর্ষণ। এক একটি গণধর্ষণ আট দশ জন থেকে প্রায় একশ জন পাকিস্তানি সেনা অংশ নিয়েছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে পাকিস্তানি সৈনিকদের একটি দল একদিকে যেমন পুরুষদের তাড়িয়ে নিয়ে গেছে বা কোথাও লাইন করে দাঁড় করিয়ে হত্যা করেছে, তেমন তাদের অন্য আর একটি দল ঘরে ঘরে ঢুকে লুটপাট করেছে, আগুন দিয়েছে এবং মেয়েদের কে একত্রিত করে গণধর্ষণ করেছে। দীর্ঘ ৯' মাস হত্যাকান্ড ও ধ্বংসযজ্ঞের সাথে যুগপৎ এরা ধর্ষণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে। সেটা একক বা নির্মম গণধর্ষণ থেকেই হক না কেন। অনেক ক্ষেত্রে পুরুষরা বাঁচার জন্য পালিয়েছেন। কিন্তু লুকানোর স্থান থেকে পুরুষদেরকে ধরে তাদের সামনেই নারীদেরকে ধর্ষণ না করলেও ঘরে ঘরে ধর্ষণচালিয়ে পাকিস্তানি সৈনিকেরা এগিয়ে গেছে তাদের বিকার গ্রস্থ লালশা এবং অবনমিত করার ঘৃণ্য ইচ্ছা চরিতার্থ করার জন্য।"৪৭

• সেনাঘাঁটি ও ক্যাম্পে বন্দি নারীদের ধর্ষণ (Rape in Custody and Gang Rape)

"যুদ্ধের পুরো ন'মাস পাকিস্তানি সেনারা বিভিন্ন বাড়িঘর, স্কুল-কলেজ, বিভিন্ন যাত্রী ছাউনি, রেল ষ্টেশন, বাস ষ্টেশন, জাহাজঘাট, রেল, বাস প্রভৃতি যানবাহন থেকে নারীদেরকে বন্দি ও অপহরণ করে তাদের ক্যাম্পে নিয়ে গেছে। নিরীহ পথচারী এবং ভিটেমাটি ছেড়ে পলায়নরত নারীদেরকে পরিবার ও দল থেকে বিচ্ছিন্ন করে তুলে নিয়ে গেছে ক্যাম্পে। পাকিস্তানি সেনারা কোন কোন পরিবারকে নিরাপত্তা দেবার নাম করে পুরো পরিবারটি নিজেদের ঘাটিতে তুলে নিয়ে গেছে। এরপর ছেলেদের নির্যাতন করে

হত্যা করেছে বা ছেড়ে দিয়েছে। আর মেয়েদের আটকিয়ে ধর্ষণ করেছে। এসব নির্যাতন ক্যাম্পে ও বাঙ্কারে নারীরা কখনও একদিন, একাধিক দিন, কখনও বা মাসের পর মাস ধর্ষিত হয়েছেন। নিজেদের অপকর্মের নিদর্শন ধ্বংস ও অপরাধের ছাপ মুছে ফেলার জন্য যুদ্ধের শেষ দিকে পরাজয়ের মুখে পাকিস্তানি সেনারা এদের অধিকাংশকেই হত্যা করেছে।"[৪৮]

- **যৌনদাসী (Comford Girl and Sexual Slavery)**

"যুদ্ধের ন'মাস পাকিস্তানি সেনাদের নারী নির্যাতন এর ঘটনা বিশ্লেষণ করলে বিভিন্ন ভয়াবহ চিত্র ফুঁটে ওঠে। শহর ও গ্রামের যুবতী নারীদেরকে এরা কখনও বন্দি করে নিয়ে গেছে নিজেদের ক্যাম্পে ও বাঙ্কারে। দিনের পর দিন সেখানে তাঁদেরকে আটকে রেখে যৌন নির্যাতন করেছে। ইচ্ছা মতো সাম্ভোগ করেছে তাদের ঘাঁটি ও ক্যাম্পের আশে পাশের অনেককে বাধ্য করেছে দিনের পর দিন তাদের কাছে হাজিরা দিতে। এসব মেয়েদের কাউকে কাউকে পাকিস্তানি সেনারা সম্মিলিত সম্ভোগের জন্য বেশ্যার মতো ব্যবহার করেছে। এই সব নারীদেরকে অসংখ্য পাকিস্তানি সেনা সম্ভোগ করেছে। ইচ্ছে মতো তাঁদেরকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে গেছে। ক্যাম্পে ক্যাম্পে ঘুরিয়েছে। ক্যাম্পের পরিবর্তন হলে তাদেরকে সাথে নিয়ে গেছে পরবর্তী গন্তব্যে।"[৪৯]

উপসংহার

তৎকালীন সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনা, ছাত্রীসমাজকে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য করেছে। সকল বাধা বিপত্তি ও নির্যাতনের পরেও যা বর্তমান সময়ে ছাত্রী সমাজের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। যে সকল নির্যাতনের তথ্য আমরা উপরের আলোচনায় তুলে ধরতে সক্ষম হলাম সে সকল ক্ষেত্রে নির্যাতনের ধরন ও প্রকৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানা যায় না। এ কথা সহজবোধ্য যে, নারী নির্যাতন শুধু মারপিট, ধরপাকড় এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। নির্যাতকগণ যখন পুরুষ হয় তখন ঐ সকল নির্যাতনকে চরম অবমাননাকর পর্যায়ে (ধর্ষণ) টেনে নিতে তারা দ্বিধা করে নাই। লোক লজ্জা বা সামাজিক মর্যাদার কথা বিবেচনা করে হয়ত নির্যাতিতা নারীরা বিচারের দাবি নিয়ে দাঁড়ায় না। নির্যাতিতা নারীদের এই সকল বিষয় অবশ্যই গবেষণার দাবী রাখে এবং ইতিহাসের পাতায় চির স্মরণীয় করে রাখা নতুন প্রজন্মের দায়িত্ব।

তথ্যসূত্র

১. মালেকা বেগম, বাংলার নারী আন্দোলন, ঢাকা, ইউপিএল, ১৯৮৯, ভূমিকা।

২. ডা. এম. এ হাসান, যুদ্ধ ও নারী, ঢাকা, ওয়ার ক্রাইম এন্ড ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং কমিটি, ২০০২, পৃ. ৪।

৩. আলেয়া পারভিন, নারী ও রাজনীতি, ঢাকা, মনন পাবলিকেশন্স, ২০০৭, পৃঃ ১০০।

৪. আলেয়া পারভীন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০০।

৫. প্রাগুক্ত পৃঃ ১০১।

৬. শাহানাজ পারভিন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নারীর অবদান, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ২০০৭, পৃঃ-১৭২।

৭. রফিকুল ইসলাম, নরহত্যা ও নারী নির্যাতনের কড়চা, ১৯৭১, ঢাকা, অনন্যা প্রকাশনা, ১৯৯৪, পৃঃ ৯০।

৮. অধ্যাপক মো. আবদুল মান্নান, শামসুন্নাহার খানম মেরী, নারী ও রাজনীতি, ঢাকা, অবসর প্রকাশনা, ২০০৬, পৃঃ ১০০।

৯. দৈনিক আজাদ, ৮ মার্চ, ১৯৭২।

১০. শাহনাজ পারভীন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৩, ১৬৪।

১১. সাজিদ হোসেন, একাত্তরের যুদ্ধ শিশু, ঢাকা, সময় প্রকাশন, ২০০৯, পৃঃ ১৬।

১২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩।

১৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩।

১৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪।

১৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪।

১৬. সাজিদ হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬।

১৭. শাহনাজ পারভীন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯৮।

১৮. মালেকা বেগম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২।

১৯. মালেকা বেগম প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২।

২০. নিবেদিতা দাশ পুরকারস্থ, মুক্তিমঞ্চে নারী, ঢাকা, প্রিপ ট্রাস্ট, ১৯৯৯, পৃ. ২৩।

২১. নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্থ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।

২৪. মালেকা বেগম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩।

২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩।

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪।

২৭. নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্থ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫।
২৮. মালেকা বেগম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯।
২৯. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন ও মুনতাসীর মামুন (সম্পা.) বাংলাদেশ সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন, ঢাকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৮৬, পৃ. ১।
৩০. অজয় ভট্টাচার্য, নানকার বিদ্রোহ, সৈয়দ আনোয়ার হোসেন ও মুনতাসীর মামুন (সম্পাদ) প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৬।
৩১. পিটার কাস্টার্স (মূল), কৃষ্ণ নিয়োগী, (অনু.) তেভাগা অভ্যুত্থান নারী, ঢাকা, গণসাহিত্য প্রকাশনা, ১৯৯২, পৃ. ১৫।
৩২. মালেকা বেগম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪-১০৫।
৩৩. সেলিনা হোসেন ও মাসুদুজ্জামান (সম্পা.) নারীর ক্ষমতায়নঃ রাজনীতি ও আন্দোলন, ঢাকা, মওলা ব্রাদার্স, ২০০৩, পৃ. ৩১৬।
৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৬।
৩৫. অজয় ভট্টাচার্য, নানকার বিদ্রোহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৯-৩৪৮।
৩৬. মালেকা বেগম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২।
৩৭. আসমা পারভীন, বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে নারীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ, ঢাকা, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ২০১১, পৃ. ৩৩।
৩৮. মালেকা বেগম, ইলামিত্র, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭, পৃ. ২৮।
৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯।
৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০-৩১।
৪১. আসমা পারভীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২।
৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩।
৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩,৪৪।
৪৪. তুষার আব্দুল্লাহ (সম্পা.), বায়ান্নর ভাষা কন্যা, ঢাকা, নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা, ১৯৯৭, পৃ. ১৩।
৪৫. আসমা পারভীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২।
৪৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩।
৪৭. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩।
৪৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪।
৪৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪।

ISSN 1605 - 7023

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা
পঞ্চদশ বর্ষ সংখ্যা
১৪২২ বঙ্গাব্দ/২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

বিলীয়মান জনপদ পাথরঘাটার ইতিহাস ও প্রত্নসম্পদ

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম*

Abstract: *The North-West area of Bangladesh, well-known as Varendra region, has a long history from the ancient times through Gupta, Pala, Sena and Mauriya periods upto the British time. Patharghata is a place of Varendra region- a place that has a significant account of historical sights and relics which discuss proper preservation and documentation for proper and authentic local History which will eventually contribute to the evaluation and reconstruction of national history.*

অতীতের পৌন্ড্র-বরেন্দ্র, গৌড়-কর্ণ সুবর্ণ, রাঢ়-সুহ্ম, তাম্রলিপ্ত, বঙ্গ-সমতট-হরিকেল নিয়ে গড়ে উঠেছিল বঙ্গভূমি ।[১] জয়পুরহাট বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল তথা বৃহত্তর রাজশাহী বিভাগের মধ্য-পশ্চিমাংশে অবস্থিত এবং সাবেক বগুড়া জেলার একমাত্র মহকুমা । এখানকার সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস এতদঞ্চলের অন্যান্য জেলার মতোই প্রাচীন[২] এবং গৌরবময় হলেও নানাবিধ কারণে পশ্চাৎপদ এই জনপদ । ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের[৩] ফলে বৃহত্তর বগুড়া জেলা- বগুড়া ও জয়পুরহাট নামে দু'টি জেলায় রূপান্তরিত হয় ।[৪] জয়পুরহাটের উত্তরে দিনাজপুর জেলা, পশ্চিমে নওগাঁ জেলা ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের পশ্চিম দিনাজপুর জেলা, দক্ষিণে বগুড়া ও নওগাঁ জেলা, পূর্বে গাইবান্ধা ও বগুড়া জেলা । ভারতবর্ষ বা বাংলার প্রাচীন ইতিহাসে জয়পুরহাট নামের কোন স্বতন্ত্র ভৌগোলিক অবস্থান না থাকায় ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দি পর্যন্ত এর ইতিহাস অনেকটা অস্পষ্ট ।[৫] তবে মুসলিম বিজয়পূর্ব প্রায় দেড় হাজার বছরের অধিক সময় পর্যন্ত পুন্ড্রনগর সমৃদ্ধশালী নগরী ছিল ।[৬] এবং অধিকাংশ সময় তা সমগ্র এলাকা অথবা সন্নিহিত এলাকার শাসনকেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হতো ।[৭] সঙ্গত কারনে, খুব স্বাভাবিক ভাবেই এতদঞ্চলে গড়ে উঠে নানা ধরণের বানিজ্যিক ও প্রশাসনিক শহর-উপশহর । এমনই এক বা একাধিক শহর বা প্রশাসনিক স্থানের নাম পঞ্চনগরী । অনুমিত অঞ্চলের অর্থাৎ পাথরঘাটা[৮] সংলগ্ন তুলসীগঙ্গা ও এর শাখা-নদীসহ ভূ-ভাগ, সন্নিহিত গ্রামগুলোর মহিপুর[৯], কসবা,[১০] উঁচাই, নওপুকুরিয়া[১১] ইত্যাদি প্রাচীন নাম এই ধারণাকে সমর্থন করে ।

মহাস্থানগড় থেকে প্রাপ্ত একটি ব্রাহ্মী লিপির সাক্ষ্য অনুযায়ী খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দি থেকে সমগ্র উত্তর বাংলা মৌর্য সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল ।[১২] পরবর্তীকালে (পঞ্চম-একাদশ শতাব্দি) অত্রাঞ্চল ক্রমান্বয়ে গুপ্ত, পাল ও সেন রাজবংশের কর্তৃত্বাধীন ছিল ।[১৩] তবে অধিকাংশ সময় পুন্ড্রবর্ধন রাজ্যের অধীনে শাসিত হয় এবং কখনো কখনো

---

* সহকারী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ।

বরিন্দ[১৪] বা বরেন্দ্রী[১৫] রাজ্যের অধীনেও শাসিত হয় বলে অনেকের ধারণা।[১৬] জয়পুরহাট ও তার পার্শ্ববর্তী অন্যান্য অঞ্চলের ভূমিরূপ এবং মানব-বসতি স্থাপন হতে ধারণা করা যায় যে, উপমহাদেশের অন্যান্য প্রাচীন জনবসতির মতো এখানেও খ্রিস্ট-জন্মের পূর্বেই উন্নত সভ্যতা বিরাজমান ছিল। প্রাচীন গ্রীক গ্রন্থ (আনু. ৪০ খ্রি. রচিত) 'পেরিপ্লাস অব দি ইরিথ্রিয়ান' এ এবং টলেমীর প্রণীত (২য় খ্রি.) ভূগোল গ্রন্থে ভারতের পূর্বপ্রান্তিক দেশ হিসেবে 'কিরাদিয়া'র নাম উল্লেখ আছে। তাদের মতে এই দেশে 'পেন্টাপোলিস' অর্থাৎ পাঁচটি নগর ছিল। আধুনিক অনেক পন্ডিতের মতে টলেমী কথিত এই কিরাদিয়া প্রকৃতপক্ষে 'কিরাত জাতির দেশ'। বর্তমানকালের গবেষকদের ধারণামতে মহাভারত কথিত 'কিরাতদেশ' এবং 'কিরাদিা' এক ও অভিন্ন। পন্ডিতগণের অনুমান বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার বেশ কিছু অংশ এই জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই জেলার বৈগ্রাম, কালাই-কুরি, বেলওয়া, ধনাইদহ, দামোদরপুরসহ বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাপ্ত গুপ্ত আমলের (৪৪৮-৪৫০ খ্রি.) ও প্রথম মহীপালের রাজত্বকালের 'তাম্রশাসন পট্ট' পঞ্চনগর নামে বিষয় ও শাসনকেন্দ্রের বারংবার উল্লখ রয়েছে। এইসব তাম্রশাসন লেখ থেকে ধারণা করা হয় যে, টলেমী কথিত 'পেন্টাপোলিস'ও পূর্বোক্ত 'তাম্রশাসন পট্ট' উল্লিখিত 'পঞ্চনগরী' এক ও অভিন্ন। মতদ্বৈততা সত্ত্বেও বিদ্বজনের ধারণা দিনাজপুর জেলাস্থ বেলওয়া (ঘোরাঘাট উপজেলা), হরিনাথপুর, চরকাই (নবাবগঞ্জ উপজেলা), দেবীপুর (হাকিমপুর উপজেলা) ও ফুলবাড়ী প্রভৃতি স্থানই হল প্রাচীন 'পঞ্চনগর' বা পেন্টাপোলিস। সাম্প্রতিককালে প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ ও সামান্য উৎখননে একথা অনস্বীকার্য যে, উল্লিখিত স্থানসমূহ 'পঞ্চনগরী' বিষয়ভুক্ত হোক বা না হোক, এসব অঞ্চল যে, একদা সমৃদ্ধশালী এবং সংস্কৃতিক কর্মকেন্দ্র ছিল এতে সন্দেহ নেই।[১৭] এখানকার ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীন নিদর্শন হতে অনুমিত হয় যে, আর্যদের আক্রমণের মুখে সিন্ধু জনপদের অনেক শাসক বাংলার এই অঞ্চলে এসে নতুন রাজ্য স্থাপন করেন। অতঃপর বুদ্ধের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে এই অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মমত বিস্তার লাভ করতে থাকে। সম্ভবত বৈদিক রাজশক্তির আক্রোশে স্থানত্যাগী বা পলাতক বৌদ্ধগণ এতদঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বৌদ্ধ ধর্মানুসারী ও ভিক্ষুদের প্রতি এই অঞ্চলের শাসকবর্গ সহানুভূতিশীল মনোভাব দেখিয়েছেন এবং বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে তা প্রচারের ব্যবস্থাও করেছেন। তৎকালে এত দ্বঞ্চলে এক উন্নত বৌদ্ধ সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। জয়পুরহাটের সন্নিকটস্থ পাহাড়পুর বা সোমপুর বিহার[১৮], জগদ্দল[১৯] মহাবিহার, হলুদ বিহার[২০], সীতাকোট বিহার[২১]- এদেশে বৌদ্ধ সভ্যতার চরম উৎকর্ষতার সাক্ষ্যই বহন করে।

প্রাচীন বরেন্দ্রভূমির প্রায় মধ্যস্থলে এবং প্রাচীন বাংলার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ তথা ভূক্তি পুন্ড্রবর্ধনের রাজধানী বর্তমান মহাস্থানগড়ের অনতিদূরে অবস্থান হওয়াতে জয়পুরহাট ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রাপ্ত বৌদ্ধ মূর্তি, বৌদ্ধ বিহার[২২] ও বৌদ্ধ ধর্মানুসারী পাল শাসনের ঐতিহাসিক ধ্বংসাবশেষ[২৩] ইত্যাদি স্থানটিতে বৌদ্ধ সভ্যতার

প্রাচীনত্বকে নিশ্চিত করে। একই সাথে এখানকার রাজনৈতিক সংগঠন ও কাঠামোর গোড়াপত্তনে বৌদ্ধ রাজাগণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার সাক্ষ্য মেলে।[২৪] পাহাড়পুরে প্রাপ্ত আব্বাসীয় খলিফা হারুনুর রশীদের সময়ের স্বর্ণমুদ্রার সাক্ষ্যে- খ্রিস্টীয় ৮ম শতাব্দিতে আরব বনিকদের সাথে এতদঞ্চলের ব্যবসায়ীদের যোগাযোগ ছিল বলে ধারণা করা হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দির প্রথম দিকে বর্তমান জয়পুরহাটসহ সমগ্র উত্তরাঞ্চলে মুসলিম শক্তির উত্থান ঘটে এবং ইংরেজ আধিপত্যের পূর্ব পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে।[২৫] তবে সুলতানী আমলের শেষ দিকে উপমহাদেশের পূর্ব এবং দক্ষিণাঞ্চলে অনেক স্বাধীন রাজ্যের সৃষ্টি হয়। রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগে কিছু সময়ের জন্য রাজা গনেশ উত্তরবঙ্গের বেশ কিছু অঞ্চলের উপর নিজের আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হন। অবশ্য এই সময় জয়পুরহাট অঞ্চলের উপর তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কিনা তা স্পষ্ট নয়।[২৬] বর্তমান সদর উপজেলার পুরানাপৈল[২৭]-কে সদর করে জয়পুরহাট এবং পাঁচবিবি উপজেলা নিয়ে এক সময় লালবাজার নামক থানা গঠিত হয়েছিল।[২৮] এই লালবাজার ও ক্ষেতলাল[২৯] থানা দিনাজপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরবর্তীতে আইন শৃংখলা পরিস্থিতির ক্রমবর্ধিত চাহিদা এবং ইউরোপীয় নীলকর ও রেশম বনিকদের স্বার্থে এলাকা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনে বগুড়া জেলা গঠনের সময় (১৮২১ সাল) লালবাজার ও ক্ষেতলাল থানা দু'টি বগুড়া জেলার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়। কালক্রমে লালবাজার অস্বাস্থ্যকর হয়ে পড়ায় ১৮৬৮ সালে ১৬ই মার্চ লালবাজার থানার বিলুপ্তি ঘটিয়ে এই অঞ্চল পাঁচবিবি থানার অধীনস্থ করা হয়।[৩০] ১৮৮৪ সালে কলিকাতা-জলপাইগুড়ী রেললাইনের স্টেশনগুলোর মধ্যে জয়পুরহাট অন্যতম। তখন স্টেশন এলাকার স্থানীয় নাম ছিল বাঘাবাড়ীহাট। সরকারি কাগজপত্রে এলাকাটি গোপেন্দ্রগঞ্জ নামে উল্লিখিত হলেও রেলস্টেশন এবং পোস্ট অফিসের নাম জয়পুরহাট হওয়ায় ধীরে ধীরে উক্ত নামেই পরিচিত হতে থাকে।[৩১] ক্রমেই যোগাযোগ ও বানিজ্যিক সুবিধার্থে স্টেশন এলাকা অর্থাৎ বাঘাবাড়ীহাট প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং গোপেন্দ্রগঞ্জহাট নামেই লেখা হতে থাকে। ১৯০৭ সালে জয়পুরহাট একটি স্বতন্ত্র থানা হিসেবে আত্নপ্রকাশ করে এবং ১৯২০ সালের ভূমি জরিপ তথ্যে নিবন্ধিত হয়।[৩২] ১৯৭১ সালে জয়পুরহাট মহকুমা শহরে উন্নীত হয় এবং ১৯৮৪ সালে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের ফলে জেলায় রূপান্তরিত হবার পূর্ব পর্যন্ত বগুড়ার মহকুমা ছিল। এই সময় পুরাতন বগুড়া জেলার একমাত্র মহকুমার পাঁচবিবি, ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট, আক্কেলপুর এবং কালাই থানা নিয়ে জয়পুরহাট জেলা গঠিত হয়।[৩৩] প্রশাসনিক জেলা হিসেবে নবীন হলেও ঐতিহাসিকভাবে সুপ্রাচীন এই জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বহুসংখ্যক ঐতিহাসিক নিদর্শন ও ধ্বংসাবশেষ। এসব মূল্যবান ঐতিহাসিক নিদর্শনাবলী সংরক্ষণের অভাবে কালের গর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। অথচ জাতীয় ইতিহাস পুনর্গঠন ও সমৃদ্ধ করতে এসব ধ্বংসপ্রাপ্ত ঐতিহাসিক নিদর্শনের প্রতি যত্নশীল হওয়া দরকার।

জয়পুরহাটের সীমান্তবর্তী এলাকাসহ প্রায় সমগ্র জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে রয়েছে বিভিন্ন সময়কালের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রত্নসম্পদ। তন্মধ্যে সবচাইতে প্রাচীন ও সমৃদ্ধ হিসেবে চিহ্নিত পাথরঘাটা এলাকাটি।[৩৪] পাঁচবিবি উপজেলা সদর হতে প্রায় ৫ কি.মি. পূর্বদিকে আটাপুর ইউনিয়নে পাথরঘাটার অবস্থান। এখানকার তুলসীগঙ্গা নদীগর্ভে এবং তীরবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে অসংখ্য ছোট-বড় পাথর ছড়িয়ে থাকায় সম্ভবতঃ আধুনিক কালে স্থানীয়ভাবে এর নামকরণ হয়েছে পাথরঘাটা। তুলসীগঙ্গা নদীটি এখনো ছোট যমুনা, আত্রাই এবং করতোয়া নদীর সাথে সংযুক্ত। প্রচীনকালে পণ্য পরিবহনে নদীটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতো বলে অনুমান করা হয়। প্রাচীন সভ্যতার পাদপীঠ মহাস্থানগড় থেকে প্রায় ৪৫ কি.মি. উত্তর-পশ্চিমে[৩৫] এবং ঐতিহাসিক ঘোড়াঘাটের[৩৬] অনতিদূরে এই তীর্থস্থানে প্রতিদিন বহুসংখ্যক দর্শনার্থী এখানকার ঐতিহাসিক নিদর্শণ দেখার জন্য সমবেত হয়। প্রায় ৯ বর্গ কি.মি. এলাকা জুড়ে পাথরঘাটা নামে যে প্রত্নস্থল, তা কোন একক প্রত্নস্থল নয় বরং একাধিক প্রত্নঢিবি নিয়ে গঠিত একটি যৌগিক প্রত্নস্থল। অসংখ্য প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ দ্বারা পূর্ণ স্থানটি কালের নিরব সাক্ষি হয়ে আছে। উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে পশ্চিমে সর্পিল বাঁক নিয়ে তুলসীগঙ্গা নদী এবং উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে দক্ষিণ-পূর্বে প্রবাহিত খালের মতো সরু আর একটি নদী সমগ্র এলাকাটিকে বেষ্টন করে নিমাই পীরের দরগাহ্-র সামান্য দক্ষিণে মিলিত হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে বাঁক নিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। দুই নদীর মধ্যবর্তী স্থানটিই মহীপুর-কসবা-উঁচাই-পাথরঘাটা প্রভৃতি, বিশেষ করে পাথরঘাটা নামে সমধিক পরিচিত। ১৯৬২ সালে নিমাই পীরের দরগা থেকে মাত্র ২০০ গজ উত্তর-পশ্চিমে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে খ্রিস্টান (ক্যাথলিক) মিশনারী ও একটি গীর্জা নির্মিত হয়।[৩৭] মিশনের নামে প্রায় ১৭ একর জমি আছে। স্থানটিতে প্রাচীন ইট-পাথরে পরিপূর্ণ অনেক ঢিবি ছিল। মিশনের বুলডোজার দিয়ে সমুদয় স্থান সমান করার পরও পার্শ্ববর্তী সমভূমি থেকে তা ১০/১২ ফুট উঁচু। বুলডোজার চালানোর সময় মাটির নীচে পাওয়া গেছে অসংখ্য প্রাচীন নক্সাকৃত ইট, কালো ও ধূসর বর্ণের গ্রানাইট পাথরের বড় বড় খন্ড, খিলান, স্তম্ভ, ব্রাকেট, প্রস্তর-মূর্তি ও মূর্তির ভগ্নাবশেষ, পোড়ামাটির চিত্রফলক, মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ ইত্যাদি। এগুলো এক সময় মিশনবাড়ীর ভিতর আঙ্গিনায় শোভা পেত।[৩৮] বরেন্দ্রভূমিতে প্রাচীনকালে বহু নগরীর অস্তিত্ব ছিল যার সংখ্যা নির্ণয় করা প্রায় অসম্ভব। ক্রমবর্ধমান মানুষের চাপে বেশীরভাগ প্রাচীন নগরীই বিলুপ্ত হয়ে গেছে অথবা যাচ্ছে এবং সেখানে গড়ে উঠেছে নতুন নতুন বসতি, আবাদভূমি ইত্যাদি। তবে এখনও যেসব প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ কোন রকমে টিকে আছে পাথরঘাটা তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য। স্থানটি সরেজমিন পরিদর্শন করলে অতি সহজেই অনুমিত হয় যে, দূর-অতীতের কোন এক সময় এখানে একটি সমৃদ্ধ নগর সভ্যতা গড়ে উঠেছিল অথবা বিশাল একটি জনপদ ছিল।[৩৯] প্রাচীনকালে অত্র এলাকায় যে একটি বিরাট জনপদ ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় সমগ্র এলাকা জুড়ে বিদ্যমান ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীন ইমারতাদির ইট, পাথর, দরজা

জানালার অংশবিশেষ ও ব্যবহার্য্য মৃৎপাত্রের ধ্বংসাবশেষ দেখে।[৪০] বর্তমানে এখানে একটি মূর্তির খন্ডাংশ ছাড়া (কয়েক বছর আগে পাওয়া, ফাদার অ্যান্থনীর সংগ্রহে রয়েছে) আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। বেশীর ভাগই চুরি অথবা খোয়া গেছে এবং দেশ বিদেশের বিভিন্ন জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে। যেমন-বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর (রাজশাহী), পাহাড়পুর জাদুঘর (নওগাঁ), মহাস্থানগড় জাদুঘর (বগুড়া), ভারতের কলকাতা ন্যাশনাল মিউজিয়াম ইত্যাদি। তবে এখনো এর যে কোন স্থান সামান্য খনন করলেই পাওয়া যায় পুরাতন ইট, মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ অথবা পাথর।

গীর্জার পূর্বে তুলসীগঙ্গা নদীর উঁচু পাড় থেকে প্রায় ২০ ফুট নীচে পর্যন্ত পাথর দ্বারা সুবিন্যস্ত ভাবে বাঁধা প্রশস্ত পাথরের ভিত্তি দেখা যায় যা পাড় সংলগ্ন উঁচু ভূমির অনেক ভিতরে চলে গেছে বলে মনে হয়। প্রত্নতাত্ত্বিক খনন ছাড়া এর স্বরূপ সঠিকভাবে উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব নয়। তবে অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় যে, তীরবর্তী কোন দেবালয় বা প্রাসাদ থেকে নদীতে নামার জন্য সিঁড়ি হিসেবে তা ব্যবহৃত হতো। নদী পারাপারের জন্য আধুনিক কালে নির্মিত ব্রিজটির পশ্চিম পার্শ্বে রাস্তার দক্ষিণ ধারে একটি মন্দির রয়েছে। মন্দিরটি পুরাতন না হলেও এর ভিত সংলগ্ন চতুপার্শ্বস্থ অলংকৃত পাথরখন্ড গুলো যে অতি প্রাচীন তা সহজেই বুঝা যায়। এগুলোর মধ্যে কোনটিতে অলংকৃত কুলঙ্গী নক্সার মধ্যে শিব মূর্তি, কৃষ্ণ মূর্তি ও ধ্যানরত মূর্তি বিদ্যমান। আবার কোনটিতে শুধুই খাঁজকাটা অথবা ফুল, লতা-পাতার অলংকরণ। মন্দিরের উত্তরে এবং ব্রিজের দক্ষিণে রাস্তার দু'পার্শ্বে বিক্ষিপ্তভাবে বিদ্যমান পাথরগুলোতেও শোভা পাচ্ছে সুনিপুন খোদাই অলংকরণ। বিভিন্ন আকৃতির এসব পাথরখন্ড দেখে অনআসেই বুঝা যায় যে, সেগুলো কোন ইমারতে ব্যবহৃত ব্রাকেট, সর্দল, পিলারের অংশ ইত্যাদি। এছাড়াও মন্দিরের দক্ষিণে ইট, পাথর ও মৃৎপাত্রে ভরা একটি উঁচু স্তুপ রয়েছে।

মিশন ও মন্দিরের দক্ষিণে তুলসীগঙ্গা নদীর তীরে রয়েছে এখানকার একমাত্র মুসলিম নিদর্শণ নিমাই পীরের সমাধী বা দরগাহ্। এর নির্মাণকাল সম্পর্কিত সঠিক কোন তথ্য পাওয়া যায় নাই। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের মাযারটি অষ্টভূজাকৃতি নক্শায় নির্মিত। এই ইমারত একটি প্রাচীন অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষের উপর সংগৃহীত ইট-পাথর দ্বারা নির্মিত বলে সহজেই অনুমান করা যায়। দক্ষিণ দিকে একটিমাত্র প্রবেশপথ এবং অলংকরণ বিহীন ক্ষুদ্র এ ইমারতটি পলেস্তারা আবৃত। নিমাই পীর সম্পর্কিত অনেক কল্পকাহিনী প্রচলিত আছে।[৪১] অনেকে মনে করেন যে, এ'টি নাসির-উদ্-দীন পীরের দরগাহ্। হিন্দু-মুসলিম সবার নিকট মাযারটি সমভাবে পবিত্র। মাযার চত্বরে একটি পাথর দন্ড প্রোথিত আছে যা 'পীরের লাঠি' বলে কথিত।[৪২] মাযারের বাইরে সূক্ষ্ম ভাস্কর্য এবং স্থাপত্যশিল্পের ক্ষয়প্রাপ্ত নিদর্শন সম্বলিত গ্রানাইট পাথরের একটি বিরাট স্তম্ভখন্ড মাটিতে প্রোথিত অবস্থায় এবং দরগাহ্র দেয়ালে সুলতান নাসির-উদ্-দীন-নস্‌রত শাহ্র আমলের (১৫১৯-৩১ সাল) একটি শিলালিপি ছিল বলে জানা যায়।[৪৩] 'বগুড়ার ইতিকাহিনী'তে কাজী মোহাম্মদ মিছের কর্তৃক শিলালিপির

পাঠ অনুসারে মাযারে শায়িত ব্যক্তির নাম নাসির-উদ্-দীন এবং তিনি সুলতান নসরত শাহের আমলে বা তাঁর পূর্ববর্তী সময়ে এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে নিয়োজিত ছিলেন বলে অনুমিত হয়।[৪৪] এখানকার উৎকীর্ণলিপি অপসারিত হয়েছে। বর্তমানে মাযারের প্রবেশ পথের ডান পার্শ্বে যে কারুকার্য খচিত ঈষৎ ধূষর বর্ণের প্রস্তর খন্ডটি আছে তার উপর আগত ভক্তবৃন্দ শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ ফুল, দুধ ও অন্যন্য সামগ্রী রাখে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, এ'টি একটি শিব লিঙ্গের বেদী যার উপরিভাগ অনুপস্থিত। মাযারের দক্ষিণ-পূর্বে তুলসীগঙ্গা নদীর উপর গ্রানাইট পাথর নির্মিত প্রাচীন একটি সেতু ছিল বলে জানা যায়। নদীর পূর্ব তীরের ইট-পাথরের গাঁথুনী সেই সাক্ষ্য বহন করছে।[৪৫] সেতুটি প্রায় ১৫০ ফুট দীর্ঘ ছিল। বাংলাদেশে পুরোপুরি পাথরে নির্মিত আর কোন প্রাচীন সেতুর সন্ধান আজ পর্যন্ত মেলেনি। স্থানটির উত্তর-দক্ষিণ বরাবর নদীগর্ভে দীর্ঘ এলাকা জুড়ে ছোট-বড় অসংখ্য পাথর পড়ে আছে। বহুদূর বিস্তৃত পাথরের ধ্বংসাবশেষের জন্য স্থানটির পাথরঘাটা নাম সার্থক হয়েছে। দরগাহ্‌র পশ্চিমে এবং মিশনের উত্তরে একটি করে ক্ষুদ্র পুকুর রয়েছে যেগুলোর প্রাচীনত্ব সন্দেহাতীত ভাবে প্রমানিত। মিশনের উত্তর-পশ্চিমে কিছুদূর গেলে একই স্থানে ৯টি বিশাল জলাশয়ের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় বলে স্থানটি 'নওপুকুরিয়া' নামে পরিচিত। অত্যন্ত প্রাচীন এ জলাশয়গুলোতে ইট ও পাথর দিয়ে বাঁধানো ঘাটের অস্তিত্ব বিদ্যমান।[৪৬] তা ছাড়া একটি সুবৃহৎ ইমারতের ধ্বংসাবশেষ এবং বেশ কিছু মূর্তি পাওয়া গেছে বলে জানা যায়। সার্বিক আলোচনায় অনেক পন্ডিত মনে করেন যে, নওপুকুরিয়াতেই পাথরঘাটার প্রশাসনিক কেন্দ্র অথবা আবাসিক এলাকা ছিল।[৪৭]

পাথরঘাটা ও সন্নিহিত এলাকায় এখনো বিলুপ্তপ্রায় দীঘি এবং ধ্বংশপ্রাপ্ত ঢিবির অস্তিত্ব ছাড়াও নিকটবর্তী কসবা, মহীপুর ইত্যাদি গ্রামে প্রাচীন জলাশয় ও ঢিবির অস্তিত্ব রয়েছে।[৪৮] তুলসীগঙ্গা নদীর পূর্ব তীরে বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে যে অসংখ্য প্রাচীন ইমারত ছিল তার প্রমাণ মেলে বেশ ক'টি ঢিবি থেকে প্রাপ্ত ইট, পাথর ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাবশেষের অস্তিত্ব থেকে। এখানে প্রাপ্ত অসংখ্য দেব-দেবীর মূর্তি ও মূর্তির ভগ্নাংশ যেমন- বিষ্ণু মূর্তি, শিবলিঙ্গ, গৌরীপট্ট ইত্যাদি স্থানীয় হিন্দু অধিবাসী ও আদিবাসী হিসেবে পরিচিত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মন্দিরে পূজিত হতো বলে জানা যায়।[৪৯] বর্তমানে সেগুলো নেই। পাথরঘাটা এলাকা হতে উদ্ধারকৃত এবং পাহাড়পুর জাদুঘরে সংরক্ষিত প্রত্নসম্পদ গুলোর মধ্যে উল্লেযোগ্য হচ্ছে- প্রস্ফুটিত পদ্মের পোড়ামাটির চিত্রফলক, পোড়ামাটির চিত্রফলকে ফুলের পাঁপড়ীর প্রতিকৃতি, পোড়ামাটির চিত্রফলকে ধাবমান হস্তি, ফুল ও পাতার পোড়ামাটির চিত্রফলক, কাল পাথরে নির্মিত ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিতে দন্ডায়মান ও মাথার উপরে চক্রধারী নারী (দেবী) মূর্তি (বৌদ্ধ ধর্মের অধ:পতনের যুগে প্রবর্তিত চক্রদেবীর মূর্তি এটি হতে পারে), কাল পাথরে নির্মিত দীর্ঘ চক্ষু ও চ্যাপ্টা নাক বিশিষ্ট একটি মূর্তির মুখমন্ডল, কাল পাথরে নির্মিত মস্তকে রাজমুকুট পরিহিত একটি মূর্তির মস্তক।[৫০]

পাথরঘাটার প্রকৃত ইতিহাস সম্পর্কিত কোন প্রামানিক দলিল বা সঠিক সময় নির্দেশক কোন তথ্য অথবা শিলালিপি না থাকায় মহীপুর নাম এবং এখানে প্রাপ্ত প্রত্ন-নিদর্শনগুলোর আলোকে স্থানটিকে পাল নৃপতি ১ম মহিপালের (৯৮৮-১০৩৮ সাল) সাথে যুক্ত করার প্রবণতা লক্ষ্যনীয়। তবে এখানে বিশাল অঞ্চল জুড়ে যে সমৃদ্ধ জনপদের অস্তিত্ব ছিল তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। কোন প্রভাবশালী রাজা বা রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া এধরণের জনপদ গড়ে উঠা অসম্ভব। এখানে একটি প্রশাসনিক কেন্দ্রের ধারণাও অমূলক নয়। যেহেতু গুপ্ত যুগে বাংলায় ইমারত নির্মাণে গ্রানাইট পাথরের ব্যবহার হতো সে কারণে এখানে প্রাপ্ত নিদর্শনগুলোর আলোকে, জনপদটি গুপ্ত যুগে গড়ে ওঠা এবং এটি বেশ সমৃদ্ধশালী ছিল বলে ধারণা করা যায়।

পাথরঘাটাকে অনেকেই প্রাচীন জনপদ পঞ্চনগরী বা তৎসন্নিহিত এলাকা বলে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন। তবে পঞ্চনগরী না হলেও এখানে যে একটি সুবৃহৎ ও সুপ্রাচীন জনপদ ছিল তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। প্রাচীন বাংলার স্থাপত্য অলংকরণের প্রধান উপকরণ ছিল পোড়ামাটির ফলক ও প্রস্তর কারুকার্য। ইমারতের অভ্যন্তরভাগে তেমন কোন অলংকরণ না থাকলেও বহির্ভাগের দেয়ালগাত্রে উৎকীর্ণ বিভিন্ন দেব-দেবী ও পশু-পাখি সম্বলিত পোড়ামাটির ফলক এবং প্রস্তরে উৎকীর্ণ ভাস্কর্য দ্বারা সজ্জিত হতো। খিলানের সন্মুখভাগের খাঁজ নক্সাও বাংলার প্রাচীন স্থাপত্যের এক বিশেষ অলংকরণ বৈশিষ্ট্য। আর এই সমস্ত নমুনা এখানে পাওয়া গেছে ব্যাপক হারে। হয়তো গুপ্ত যুগে বা তারও আগে এখানে একটি জনপদ গড়ে উঠেছিল এবং গুপ্ত যুগেই তা সমৃদ্ধিশালী জনপদে পরিণত হয়। পাল যুগে সম্ভবত মহীপালের সময় জনপদটি বিলুপ্ত না হয়ে আরও সমৃদ্ধ হয়ে উঠে এবং পাল সম্রাট মহীপালের নামানুযায়ী তা মহীপুর নামে পরিচিতি লাভ করে। সেন যুগের তৈরী কালো পাথরের মূর্তি দৃষ্টে অনুমিত হয় যে, সেন আমলেও এ স্থানের বিশেষ প্রাধাণ্য ছিল। খুব সম্ভবতঃ প্রারম্ভিক মুসলিম যুগেও জনপদটির বিলুপ্তি ঘটেনি। কসবা ও নিমাই পীরের দরগাহ্ সে সাক্ষ্য বহন করে। বর্তমানকালে স্থানটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিক থেকে মনোমুগ্ধকর হলেও এককালে ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগের সেই প্রত্নসম্পদের সমারোহ আর নেই। বাংলাদেশ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের নজরদারীর অভাবে এক শ্রেণীর অসাধু মূর্তি ব্যবসায়ী ও চোরাকারবারীর দৌরাত্নে এসব অমূল্য সম্পদ দেশ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টায় আলোচ্য স্থানটিতে খননকার্য পরিচালিত হলে প্রাচীন বাংলার ইতিহাসের অনেক অনালোচিত তথ্য আবিস্কৃত হবার পাশাপাশি স্থানীক গুরুত্ব বৃদ্ধি পাবে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ:

১. অজয় রায়, 'বাঙালীর আত্মপরিচয় : একটি পুরাবৃত্তিক ও নৃতাত্ত্বিক আলোচনা', সফর আলী আকন্দ (সম্পা.), বাঙালীর আত্মপরিচয় (রাজশাহী: ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯১), পৃ. ৬, ৩৬, ৩৭।

২. আ. ফ. ম. আবদুল হক ফরিদী (সম্পা.) ইসলামী বিশ্বকোষ, একাদশ খন্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯২), পৃ. ১০১।

৩. ডঃ শেখ মাকসুদ আলী (সম্পা.) বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার, বৃহত্তর ঢাকা (ঢাকা: বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ১৯৯৩), পৃ. ৫৭।

৪. ব্রিগেডিয়ার এম. মসাহেদ চৌধুরী (অব:) (সম্পা.) বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার, বগুড়া (ঢাকা: বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ১৯৮৯),পৃ. ১। ১৯৮৪ সালে সরকার কর্তৃক মহকুমাগুলোকে পৃথক জেলায় এবং সেগুলোর অন্ত র্ভুক্ত প্রতিটি থানাকে উপজেলায় রূপান্তরিত করা হয়।

৫. ঐ, পৃ. ১০১; বাংলা পিডিয়া, পূর্বোক্ত, ৩য় খন্ড, পৃ. ৪৬৯।

৬. A.K.M. Yakub Ali, Aspect of Society and Culture of the Varendra (Rajshahi: M.Sajjadur Rahim, 1998), p. 30; মুহম্মদ সিরাজুল ইসলাম, পাকিস্তান: দেশ ও কৃষ্টি, প্রথম খন্ড (ঢাকা: ঈস্ট পাকিস্তান স্কুল টেক্স্টটবুক বোর্ড, ১৯৬৯), পৃ. ৯।

৭. খন্দকার মাহমুদুল হাসান, ভারতীয় উপমহাদেশের সভ্যতা ও প্রত্নকীর্তি (ঢাকা: সময় প্রকাশ, ২০০২), পৃ. ৬২।

৮. জ্ঞাত তথ্যানুসারে এখানেই ছিল পাথর দ্বারা নির্মিত বাংলার সর্বপ্রথম সড়ক সেতু। অতি প্রাচীনকাল হতেই নদীতে বাঁধ দিয়ে জনপদ, নগর-বন্দরকে রক্ষা করা হতো। বগুড়ার মহাস্তানগড়ে করতোয়া নদীতে এবং পাঁচবিবির পাথরঘাটায় তুলশীগঙ্গা নদীতে দেয়া বাঁধ এর উজ্জল দৃষ্টান্ত। যদিও আজ সেখানে কোন নগর-বন্দরের অস্তিত্ব নেই; রয়েছে কেবল জনশ্রুতি আর ধ্বংসস্তুপ। করতোয়া এবং তুলসীগঙ্গা আজ ক্ষীনকায়া-মৃতপ্রায়। কাজী মোহাম্মদ মিছের, রাজশাহীর ইতিহাস, ১ম খন্ড (বগুড়া: কাজী প্রকাশনী, ১৯৬৫), পৃ. ১৫; পাথরঘাটা সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন- আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, বাঙলাদেশের প্রত্নসম্পদ (ঢাকা: দিব্যপ্রকাশ, ২০০৭), পৃ. ২২২-২৪।

৯. মহীপুর নাম এবং এখানে প্রাপ্ত প্রত্ন-নিদর্শনগুলোর আলোকে স্থানটিকে পাল নৃপতি ১ম মহিপালের (৯৮৮-১০৩৮ সাল) সাথে যুক্ত করার প্রবণতা লক্ষ্যনীয়।

১০. কসবা ফার্সি শব্দ এর অর্থ শহর। কসবা গ্রামের পশ্চিমে মহিপুর গ্রামে রাজা মহীপালে স্মৃতিধন্য একটি বিরাট দীঘি এবং ইট-পাথরে পূর্ণ কয়েকটি বিলুপ্তপ্রায় ছোট ছোট প্রাচীন ঢিবির অস্তিত্ব আছে। আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৫।

১১. নওপুকুরিয়াতে বৃহদাকৃতির নয়টি ঘাট বাঁধানো জলাশয় ছিল। বর্তমানে সবগুলোর অস্তিত্ব না থাকলেও চিহ্নিত করতে অসুবিধা হয় না। জলাশয় গুলোর অবস্থান ও আকৃতি-প্রকৃতি আবাসিক এলাকা বা প্রশাসনিক কেন্দ্রের সাক্ষ্য বহন করে। বিস্তারিত- ঐ, পৃ. ২২৪।

১২. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালির ইতিহাস: আদিপর্ব (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, আশ্বিন ১৪০২), পৃ. ৩১৮; অজয় রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬; বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার, বগুড়া, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯; সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.) বাংলা পিডিয়া, ৫ম খন্ড (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩), পৃ. ৪৮৮; শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রথম খন্ড (কলিকাতা: জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাবলিশার্স প্রইভেট লিমিটেড, ১৯৮১), পৃ. ২৭।

১৩. ঐ, পৃ. ২৭০।

১৪. মুসলিম বিবরণাদিতে বরিন্দ নাম ব্যবহৃত হলেও বরেন্দ্র নামেই তা সমধিক পরিচিত ও জনপ্রিয়। আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০১; A.K.M. Yakub Ali, ibd, preface.

১৫. মূলতঃ করতোয়া-পদ্মা-মহানন্দা বিধৌত অঞ্চলই বরেন্দ্রভূমি নামে সমধিক পরিচিত। বিস্তারিত- আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া,'বরেন্দ্র অঞ্চল বা রাজশাহী বিভাগের ভৌগোলিক বা ভূতাত্ত্বিক পরিচিতি', মুহঃ মমতাজুর রহমান (সম্পা.) বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস (রাজশাহী: বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, ১৯৯৮), পৃ. ১৪-১৫।

১৬. ইসলামী বিশ্বকোষ, পূর্বোক্ত, একাদশ খন্ড, পৃ. ১০১।

১৭. অজয় রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯।

১৮. এর প্রকৃত নাম সোমপুর বিহার। এসব বৌদ্ধবিহার বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কেন্দ্র সাধারণত সহজগম্য ও লোকালয়প্রধান এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হতো। বর্তমানে এটি নওগাঁ জেলার বদলগাছি থানার উত্তর-পূর্ব প্রান্তে এবং জয়পুরহাট সদর থানার দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দিতে নির্মিত, বিশ্বের আন্যতম প্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃত স্থাপত্য নিদর্শনটি বর্তমান নওগাঁ জেলার বদলগাছি উপজেলার অন্তর্গত। নীহাররঞ্জন রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০১; খন্দকার মাহমুদুল হাসান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭; আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬১।

১৯. বিখ্যাত জগদ্দল মহাবিহার জেলা সদর থেকে পশ্চিমে প্রায় ১৮ কি.মি. দূরে । বিস্তারিত- ঐ, পৃ. ১০৮ ও ২৫৩ ।

২০. সোমপুর বা পাহপড়পুর বিহার থেকে দক্ষিণ, দক্ষিণ-পশ্চিমে এর দূরত্ব প্রায় ১৯ কি.মি. এবং একই উপজেলার বিলাসবাড়ি ইউনিয়নে অবস্থিত । ঐ, পৃ. ৩৩ ।

২১. সিতাকোট বিহারের অবস্থান জেলার উত্তর সীমান্ত থেকে অনতীদূরে ঐ, পৃ. ১০৫-১০৮ ।

২২. বিহার বলতে একটিমাত্র ইমারতকে বুঝানো হতো না । বরং বহু ধরনের অনেকগুলো স্থাপত্যকর্মের সমন্বয়কে বুঝানো হতো । অর্থাৎ বিহার বলতে এক সমন্বিত আবাসিক ব্যবস্থাপনার চিত্রই ফুটে ওঠে; খন্দকার মাহমুদুল হাসান, ভারতীয় উপমহাদেশের সভ্যতা ও প্রত্নকীর্তি (ঢাকা: সময় প্রকাশ, ২০০২), পৃ. ৩৯ ।

২৩. নীহাররঞ্জন রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯১ ।

২৪. ইসলামী বিশ্বকোষ, পূর্বোক্ত, একাদশ খন্ড, পৃ. ১০১ ।

২৫. বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার, বগুড়া, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭০; এস.এম.আনসার আলী, বাড়ীর কাছে আরশী নগর (জয়পুরহাট: সাহিত্য সাধনা কুটির, পুরানাপৈল, ১৯৯৯), পৃ. ৯ ।

২৬. ইসলামী বিশ্বকোষ, পূর্বোক্ত, পৃ.১০২ ।

২৭. প্রাচীন নদীবন্দর ও বাজার ছিল, বর্তমানে একটি মসজিদ ও মাযারের সম্মুখে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে প্রাচীন স্থাপনায় ব্যবহৃত পাথরের পিলার ও খন্ডিত পাথর । এখানেই স্থাপিত হয়েছিল দিনাজপুরের লালবাজার থানা ।

২৮. এস.এম. আনসার আলী, পূর্বোক্ত, পৃ.১০ ।

২৯. বর্তমানে জয়পুরহাটের একটি উপজেলা । এখানে অনেক প্রত্ননিদর্শনের সন্ধাণ পাওয়া গেছে; বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার, বগুড়া, পূর্বোক্ত, পৃ.২৭২ ।

৩০. ঐ, পৃ. ২৭১-৭২ ।

৩১. জয়পুরহাটের স্থানীয় নাম ছিল বাঘাবাড়ী হাট । এস.এম. আনসার আলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১ ।

৩২. ঐ, পৃ. ১২ ।

৩৩. বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার, বগুড়া, পূর্বোক্ত, পৃ.২৭৪; বাংলা পিডিয়া, ৩য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬৯ ।

৩৪. পঞ্চম শতাব্দীতে পুন্ড্রবর্ধন ভূক্তির অন্যতম বিষয় ছিল পঞ্চনগরী। এই পঞ্চনগরীতেই বিষয়ের শাসনাধিকরণ অধিষ্ঠিত ছিল। পঞ্চনগরীর অবস্থান এখনো নিশ্চিত নয়। তবে বৈগ্রাম ও বেলওয়া তাম্রলিপির আলোকে কলাবিশারদগণ ধারণা করেন যে, পশ্চিমে প্রাচীন যমুনা নদী এবং উত্তর ও পূর্বদিকে যথাক্রমে করতোয়ার একটি প্রবাহ ও করতোয়া নদী দ্বারা পঞ্চনগরীর সীমানা নির্ধারিত ছিল। সে অনুযায়ী জয়পুরহাট জেলার ক্ষেতলাল ও পাঁচবিবি উপজেলার সমগ্র অঞ্চল এবং জয়পুরহাট সদর উপজেলার কিছু অংশ পঞ্চনগরীর বিষয়ের অনাতর্ভূক্ত ছিল। পঞ্চনগরী নাম থেকে অতি সহজেই অনুমান করা যায় যে, পঞ্চ অর্থাৎ পাঁচটি জনপদ বা নগরীর সমন্বয়ে গঠিত ছিল এই স্থান। সে ক্ষেত্রে পাথরঘাটাকে পঞ্চনগরী বলা সমীচীন হবে না। কারণ সুবৃহৎ হলেও পাথরঘাটা ছিল একক নগরী। তবে পাথরঘাটা সন্নিহিত অঞ্চলে বিধায় লোকমুখে পঞ্চবিবি এবং শেষ পর্যন্ত পাঁচবিবিতে রূপান্তরিত হয়েছে বলে সুধীজনেরা মনে করেন। ঐ, পৃ. ৩৪২; মোস্তফা আলী, পুন্ড্র (বগুড়াঃ ঋত্বিক, ২০০৯) পৃ. ৩৪৫; আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৩-৪, ১৭০; নীহাররঞ্জন রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০১; খন্দকার মাহমুদুল হাসান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫।

৩৫. ঐ, পৃ. ১৬৫।

৩৬. প্রাচীন শহর ও দুর্গনগরী, বিস্তারিত দেখুন, ঐ, পৃ. ১০৮-১২।

৩৭. এস.এম. আনসার আলী, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৬।

৩৮. ঐ, পৃ. ১৬৬।

৩৯. ঐ, পৃ. ১০৪।

৪০. বাংলা পিডিয়া, পূর্বোক্ত, ৫ম খন্ড, পৃ.৩৪২; ঐ, পৃ.১৬৫।

৪১. অনেকে বিশ্বাস করেন যে, মাহীসওয়ার বলখীর সুযোগ্য এই সাগরেদ প্রথমে নিমাই সন্যাসীর ছদ্মনামে এসে এখানে আস্তানা গড়েন এবং গোপনে ইসলামের বাণী প্রচার করতে থাকেন। এরপর অনুকূল পরিবেশ পেয়ে সুযোগমতো স্বনামে আত্মপ্রকাশ করেন। কিন্তু পূর্ব নামের জের ধরে স্থানীয় লোকজন তাকে নিমাই পীর হিসেবেই সম্বোধন করতে থাকে।

৪২. এস.এম. আনসার আলী, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৫।

৪৩. আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, পূর্বোক্ত, পৃ.১৬৭।

৪৪. কাজী মোহাম্মদ মিছের আলী, বগুড়ার ইতিকাহিনী (বগুড়াঃ কাজী প্রকাশনী,১৯৫৭), পৃ. ১৬৭, ১৭৮-৯২।

৪৫. ঐ, পৃ. ১৬৭; আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪; এস.এম. আনসার আলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫; বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার, বগুড়া, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮-৫৯।

৪৬. মাত্র দু'একটি ছাড়া বাঁকীগুলো বর্তমানে নীচু জমিতে পরিনত হয়েছে।

৪৭. আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৮।

৪৮. ঐ, পৃ. ১৬৮।

৪৯. ঐ, পৃ.১৬৮-৬৯।

৫০. পাহাড়পুরসহ দেশের বিভিন্ন জাদুঘরে পাথরঘাটা থেকে প্রাপ্ত নিদর্শনাদি প্রদর্শনির জন্য শোভা পাচ্ছে।